

ANIK



ওয়েস্টার্ন

নরকে

গোলাম মাওলা নঈম



ওয়েস্টার্ন

নরকে

গোলাম মাওলা নঈম

পোড়াখাওয়া কঠিন যুবক এরিক ক্রেবেট কিন্তু মরুভূমি তারচেয়েও কঠিন জায়গা। এখানে টিকে থাকতে হলে চাই দুর্জয় সাহস, বিচক্ষণতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা। নরকতুল্য মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে ও, প্রমণটা নিঃসঙ্গ হওয়ার কথা। কিন্তু নিয়তির লিখন ঋণে না করে? এলাকা চষে বেড়াচ্ছে দুর্ধর্য রেনিগেড অ্যাম্পাচদের দল, হিংস্র চুরগতি ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বাঁচার তাগিদে বিচ্ছিন্নভাবে পাপাগো ওয়েলসে একত্র হলো আরও কয়েকজন সাদা মানুষ। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, ঈর্ষা আর সোনার লোভ হিংস্র করে তুলল ওদের। শঙ্কিত, অসহায় মানুষগুলোর মুক্তির একটাই পথ—চুরগতির দলকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, একইসাঙ্গে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে। বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না। যা করার নিজেদেরই করতে হবে। আনাড়ি দলটার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল এরিক...



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী ২৪/৪ সেতুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজ্ঞাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

রাতটা গানসাইট হিলসে কাটিয়েছে এরিক ক্রেবেট। অভিযাত্রীদের অন্য একটা দল আগেই ওঅটর হোলে পৌঁছে গিয়েছিল; তাদের এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থেকে এগোয়নি সে, পাহাড়ী ঢালে শুকনো একটা জায়গায় ক্যাম্প করে শুয়ে পড়েছিল; তারপর ভোর হওয়ার পরপরই ট্রেইল ধরে ইয়োমা ক্রসিঙের উদ্দেশে যাত্রা করল ও।

এরিক ক্রেবেটকে দেখলেই বোঝা যায় পোড়খাওয়া মরুভূমির মানুষ। রোদপোড়া চামড়া, ঘন কালো চুল; চৌকো মুখে বা স্বচ্ছ নীল চোখে কোমলতার চিহ্নমাত্র নেই। চোখের কোণের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে; চাহনি এত ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত যে দ্বিতীয়বার তাকাতে চিন্তা করবে যে-কেউ।

দীর্ঘ সুঠামদেহী মানুষ সে। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। সহজ স্বতঃস্ফূর্ত চলাফেরা, অশ্বারোহীদের স্বাভাবিক আড়ষ্টতা নেই; শিকারীর ক্ষিপ্ততায়, নিঃশব্দে হাঁটে ও। বহু অর্থেই শিকারী বলা চলে ওকে।

ফ্ল্যাট ব্রিমের, ফ্ল্যাট ক্রাউনের কালো হ্যাট মাথায়, সরু এক প্রস্থ দড়ি দিয়ে চিবুকের সঙ্গে ঝোলানো। একসময় লাল ছিল গায়ের শার্টটা, কিন্তু রঙ ঝলসে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এখন। বহুল ব্যবহৃত কালো ভেস্ট গরুর চামড়ার তৈরি, দু'এক জায়গায় ছড়ে গেছে; জিসের উপর পরেছে ঝালর দেওয়া শটগান চ্যাপস। নিচু করে ঝোলানো জোড়া স্মিথ এন্ড ওয়েসন বুলছে কোমরে, পয়েন্ট ফোর-ফোর সিক্সশূটার। পয়েন্ট সেভেন থ্রী উইনচেস্টারটা স্যাডল-স্ক্যাবার্ডে রয়েছে।

দীর্ঘ পা-অলা একটা জেব্রা ডানে চড়েছে এরিক। জ্বলজ্বলে চাহনি ওটার শক্তি, সামর্থ্য আর সহিষ্ণুতার প্রমাণ দেয়। আতঙ্কিত কয়োটের মত ছুটতে সক্ষম, উট বা লঙহর্ন হরিণের মত পানি ছাড়া ছুটতে পারে দিনের পর দিন।

এরিক ক্রেবেট পুরোমাত্রায় বাস্তববাদী মানুষ। ধন, সম্পত্তি বা গন্তব্য-কোনটাই নেই ওর। চোদ্দ বছর বয়সে কলেরায় বাবা-মাকে হারানোর পর সুদীর্ঘ দেড় যুগ নানা কাজ করেছে-ফ্রেইটার, কাউবয়, মোষ শিকারী, আর্মি স্কাউট; শটগান গার্ড এবং দুটো শহরের মার্শাল হিসাবে কাজ করেছে। ট্রেইল ড্রাইভে টেক্সাস থেকে ক্যান্সাসে গেছে তিনবার। কখনোই নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না ওর; যখন যে-কাজ পেয়েছে, তাই করেছে। এক হিসাবে ভবঘুরেও বলা চলে ওকে, যেহেতু কোথাও বেশিদিন থাকেনি। ঘোড়ার কান দুটোকে অনুসরণ করে ও, নিত্যদিনের নানা সমস্যা সামলে টিকে আছে।

গানসাইট হিল্‌স থেকে ঘণ্টা খানেক পর শুকনো একটা ওঅশের তলায় ঘোড়া থামাল এরিক, স্যাডল ছেড়ে ক্রল করে ওঅশের কিনারায় চলে এল। চারপাশ দেখবে। কিনারায় উঁচু বোল্ডারের আড়াল উঁচিয়ে মাথা তুলল ও, খুঁটিয়ে মরুভূমি জরিপ করল। কঠিন জীবনে অভ্যস্ত এরিক জানে ইন্ডিয়ান এলাকায় সতর্কতার আরেক নাম জীবন। দূরে, সরু রেখার মত দৃশ্যমান অ্যারিজোনা আর মেক্সিকোর সীমান্তে ধুলো চোখে পড়ছে।

‘দশজন রাইডার,’ বিড়বিড় করল এরিক। ‘বারোজনও হতে পারে।’

চিন্তার কথা। মরুভূমিতে একসঙ্গে এত লোকের আগমনের তাৎপর্য একটাই-ঝামেলা। চারদিন আগে টুকসন থেকে রওনা দেওয়ার সময় এ-ধরনের কোন সংবাদ পায়নি এরিক। দক্ষিণে মরুভূমির বেশিরভাগ অংশ এতটা ভাল করে চেনা আছে ওর যে জানে নেহাত বাধ্য না হলে এই নরকে আসে না কেউ।

এক ডজন মানুষ। পাসি, আউটল, ইন্ডিয়ান কিংবা ফোর্ট ইয়োমা

থেকে আসা আর্মির পেট্রল বাহিনীও হতে পারে। তবে অনেকদিন ধরে শান্ত আছে এলাকা, তাই আর্মির আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, আর এতটা পশ্চিমে অ্যাপাচিদের আনাগোনা নেই বললেই চলে।

কিন্তু অ্যাপাচি টীফ চুরতির ব্যাপারে কোন কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। মা-র দিক থেকে ইয়াকিদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে বলে প্রায়ই পশ্চিম সনোরায়ে যাতায়াত করে সে।

স্যাডলে চেপে পশ্চিম-মুখো পথ ধরল এরিক। ধুলো উড়াতে চায় না বলে ঘোড়ার গতি কমিয়ে ফেলেছে। দক্ষিণের এক ডজন রাইডার এবং গতরাতে গানসাইট হিলসের পাদদেশে রাত কাটানো তিনজনের উপস্থিতি অস্বস্তি ধরিয়ে দিয়েছে ওর মনে। এরিকের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল তারা, মুখ দেখার উপায় ছিল না। কিন্তু ক্যাম্পের আগুন অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, ইন্ডিয়ানরা কখনও এত বড় আগুন জ্বালায় না। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এরা সাদা মানুষ।

সরাসরি ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে না ও, বরং ট্রেইলের পঞ্চাশ গজ সমান্তরালে এগিয়ে চলেছে; কারণটাও সহজ-এরিক চায় না অন্য কেউ সহজে ওর ট্র্যাক খুঁজে পাক। এ অবস্থায়, দক্ষিণ থেকে কেউ মূল ট্রেইলের দিকে না এলে খুঁজে পাবেও না।

*

পশ্চিম অ্যারিজোনার বিস্তীর্ণ এই মরুভূমিতে চলাচলের পূর্বশর্ত হচ্ছে পানি। কয়েকশো মাইলের মধ্যে গুটি কয়েক ওঅটর হোল রয়েছে, একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব অনেক; উপরন্তু কোন কোনটা গ্রীষ্মের সময় পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। যে-ট্রেইল ধরেই যাক না কেন, একাধিক ওঅটর হোল ব্যবহার করতে হবে, নইলে এখানে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

সামনে, গতরাতের ক্যাম্প থেকে আনুমানিক বিশ মাইল দূরে প্রথম ওঅটর হোলটা-পশ্চিমমুখী দুই ট্রেইলের মাঝামাঝি। কিন্তু টুকসনে থাকতে এরিক শুনেছে পানিশূন্য থাকতে পারে ওটা। সেক্ষেত্রে, ওটার উপর নির্ভর না করাই উচিত। পরের পানির উৎস

আরও বিশ মাইল দূরে পাপাগো ওয়েল্‌স। দক্ষিণের লাভা ভূমির শুরুতে জায়গাটা। নেহাত দুর্ভাগা না হলে দুটোই খুঁজে পাওয়ার কথা। হয়তো সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারে দুই দলের কারও সঙ্গে, তবে এ-নিয়ে তেমন ভাবছে না এরিক, পানি পাওয়াই হচ্ছে আসল ব্যাপার।

মরুভূমি মানেই পানির অভাব, উপরন্তু বৃষ্টি হয় না। মানুষ বা পশুর হাড় দেখে ট্রেইল চিনতে হয়—কখনও কখনও মানুষের পাশেই মারা যায় ঘোড়া—পানির অপরিহার্যতাই এখানে সমস্ত চলাচলের দিক নির্ধারণ করে। নানা দিক থেকে ওঅটর হোলের দিকে চলে আসে ট্রেইল। কাছেরটা যদি শুকনো হয়, তা হলে পাপাগো ওয়েল্‌সে যেতে হবে। জায়গাটা নির্জন, ব্যাসল্টের তৈরি তিনটা বেসিনে কালচে পানি রয়েছে। পানির যতই চাহিদা থাকুক, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ওখানে থাকতে চাইবে না কেউ।

পাপাগো ওয়েল্‌সের পর সবচেয়ে কাছের পানির উৎস টুল ট্যাঙ্ক, ইয়োমা ট্রেইল ধরে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। এক ইন্ডিয়ানের কাছে অন্য একটা ওঅটর হোলের কথা শুনেছে এরিক, জায়গাটার নাম হার্ট ট্যাঙ্ক, পাপাগো ওয়েল্‌সের উত্তরে সিয়েরা পিন্টার কাছাকাছি। এরিকের পরিচিত কেউ জানে না হার্ট ট্যাঙ্কের কথা। নির্দিষ্ট অবস্থান জানা না থাকলে মরুভূমিতে কোন ওঅটর হোল খুঁজে পাওয়া রীতিমত অসম্ভব, জানে ও। এ-ধরনের পানির উৎস পাহাড়ের উঁচুতে থাকতে পারে, যেমন আছে টিনাজা অ্যাটলাসে। হয়তো ওটার কয়েক হাত দূর দিয়ে পার হয়ে যায় তৃষ্ণার্ত মানুষ, কিন্তু পানি পায় না; কিংবা যখন ওখানে পৌঁছায়, পাহাড়ের উঁচুতে ওঠার শক্তি অবশিষ্ট থাকে না।

তীব্র গরম পড়ছে।

চোখ কুঁচকে দিগন্তের দিকে তাকাল এরিক। প্রচণ্ড দাবদাহে তাপতরঙ্গ নাচছে। গতরাতে গানসাইট হিল্‌সে ক্যাম্প করেছিল যে-তিনজন, তাদের তৈরি ধুলো দেখতে পেল ও। এরাও পশ্চিমে যাচ্ছে। চট করে দক্ষিণে চলে গেল এরিকের দৃষ্টি...বড়সড় দলটা আরও কাছে

চলে এসেছে, তবে এখনও বহু মাইল দূরে রয়েছে। সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় পাপাগো ওয়েল্‌সে যাওয়া উচিত-পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে—এটা এমন এক এলাকা যেখানে একটা ঘোড়া বা পানির জন্য খুন হয়েছে বহু মানুষ।

কয়েকবার ঘোড়া থামিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে ত্রুখে নিল এরিক, অস্বস্তি বোধ করছে ভিতরে ভিতরে। নির্জন মরুভূমিতে হঠাৎ এত লোকের উপস্থিতি ভাল ঠেকছে না।

এই মুহূর্তে পাপাগো ওয়েল্‌সের দিকে এগিয়ে চলেছে ছয়জন ঘোড়সওয়ার, আপাতত এরিকের অচেনা সবাই। তীব্র শঙ্কা এদের মনে, দু'একজন ইতোমধ্যে যমদূতের হাতছানিও দেখে ফেলেছে।

*

বেশ উত্তরে, অন্য এক ট্রেইলে রয়েছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। এরাও চলেছে পাপাগো ওয়েল্‌সের পথে। দক্ষিণের রাইডারদের সম্পর্কে কিছুই জানে না এরা, গুরুত্বও দিচ্ছে না, বরং মাঝে মধ্যে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, দু'জনের মধ্যে পুরুষটিই বেশি উদ্ভিগ্ন ও শঙ্কিত।

একজন সৈনিকের যা করা উচিত-মাথা উঁচু, বুক টানটান করে স্যাডলে বসেছে সে। বেন ডেভিস সাবেক ক্যাভালরিম্যান। পরিপাটি চুল, সযত্নে ছাঁটা গোঁফ; সাদা হ্যাটের ব্রিমের নীচে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী নীল চোখ। দারুণ সুদর্শন, অভিব্যক্তি আর আচরণে সামর্থ্য এবং নির্জলা আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ে। মরুভূমির হালকা ধুলো জমলেও ডেভিসের পরনের কালো কোট উজ্জ্বল ও পরিপাটি দেখাচ্ছে। সবকিছুতে নিখুঁত থাকতে বা হতে পছন্দ করে সে। গর্বিত ভঙ্গিমায় ঘোড়া ছোটায়, সর্বক্ষণ সশস্ত্র থাকে। শক্তিশালী অপূর্ব একটা চেস্টনাটে চড়ে; বালিময় বা পাথুরে এবড়োখেবড়ো এলাকায় নয়, বরং ভার্জিনিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য শঙ্কর করা হয়েছিল ওটাকে। আত্মবিশ্বাসী টগবগে এক যুবক।

রাইডারদের অন্যজন অপরূপা এক যুবতী। ঘন কালো দীঘল চুল, ধূসর-নীল চোখ। মুখের অপরূপ সৌন্দর্য বা শরীরের প্রতিটি বঁাকে

পরিপূর্ণতার আভাস থাকলেও মেয়েটির অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে, যদিও সেটা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি।

‘কী মনে হয়, তোমার বাবা অনুসরণ করবে আমাদের?’

‘নিশ্চিত থাকতে পারো।’

‘আমরা যদি বিয়ে করে ফেলি?’

‘কিছু যায়-আসে না তাতে। ধরতে পারলে তোমাকে খুন করে ফেলবে বাবা। আমার জন্মদাতা হতে পারে, কিন্তু এত নিষ্ঠুর মানুষ আর দেখিনি। নিজের চোখে একটা খুন করতে দেখেছি ওকে, সেই থেকে বাবাকে ঘৃণা করি আমি।’

‘লোকটা তোমাদের পরিচিত কেউ?’

‘না...শুধু চেহারাটাই চিনতাম। শহরে কয়েকবার দেখেছি। একবার আমাদের র্যাঞ্জেও এসেছিল। বয়সে তরুণ হবে, সুদর্শন, খুব হাসি-খুশি ছিল। আমার তখন দশ-এগারো চলছে, আরেকটু হলে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, তখনই ছেলেটাকে খুন করল বাবা। কারণটা কখনও জানতে পারিনি আমি।’

ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধূলো উড়ছে। চারপাশে কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু স্যাডলের খসখসে আর ঘোড়ার দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ। প্রচণ্ড উত্তাপ থাকা সত্ত্বেও ধূসর ঘোড়ায় আসীন মেয়েটিকে শান্ত, পরিপাটি এবং পুরোপুরি বিনম্র দেখাচ্ছে।

গত ছয় বছরের মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় সবচেয়ে মধুর এবং সৌভাগ্যের ঘটনা মনে হচ্ছে বেন ডেভিসের কাছে। গৃহযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ভালই ছিল সে, কিন্তু যুদ্ধ সর্বনাশ নিয়ে এসেছিল ডেভিসদের জন্য। ওর বাবা, মাইক ডেভিস ছিলেন মেক্সিকান যুদ্ধের সক্রিয় সৈনিক, সহযোদ্ধা এক ক্যাপ্টেনকে দারুণ সমীহ করতেন। সেই ক্যাপ্টেন যখন দক্ষিণের বিরুদ্ধে ইউনিয়নের পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, মাইকও শরীক হলেন। কিন্তু এটাই কাল হলো ডেভিসদের জন্য। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মর্যাদা বা কৌলিন্য না হারালেও সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে ডেভিসরা। যুদ্ধে দারুণ সামর্থ্যের পরিচয় দিয়ে কর্নেল

পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন মাইক, এর কিছুদিন পর মিশনারি রিজে মারা যান তিনি। তরুণ বেন বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পেল ওদের পারিবারিক এস্টেট টিকে আছে বটে, কিন্তু প্রায় তছনছ হয়ে গেছে। ওটাকে খাড়া করতে সময় এবং শ্রম দুটোই ব্যয় করতে হবে। জমি তখনও যথেষ্ট উর্বর, বেগার খাটলে হয়তো দাঁড়িয়ে যেত এস্টেটটা, কিন্তু বেচে দিয়ে পশ্চিমে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিল বেন।

একজন নিপাট ভদ্রলোকের যে-সব দক্ষতা থাকা উচিত, তাই ছিল ওর। নাচতে, রাইড করতে কিংবা গুলি করতে পটু; পানীয় বা তাসে আসক্তি এবং দক্ষতা দুটোই ছিল, কিন্তু তারপরও ভদ্র জীবনই বেছে নিয়েছিল বেন। আজীবন যে-ধারণা বুকে নিয়ে বড় হয়েছে—ডেভিসরা বরাবরই ভাগ্যবান, কখনোই দুঃসময়ে পড়ে না—বেশিদিন থাকল না। এস্টেট বিক্রির টাকা দ্রুত ফুরিয়ে গেল। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে বেন ডেভিস হঠাৎ আবিষ্কার করল মাত্র দু'শো ডলার রয়েছে ওর, আর আছে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। এরপরই পেশাদার জুয়াড়ী বনে যায় সে।

শুরুতে নদীর বোটে ভাগ্য যাচাই করেছিল ও, তারপর সবার মত হুজুগে পড়ে পশ্চিমে চলে আসে। ক্যান্সাস সিটি, এল্‌সওঅর্থ, অ্যাবিলিন, ডজ, ফোর্থ ওঅর্থ, সিমারন হয়ে সান্তা ফেয় গেছে।

আর সেদিন, স্টেজে টুকসন যাওয়ার পথে মেলানি রিওসের সঙ্গে পরিচয়।

মেলানি ওর বাবার একমাত্র সন্তান। টুকসনের চৌহদ্দিতে টম রিওস খুবই পরিচিত নাম। ঘাসের উপর সাম্রাজ্য গড়তে জানে রিওস, জানে মানুষ, গরু বা অ্যাপাচিদের সামলাতে; কিন্তু মেয়ের সঙ্গে কীভাবে দুটো স্নেহের কথা বলবে, সেটা কখনও শেখা হয়নি তার, তাই কখনও বোঝাতেও পারেনি মেলানি তার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন জীবনে অভ্যস্ত টম রিওসের অভিধানে মিষ্টি কথা বলে কিছু নেই, আছে অকপট স্পষ্টবাদিতা—বেশিরভাগ সময় অন্যদের কাছে চাঁছাছোলা, কর্কশ এবং রুঢ় মনে হয়। পশ্চিমের সেরা ও বিখ্যাত

র্যাঞ্চার পিয়ার্স, স্লটার, ফেডন এবং লয়েডদের কাতারে নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছে রিওস।

পুব থেকে র্যাঞ্চে ফিরছিল মেলানি, পথে বেনের সঙ্গে পরিচয়, একসঙ্গে ক্রস-আর বাথানে পৌঁছায় ওরা। বিশাল পাথুরে র্যাঞ্চে হাউসটা দেখে নিজেদের এস্টেটের কথা মনে পড়ে যায় বেনের। দামী স্পেনিশ আসবাবে ভরা শান্ত ঘরোয়া পরিবেশ হৈচৈ-এ পূর্ণ জুয়ার হলে কাটিয়ে আসা বেনের জন্য ছিল রীতিমত স্বর্গের মত কাঙ্ক্ষিত ও স্বস্তিকর।

অতিথি হিসাবে কয়েকটা দিন মহা আনন্দে কেটে গেল ক্রস-আরে। সুস্বাদু খাবার তো ছিলই, আর ছিল মেলানির উপভোগ্য সঙ্গ। অপ্রতিভ কাউবয়দের ভিড়ে বেনের উপস্থিতি ছিল চমকপ্রদ, কাঙ্ক্ষিত; ভদ্রতা বা সৌজন্য তো জানাই রয়েছে ওর, মেলানিকে অভিভূত করতে কোন সমস্যাই হলো না। কিন্তু মোটেই প্রভাবিত হলো না টম রিওস, স্রেফ মেয়ের অতিথি বলে বেনের উপস্থিতি নীরবে সহ্য করে গেল। তারপর...একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিল বেন।

ইতোমধ্যে ছোটখাট ব্যাপারে বাপের সঙ্গে হালকা ঝগড়া হয়ে গেছে মেলানির। সুযোগ চিনতে ভুল করল না বেন। ওর বিয়ের প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করল মেলানি। কিন্তু টম রিওসের কাছে প্রস্তাবটা দিতে গিয়ে বাধল যত বিপত্তি। এক ঘণ্টার মধ্যে কেটে পড়ার নির্দেশ পেল। সত্যি সত্যি ক্রস-আর ছেড়ে চলে এল বেন, কিন্তু ভোরে ওর সঙ্গে যোগ দিল মেলানি। তারপর টুকসনের উদ্দেশে ছুটল দু'জন।

টম রিওসের সম্মতি ছাড়া তার মেয়ের বিয়ে পড়াবে, এমন বুকের পাটা নেই টুকসনের কোন পাদ্রী বা যাজকের। রাতটা এক বান্ধবীর বাসায় কাটাল মেলানি, বাবার প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। সকালে এরেনবার্গের উদ্দেশে যাত্রা করা এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গী হলো ওরা। ট্রেইল যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, ওখানে এসে ইয়োমা ক্রসিঙের পথ ধরল দু'জন।

দক্ষিণে বেটস ওয়েলের উদ্দেশে এগোল ওরা। অ্যারিজোনার

দক্ষিণ অঞ্চল সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই বেনের, দূরে অসংখ্য চলমান ধুলোর মেঘ দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল, বিকাল নাগাদ বেটস ওয়েলে পৌঁছল ওরা।

মেলানির চিৎকারে সংবিৎ ফিরল বেনের।

দুটো লাশ পড়ে আছে। পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে মানুষগুলোর উপর। গায়ে কাপড় নেই, বিকৃত পুরো দেহ। অন্তত দশটা করে তীর বিধেছে শরীরে। ওঅটর হালের শুকনো খটখটে তলা ভিজে গেছে চাপচাপ রক্তে। লাশ দুটোর চারপাশে নালহীন ঘোড়ার অসংখ্য খুরের ছাপ।

ভয় কী জিনিস, জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারল বেন ডেভিস। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল বেশিক্ষণ আগে মারা যায়নি এরা, তারমানে ধারে-কাছেই রয়েছে ইন্ডিয়ানরা।

‘মেলানি, এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের।’

ওঅটর হালের পিছনে, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা এক লোকের উপস্থিতি টের পায়নি দু’জনের কেউ; সদ্য তরুণ সে, কিশোরই বলা চলে-দীর্ঘদেহী, আড়ষ্ট ও লাজুক চলাফেরা, কিন্তু হাতে উদ্যত রাইফেলটা ধরার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। মলিন, কুঁচকানো কাপড় পরনে। কথা বলার আগে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। ‘পশ্চিমে যাচ্ছ তোমরা?’

ঝট করে ঘুরল বেন ডেভিস, সহজাত প্রবৃত্তি বশে পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে হাত, দীর্ঘদেহী ছিপছিপে কিশোরকে দেখে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। ‘কে তুমি?’ টানটান স্বরে জানতে চাইল ও।

‘তোমরা বোধহয় পশ্চিমে যাচ্ছ, ভাবছি আমিও সঙ্গে যাব। আমার নাম ড্যান কোয়ান।’

‘এদের চেনো নাকি?’ লাশ দুটোর দিকে ইশারা করল বেন।

‘আমার সঙ্গে ছিল, একত্রে কাজ করেছি এক আউটফিটে। ঠিক করেছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব সবাই। পশ্চিমে রওনা দিয়ে এ-পর্যন্ত এলাম।’

‘এখান পর্যন্ত আসতে আসতে পানি শেষ হয়ে গেল সবার। পাথরের ওদিকে গেলাম আমি, আশা ছিল হয়তো একটা টিনাজা খুঁজে পাব। আচমকা হামলা করল ইন্ডিয়ানরা। অন্তত পনেরোজন ছিল ওরা। গুলি করার সুযোগই পেলাম না, তার আগে শেষ হয়ে গেল সবকিছু।’

দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছে মেলানি, কিন্তু চাইলেও ভুলতে পারছে না বীভৎস দৃশ্যটা। বুক ধড়ফড় করছে ওর। বাবার কাছে শোনা ইন্ডিয়ান রেইডের গল্প মনে পড়ল। একটা দল এখানে এসে থাকলে, ধারে-কাছে আরও দল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

‘চলে যাওয়াই ভাল,’ নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল ও। ‘ওরা ফিরে আসতে পারে।’

‘সবচেয়ে কাছে পানি পাওয়া যাবে পাপাগো ওয়েল্‌সে...বিশ মাইল দূরে,’ মেলানির দিকে ফিরল ড্যান কোয়ান। ‘ম্যা’ম, তুমি আপত্তি না করলে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই আমি।’

‘চলো।’

প্রতিবাদ করতে মুখ খুলেছিল বেন ডেভিস, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। বাড়তি একজন লোক থাকলে মন্দ হবে না, ভাবল সে, বয়স কম হলেও চটপটে মনে হচ্ছে ছেলেটাকে। এটা এমন এক দেশ, যেখানে বয়স নয় কারও কাজই হচ্ছে আসল ব্যাপার। ছেলেটার রাইফেল ধরার ভঙ্গিতে বোঝা যায় ব্যবহারে অভ্যস্ত সে।

*

ওদের দক্ষিণে আরও একটা পানির উৎস রয়েছে, শুধু ইন্ডিয়ানরাই জানে ওটার অবস্থান। গুটিকয়েক প্রসপেক্টর আর আর্মির স্কাউট এটার অস্তিত্বের গুজব শুনেছে। এ-মুহূর্তে ছয়জন ইন্ডিয়ান ব্যবহার করছে পানির উৎসটা, ওদের সঙ্গে বন্দি সাদা একটা মেয়েও রয়েছে।

সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য বলা মুশকিল, পুরো পরিবারের মধ্যে একমাত্র মিমি রজার্সই বেঁচে আছে, অন্যরা নৃশংসভাবে খুন হয়েছে ইন্ডিয়ানদের হাতে। মিমি হয়েছে বন্দিনী। কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। পাবে কীভাবে? ও যে বেঁচে আছে, কেউ জানলে

তো! তা ছাড়া, পরিচিত এমন কেউ নেই যে ও বন্দি থাকলে তার কিছু যাবে-আসবে। ভয়ে আর হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়েছে মিমি, ঠায় বসে আছে, নড়ার সাহস পাচ্ছে না, পাচ্ছে যদি ওর প্রতি মনোযোগ দেয় ইন্ডিয়ানরা!

তবে এ-মুহূর্তে ওরকম সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। খাওয়ায় ব্যস্ত ইন্ডিয়ানরা। র্যাঞ্চ থেকে চুরি করে আনা মিউলের মাংস ঝলসানোর পর সানন্দে সদ্যবহার করছে। পেট পুরে খাওয়ার পর ঘুমাতে ওরা, জানে মিমি, আর তখনই আসবে ওর সুযোগ। যদি পালাতে পারে...

বেটস ওয়েল থেকে কিপ্রিয়ানো ওয়েলের দূরত্ব দশ মাইল, ট্রেইলের এক পাশে ওটার অবস্থান। মিমি জানে অন্তত বিশ মাইল দূরে পাপাগো ওয়েলস; কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করবে। ইন্ডিয়ান গ্রামে বন্দি থাকার চেয়ে বরং মরুভূমিতে কষ্টের মরণ হওয়াও চের ভাল। হয়তো পাপাগো ওয়েলসে পৌঁছে যেতেও পারে...সবসময় পানি থাকে ওখানে, রয়েছে পর্যাপ্ত আড়াল। পরে কেউ এলে তার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারবে...

পাপাগো ওয়েলসে কখনও যায়নি মিমি, তবে ওদের ওয়্যাগন ট্রেনের গাইডের কাছে ওটার কথা শুনেছে। নিকট ভবিষ্যৎ দিব্যি আঁচ করতে পারছে ও। এখানে থাকলে আগামীকাল বলে কিছু আসবে না ওর জীবনে। পেট পুরে খেয়েছে ক্ষুধার্ত ইন্ডিয়ানরা, ঘুমাচ্ছে এখন। ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই ধর্ষণ করবে ওকে, শেষে খুন করবে। এরা ওঅর পার্টি, এখনই গ্রামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে এদের নেই। তাই সঙ্গে ওকে রাখা মানে বাড়তি ঝামেলা।

স্থির বসে থাকল মিমি, ভিতরে ভিতরে ভয়ে বেসামাল অবস্থা, কিন্তু আশায় থাকল...হয়তো কাজিফত সুযোগটা পেয়ে যাবে...

*

মাত্র কয়েক মাইল দূরে, জেব্রা ডানটাকে ক্ষণিকের জন্য থামাল নিঃসঙ্গ রাইডার। হ্যাটে পানি ভরে ঘোড়ার মাথা ধুয়ে দিল সে, তলানিটুকু খাওয়াল জেব্রা ডানকে। বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার জন্য বড়সড়

দুটো ক্যান্টিন নিয়ে যাত্রা করেছিল ও, সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে এখন।
ভাগ্য ভাল হলে হয়তো সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে পাপাগো ওয়েল্‌সে।
স্যাডলে চেপে পশ্চিমে এগোল এরিক ক্রেবেট।

দুই

পাপাগো ওয়েল্‌সের কুয়াগুলোর বয়স কয়েক হাজার বছর। পাথুরে
জমির বুকে তিনটা গভীর খাদ, ভূমিকম্পে শিলাচ্যুতির সময় তৈরি
হয়েছিল। একটু সামনে, নিচু একটা অ্যারোয়ো রয়েছে; আর পিছনে
পাথুরে শৈলশিরা কশেরুকার শেষপ্রান্তের মত চোখা, তির্যক অবয়ব
তৈরি করেছে।

পাপাগো ওয়েল্‌স থেকে গাঙ্ক অভ ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে লাভা বয়ে
যাওয়ার ফলে এবড়োখেবড়ো ও দুর্গম হয়ে উঠেছে এলাকার এই
অংশ। ছোটখাট একটা নরক বলা চলে একে। জ্বলন্ত, উত্তপ্ত এবং
বাম্পীয় লাভার স্রোত ঠাণ্ডা হওয়ার পর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত
গভীর গর্ত তৈরি করেছে, কোনটা কোনটা মাটির নীচে কয়েকশো ফুট
পর্যন্ত গভীর। খাদে ক্যাকটাস, শোলা, বিসনাগা আর ওকটিয়া
জন্মেছে।

নির্জন অঞ্চল এটা, ভূমিকম্পের ফলে অদ্ভুত চেহারা পেয়েছে।
মাটিতে অসংখ্য ফাটল ছাড়াও রয়েছে গভীর অ্যারোয়ো বা লাভার ঢালু
চাঙড়। ওগুলোয় কখনও কখনও পানি পাওয়া যায়। পাপাগো
ওয়েল্‌সের পানির উৎস তিনটা সমতল পাথুরে বেসিন। সূর্যের আলো
এত নীচে পৌঁছায় না বলে পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, শীতল ও সুপেয়।
ইন্ডিয়ান বা তাপদঙ্ক মরুর কিছু পশুপাখি ছাড়া এটার কথা খুব কম
লোকই জানে।

প্রাচীন কোন এক সময়ে, যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হত, বেসিন তিনটা প্রায়ই পূর্ণ থাকত; সরীসৃপ এবং পরে স্তন্যপায়ীদের তেষ্ঠা মিটিয়েছে বছরের পর বছর। উত্তরে সমস্ত গ্লেসিয়ার গলে যাওয়ার পর বৃষ্টির পরিমাণ কমে এল, ক্রমশ শুকিয়ে এল জমি, ঘাস উধাও হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

পরে আরও পাথরধস এবং ভূমিকম্প হলো, বেশিরভাগ সরীসৃপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, গুটিকয়েক টিকে থাকল, উত্তর থেকে আসা ইন্ডিয়ানদের জন্য কিংবদন্তী হয়ে টিকে থাকল এরা। তবে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী, দু'ধরনের প্রাণীকেই হারিয়ে যেতে দেখেছে ইন্ডিয়ানরা। কূপের কাছাকাছি, বালির নীচে খড়্গের মত দাঁতঅলা বাঘের কেরাটি আর হাড় রয়েছে, আরও কাছে আছে বিশালকায় একটা স্লোথের কঙ্কাল। সিকি মাইল দূরে প্রকাণ্ড দুটো ম্যামথ শিকার করেছিল আদিম মানুষেরা, বিশাল পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল ওগুলোকে।

সাত হাজার বছর আগে এক শিকারী পানি পান করতে এসে আবিষ্কার করে কূপগুলো। সে-ই ছিল পাপাগো ওয়েল্‌সের পানি পান করা প্রথম মানুষ। হাঁটু গেড়ে বসে পানি পান করার জন্য, টের পায়নি আরও এক শিকারী রয়েছে ধারে-কাছে-খড়্গঅলা দাঁতের একটা বাঘ ঘাপটি মেরে ছিল লাভার পিছনে। বর্শা আর পাথরের তৈরি কুঠার ছিল আদিম মানুষটির কাছে। পিছনে শব্দ শুনতে পেয়ে ঝাটতি ঘুরে দাঁড়াল সে, একেবারে মোক্ষম সময়ে; ততক্ষণে লাফ দিয়েছে বাঘটা। নাকের ডগায় যখন চলে এসেছে, তখনই বর্শা চালাল লোকটা। বাঘের মগজে বিধলেও হাতল ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল বর্শাটা। মরিয়া চেষ্ঠায় পাথরের ধারাল কুঠার চালাল লোকটা। লোকটাকে পঞ্চাশ গজ দূরে টেনে নিয়ে গেল বাঘ, ওখানেই পাশাপাশি পড়ে থেকে মারা গেল মানুষ আর পশু। বাঘের মাথায় বিধে যাওয়া বর্শার ফলাটা পরে ওঅটর হালের পশ্চিম কিনারে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

* স্লোথ (Sloth) উত্তর আমেরিকার এক জাতীয় জন্তু

নেহাত ঠেকায় না পড়লে এত দক্ষিণে কোন লোকই আসে না। স্বাভাবিক সময়ে উত্তরের এলাকায় যথেষ্ট পানি থাকে, তবে কয়েকশো বর্গমাইলের এই এলাকায় পানি খুব কমই দেখা যায়। কৃদাচিৎ বৃষ্টির ফলে পাথুরে বেসিনে যদি জমা হয় কখনও, তাই পাওয়া যায়। স্বভাবতই, এদিকে কেউ এলে পানির যোগান নিয়েই আসে, নিজ দায়িত্বে।

পাপাগো ওয়েল্‌সের কুয়ায় মিষ্টি, পরিষ্কার পানি, মাটি থেকে কয়েক ফুট গভীরে। লাগোয়া লাভার দেয়ালের কারণে কুয়ায় সবসময়ই ছায়া থাকে। মূল কুয়ার পিছনে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং প্রায় গুপ্ত আরেকটা বেসিন রয়েছে, পাথুরে প্রস্তরে প্রায় ঢাকা, একেবারে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না। আর মূল কুয়ার নীচে ছড়ানো-ছিটানো পাথরের আড়ালে আরেকটা কুয়া লুকিয়ে আছে, নিচু অ্যারোয়োতে জন্ম নেওয়া মেস্কিট, আয়রনউড, প্যালো ভার্দে আর ক্যাট-ক্লর ঘন ঝোপের আড়ালে পড়ে গেছে ওটা।

বছরের পর বছর বৃষ্টির কারণে পাথরের পৃষ্ঠ মসৃণ ও স্বচ্ছ হয়ে গেছে, প্রবল ঝড়ে স্থানচ্যুত হয়ে কুয়ায় এসে পড়েছে ছোট ছোট পাথর। বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে এটাই পানির জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। বিগহর্ন ভেড়া, পাহাড়ী সিংহ, জাগুয়ার, কয়োট বা অ্যান্টিলোপ পানি পান করতে আসে এখানে। মানুষও আসে, তবে কেউই বেশিক্ষণ থাকে না। পানির চাহিদা মিটে গেলে যার যার পথে চলে যায়।

মরুভূমির মানুষ আর আশপাশে যত পশু আছে, সবার কাছে পানির নিশ্চয়তার আরেক নাম পাপাগো ওয়েল্‌স। বছরের যে-কোন সময়ে পানি পাওয়া যায় এখানে। শুধু সুপেয় পানিই নয়, অ্যারোয়োয় রয়েছে শীতল ছায়া এবং গ্যালেটা ঘাস...এমন জায়গার কথা সহজে বিস্মৃত হওয়ার নয়। বছরের বেশিরভাগ সময় শুকনো থাকে বেটস ওয়েল, কিপ্রিয়ানো ওয়েলে রয়েছে নামমাত্র, গানসাইট নামের ওঅটর হোলটা এখান থেকে বহু দূরে-পিছন দিকে, আর টুলে ওয়েল্‌সের অবস্থান আরও সামনে।

*

পাপাগো ওয়েল্‌স থেকে বেশ দক্ষিণে মরুভূমি ধরে উত্তর-পশ্চিমে এগোচ্ছে কয়েকজন রাইডার। ইন্ডিয়ান এরা। ওদের নেতার নাম চুরুতি। আধা অ্যাপাচি আধা ইয়াকি। হিংস্র, নৃশংস। মা বা বাবা, কারও গোত্রে ঠাই হয়নি তার, নিজের দোষেই টিকতে পারেনি। সাদা মানুষকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে চুরুতি, খুন-জখম এবং লুটপাট ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ওর জীবনের সার্থকতা শুধু এতেই। ম্যান্টেসা এবং উত্তর সনোরার ইসপুমা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে ওরা। দলে রয়েছে তেইশজন অ্যাপাচি। সনৈটায় ছোটখাট কয়েকটা দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ওদের। উত্তরে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাথান আর মাইনিং ক্লেইম রয়েছে। এলাকায় অবশ্য পিমা এবং পাপাগো ইন্ডিয়ানদের বসবাস। পিমারা ওদের বহু পুরানো শত্রু। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে চুরুতির দলবল। মাঝে মধ্যে সীমান্তের ওপাশে চলে যায়, ঝটিকা রেইড চালিয়ে ফিরে আসে। এখন যেমন, আনন্দিত সন্ত্রস্ত দল নিয়ে ফিরছে চুরুতি। সীমান্তের ওপাশে এবারের অভিযানে দারুণ মৌজ হয়েছে—খুন, লুটপাট ছাড়াও বেশ কিছু বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা।

বিশালদেহী মানুষ চুরুতি। গাঢ় চামড়া। নাক বোঁচা, সারা মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। অন্যকে খুন করে জীবনের আনন্দ উপভোগ করে সে। আচমকা যাত্রার গতিপথ বদলে কুইটোভাকের দিকে এগোল। একটা খনিতে কাজ করে আট-দশজন মেক্সিকান।

মিনিট কয়েকের মধ্যে কাজ সেরে উত্তরে কুইটোবাকিটোর দিকে এগোল ওরা। বেশ কয়েকটা ঘোড়ার পাল আছে ওখানে। ঠিক পশ্চিমে পাপাগো ওয়েল্‌স।

কুইটোভাকে অন্তত পাঁচজন মেক্সিকান খুন হলো, যদিও চুরুতির ধারণা একজনকেও রেহাই দেয়নি, কিন্তু আসলে একজন মেক্সিকান ছাড়াও সাদা এক পুরুষ আর একজন মহিলা বেঁচে গেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার...ষাট হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রার এত কাছে এসেও

জানতে পারল না চুরুতি ।

মরুভূমি ধরে এগিয়ে চলেছে দলটা, একেকজনকে দেখে মনে হচ্ছে বাদামি ভূত । চুরুতির মনে পাপাগো ওয়েল্‌সের মিষ্টি সুপেয় পানির স্মৃতি ।

*

ছায়ার কারণে পানির ছোঁয়া পায়নি সূর্যের আলো । চারপাশ নীরব, শান্ত; নীচে আয়রনউড ঝোপে ডেকে উঠল একটা কোয়েল...ব্যস, আর কোন শব্দ নেই ।

সূর্যাস্তের পর দলেবলে পানি পান করতে এল ভেড়ার পাল । নেতৃত্বে একটা বিগহর্ন । ঠাণ্ডা গাঢ় পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল ওরা, সময় নিয়ে পান করল । কিছুক্ষণ ওখানেই থাকল দলটা, পানির নৈকট্য উপভোগ করছে । হঠাৎ দূরে পাথরের সঙ্গে ঘোড়ার খুরের সংঘর্ষের শব্দ কানে আসতে চমকে উঠল নেতা-ভেড়াটা । হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে, চট করে লাভার বোল্ডারে হারিয়ে গেল সবক'টা । গোধূলির শেষ লগ্নের ফিকে আলোয় আবার নীরব হয়ে গেল পাপাগো ওয়েল্‌স এলাকা ।

স্যাডলের খসখস শব্দ হলো, শব্দের উৎস কাছে চলে এসেছে এখন, পশ্চিম দিক থেকে কুয়ার দিকে এগিয়ে এল দু'জন রাইডার । নিচু স্বরে কথা বলছে তারা । 'যাক, নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছি, টনি । ইয়োমার শেরিফ যদি আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, গানসাইটের ট্রেইল ধরে এগোবে । ওখান থেকে কাভারড ওয়েল্‌স বা ইন্ডিয়ান ওয়েসিসে চলে যাবে ওরা ।'

টনি চিডলকে ততটা নিশ্চিত মনে হলো না । 'এটা ইয়াকি এলাকা,' মনে করিয়ে দিল সে ।

'তোমাদের পিমাদের এই এক দোষ,' নিখাদ বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের সুরে মন্তব্য করল এড মিচেল । 'ইয়াকিদের কথা শুনলেই ভয়ে হিসি করে দাও!'

শ্রাগ করল চিডল । 'ইয়াকিদের সঙ্গে বহুবার লড়াই করেছে

পিমারা, বেশিরভাগ সময় পিমারাই জিতেছে।’

একই বিষয়ে তর্ক চালিয়ে যাওয়া অপছন্দ টনি চিডলের। যা বলেছে, সেটাই ওর শেষ কথা। এড মিচেল যখন পাপাগো ওয়েল্‌সে থামতে চাইছে, বেশ, আপত্তি নেই ওর। নাছোড়বান্দা টাইপের লোক ইয়োমার শেরিফ, পালিয়ে আসার আগে দীর্ঘদেহী যে-তরুণকে খুন করেছে ওরা, সম্পর্কে শেরিফের ভাতিজা হয় সে। লেজ তুলে পালানোর জন্য এই যথেষ্ট। সত্য উদ্‌ঘাটন করার ঠেকা পড়েনি শেরিফের, অথচ দুই তঁাদোড় দোস্তুকে নিয়ে ভাতিজাই শুরু করেছিল। নাম কিনতে এসে নরকের টিকেট কিনে ফেলেছে বেয়াড়া ছেলেটা। শহরে প্রবেশ করার পর গলা ভিজাতে একটা সেলুনে ঢুকেছিল ওরা, তখনই বেহুদা ঝামেলা। অপরিচিত মানুষ দেখে পিস্তলে নিজের কারিশমা দেখানোর খায়েশ চাপে শেরিফের ভাতিজার। বয়স উনিশ হলে কী হবে, আক্কেল হয়নি ছেলেটার বা ওর বন্ধুদের।

মোষ শিকারী ছিল এড মিচেল। পোড়খাওয়া মানুষ। জীবনে বহু ঘাটের পানি খেয়েছে। এমনিতে গস্তীর হলেও আসলে রসিক, কৌতুকপ্রিয়। বাউই ছুরিতে দক্ষ এবং বিপজ্জনক। অন্তত পঞ্চাশবার ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে মিচেলের, হাতাহাতি লড়েছে তারচেয়েও বেশি; অথচ দেখে মনে হয় নিতান্ত নিরীহ গোছের মানুষ। নিরীহই বটে, তবে কেউ ঘাঁটাতে এলে মোটেও ছেড়ে কথা বলে না।

দোআঁশলা টনি চিডল একসময় আর্মির স্কাউট ছিল। মাঝারি গড়নের পেটা শরীরের অধিকারী। মুখ দেখে বয়স বোঝা কঠিন। তরুণ বয়সেই অ্যাপাচি আর হুয়ালাপাইদের ঘোড়া চুরি করে দুঃসাহসী হিসাবে নাম কামিয়েছে। জীবনে চলার পথে বহু লড়াই করেছে। মিচেলের মত বয়স্ক বা অভিজ্ঞ না হলেও ত্রিশটা বসন্ত সেও পার করেছে, দেখেছে বহু মৃত্যু এবং দুর্ঘটনা। পশ্চিমে মানুষের জীবনের মূল্য কত সস্তা, জানে বলেই কখনোই ঝামেলার ফিকির করে না ওরা, অথচ ইয়োমার ছেলেগুলো শিকার হিসাবে বেছে নিয়েছিল ওদের।

দু'জনের বয়স উনিশ, অন্যজন সবে কুড়ি পেরিয়েছে। মিচেল আর চিডলকে মনে করেছিল বুড়ো প্রসপেক্টর এবং নিরীহ এক ইন্ডিয়ান, এতটুকু বিপজ্জনক নয়। ভুলের মাশুলও দিয়েছে ওরা-কবরের বাসিন্দা হয়েছে শেরিফের ভাতিজা, আজীবনের জন্য একটা বাহু বাতিল হয়ে গেছে একজনের; আর তৃতীয়জন গুরুতর আহত, উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে বেঁচে যাবে হয়তো।

কুয়ার পাশে যখন ঘোড়া থেকে নামল ওরা, উজ্জ্বল চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। তেষ্ঠা মিটিয়ে নীচের ঝোপের কাছাকাছি ক্যাম্প করল ওরা, পানির বেশি কাছে নয়, আবার দূরেও নয়। জানে যে অন্য লোকজনও আসতে পারে। আগুন না জ্বালিয়েই শুয়ে পড়ল দু'জন। গ্যালিটা ঘাস আর টর্নিলো সীমের সদ্যবহার শুরু করল ঘোড়া দুটো। ঘুমিয়ে পড়ার আগে চারপাশ ভাল করে দেখে নিল ওরা, তারপর মুখের উপর হ্যাট চাপিয়ে দিল। মোটামুটি নিশ্চিত যে পাপাগো ওয়েল্‌সের ধারে-কাছে আসছে না কেউ।

মিচেল যা জানে না তা হচ্ছে, পাপাগো ওয়েল্‌সের কাছে বহু লোক আসে, কিন্তু ফিরে যেতে পারে না সবাই। স্পষ্ট না হলেও এমন একটা ধারণা রয়েছে দোআঁশলার, তবে যথেষ্টই বলেছে ও। ইয়াকি এলাকায় যে-কোন কিছু ঘটতে পারে। মিচেল পোড়খাওয়া মানুষ, বেশি কিছু তাকে বলা অর্থহীন।

যা ঘটার ঘটবেই, আগে থেকে হাপিত্যেশ করে লাভ নেই।

*

পাপাগো ওয়েল্‌সের দক্ষিণ-পশ্চিমে, দূর থেকে যাদের দেখেছিল এরিক ক্রেবেট, এরা আসলে ইয়োমা থেকে আসা পাসির সদস্য। হঠাৎ দিক বদলে উত্তরে এগোল তারা। যতটা আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিণতি ঠিক ততটাই ভয়ঙ্কর আর চরম হয়ে উঠল তাদের জন্য।

সনৈটার নির্দিষ্ট স্থানে চুরতির সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছিল রেনিগেড ইন্ডিয়ানদের একটা দল, দূর থেকে পাসির উপস্থিতি টের পেয়ে শুকনো ওঅশে লুকিয়ে পড়ে তারা। ওঁৎ পেতে থাকা ইন্ডিয়ানদের

সামনে গিয়ে পড়ল পাসির সদস্যরা। দীর্ঘ রাইডের কারণে ক্লান্ত এরা, প্রায় সবাই স্যাডলে বসে ঢুলছে, তীব্র উত্তাপে স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। কোথেকে বিপদ এল, টেরই পেল না কেউ। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ বলা যায়, বড়জোর চল্লিশ ফুট দূরত্ব; ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের প্রথম তোড়ে ঝটপট চারটা স্যাডল খালি হয়ে গেল। হুলস্থূল পড়ে গেল সদস্যদের মধ্যে, মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দলটা।

ইয়োমো শেরিফের বিচক্ষণতা বা বুদ্ধিও কাজে এল না; নিজেদের সংগঠিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো দলটা। ক্লান্তিময় তপ্ত একটা দিনের শেষ হলো করুণ ও অসহায় মৃত্যুর মাধ্যমে। রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনে ঘুম টুটে গেল সবার, স্যাডল থেকে খসে পড়তে দেখল সঙ্গীদের, উদ্ভ্রান্তের মত চারপাশে তাকাল কেউ কেউ। দু'জন লোককে ধাওয়া করতে এসে নিজেরা শিকার বনে গেছে, ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারল না কেউ। আধ-পোষা একটা ব্রহ্মো রাইড করছে শেরিফ, মুহূর্তে গুলি হচ্ছে, আতঙ্ক আর সহজাত প্রবৃত্তি বশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছাড়াই। পরে যখন ঘোড়ার রাশ টানল সে, দেখল প্রায় চার মাইল দূরে চলে এসেছে এবং একা সে।

পিছনে ছাড়াছাড়াভাবে গোলাগুলি চলছে। আসলে কী ঘটেছে, পরিষ্কার ধারণা করতে পারেনি শেরিফ। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। সবচেয়ে কাছে পানি রয়েছে গানসাইট ওয়েল্‌সে, বুঝতে পারছে না ফিরে যাবে নাকি একাই চলে যাবে গানসাইটে। সামান্য ইতস্তত করার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগ বাড়াল, তখনই হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। মিনিট খানেকের মধ্যে শেরিফের জানা হয়ে গেল গুলি খেয়েছে পশুটা।

এবার সত্যিকার অর্থে একা হয়ে পড়ল শেরিফ। ইয়োমায় ফেলে আসা প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা মনে পড়ল তার, 'হয়তো আর কখনোই দেখা হবে না! মরুভূমি সম্পর্কে অন্য দশজনের চেয়ে বেশিই জানে সে, অভিজ্ঞতা থেকে নিজের সম্ভাবনা বিচার করতে সক্ষম হলো—বেঁচে

থাকার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। কিন্তু সাহস হারাল না অভিজ্ঞ মানুষটা।

তিন বেয়াড়া তরুণের খামখেয়ালির চরম দণ্ড দিতে হলো এতগুলো লোককে! তিজ্ঞ মনে খিস্তি করল শেরিফ, হাঁটতে শুরু করল। জীবনে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, জানে সে।

পরদিন, দুপুর তখন। গানসাইট থেকে বহু দূরে রয়েছে শেরিফ। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথ আর ফুরায় না। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সে। তেষ্ঠায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ফুলে গেছে ঠোঁট, চোখ জ্বালা করছে সারাক্ষণ। তপ্ত রোদ্দুর এখন আর কোন প্রভাবই সৃষ্টি করছে না তার মধ্যে। বোধশূন্য মানুষের মত টলমুল পায়ে এগোল শেরিফ, জানে না নিজের অজান্তে পথ হারিয়েছে, গানসাইটের পথ ফেলে এসেছে পিছনে।

একসময় ধৈর্য হারাল সে। তিজ্ঞ মনে পরাজয় মেনে নিল। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে কপালে ঠেকিয়ে গুলি করল। একটার বেশি দরকার হলো না।

পুরোপুরি সফল হয়েছে ইন্ডিয়ানরা। সংখ্যায় বারোজন ছিল ওরা, অথচ আক্রমণের প্রথম তোড়ে কচুকাটা করে ফেলল। প্রথম দফায় খুন হয়ে গেল চারজন। উদ্ভান্ত ও দিশেহারা সদস্যরা যখন দিশিদিগ ছুটছে, আরও একজন খুন হয়ে গেল। শেরিফের মৃত্যুর খবর অবশ্য কারও জানা হলো না। বেঁচে যাওয়া বাকি ছয়জনের পাঁচজন ফোর্ট ইয়োমার সৈন্য, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এক অভিজ্ঞ আইরিশ সার্জেন্ট। চমক কাটিয়ে কেবল এরূই কিছুটা প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হলো। অগভীর একটা জায়গায় আশ্রয় নিল, পাল্টা গুলি শুরু করল ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশে।

সুশৃঙ্খল সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ার পরিকল্পনা ছিল না ইন্ডিয়ানদের, পাল্টা আক্রমণ শুরু হওয়ার একটু পরই অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়ল অ্যাপাচিরা। রেডস্কিনরা দক্ষিণে পালিয়ে যাওয়ার পর আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট টমাস হ্যালিগান, লাশের আশপাশে পড়ে

থাকা অস্ত্রশস্ত্র আর পানির ক্যান্টিন সংগ্রহ করল। সন্ত্রস্ত দুটো ঘোড়াকে ধরতে সক্ষম হলো সৈন্যরা, মালপত্র ওগুলোর পিঠে চাপিয়ে পশ্চিমে রওনা দিল।

পরদিন দুপুরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল পাসির শেষ সদস্য, ইয়োমার অধিবাসী মার্ক ডুগান। অ্যাপাচিদের তোপের মুখে পড়া বারোজনের মধ্যে এ ছয়জনই সৌভাগ্যবান। বাস্তবে, পাসির-মূল ছয় সদস্যের মধ্যে কেবল ডুগানই বেঁচে গেছে। সুখের খবর, সঙ্গে ঘোড়া রয়েছে তার।

টুকসন পর্যন্ত রুটের ধারে-কাছে ওঅটর হোলগুলোর অবস্থা জানার জন্য পাঠানো হয়েছিল সৈন্যদের। কাজ শেষে ইয়োমায় ফেরার পথে শেরিফের সঙ্গে দেখা হয় তাদের। সঙ্গে সৈন্যরা থাকলে বাড়তি নিরাপত্তা পাবে, শেরিফের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় সার্জেন্ট। কিন্তু আচমকা দিক পরিবর্তন করে উত্তরে এগিয়েছে বলেই যে চরম মূল্য দিতে হলো, সবার আগে স্বীকার করতে হবে সার্জেন্ট টমাস হ্যালিগানকে।

নাজুক পরিস্থিতি। যত শীঘ্রি সম্ভব ইন্ডিয়ান রেইডের খবর রিপোর্ট করা সার্জেন্টের দায়িত্ব, কিন্তু কাউকে একটা ঘোড়া দিয়ে পাঠানো সম্ভব নয় এখন। এ-মুহূর্তে সবার জীবন নির্ভর করছে ঘোড়া, অ্যামুনিশন আর ক্যান্টিনের উপর। মানুষ ছয়জন, অথচ ঘোড়া মাত্র তিনটা। একটার পিঠে অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্যান্টিন রেখেছে, অন্য দুটোয় পালানক্রমে চড়ছে সবাই। পাপাগো ওয়েলসে যদি পৌঁছতে পারে, তা হলে হয়তো বেঁচে যাবে অসহায় মানুষগুলো।

পাপাগোতে পৌঁছতে পারলে, বিশ্রাম নেওয়া যাবে। জায়গাটা নিরাপদ। পানির চাহিদা মিটবে, ক্যান্টিনও ভরে নিতে পারবে। তারপর ইয়োমায় যাত্রার চিন্তা করা যাবে। যাত্রার সবচেয়ে খারাপ অংশটা সামনে—পাপাগো ওয়েলস আর এখানকার পথটুকু। ইন্ডিয়ানরা ফিরে আসতে পারে আবার। হয়তো দলে আরও ভারী হয়ে আসবে। হ্যালিগানের ধারণা যারা ওদের আক্রমণ করেছিল, শুধু এরাই নয়, বরং

আরও কয়েকটা ছোট ছোট দল রয়েছে চৌহদ্দিতে ।

এভাবে, বিভিন্ন দিক থেকে পাপাগো ওয়েল্‌সের উদ্দেশে এগোতে থাকল কয়েকটা দল । কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে । সাধারণ অথচ অনিবার্য একটা চাহিদা একই গন্তব্যমুখী করেছে তাদের-পানি ।

*

কিপ্রিয়ানো ওয়েল । অঘোরে ঘুমাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা । ভরপেট খাওয়া, তারও আগে কয়েকদিন প্রায় অনাহারে কাটানো...আপাতত খানিকটা আয়েশ করা যেতেই পারে । মিমি রজার্স সম্পর্কে প্রায় ভুলে গেছে সবাই । ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া মেয়েটা পালানোর দুঃসাহস করে বসেছে ।

পিছনে বাঁধা মিমির হাত । কষে বেঁধেছে ইন্ডিয়ানরা । টেনে-টেনে পরখ করেছে, খোলা সম্ভব নয় । একটা ঘণ্টা ঠায় বসে ছিল ও, তবে শরীর বেকার থাকলেও মাথাটাকে খাটিয়েছে-পরিকল্পনা করেছে । বাঁধন খোলার বুদ্ধি পেয়ে গেছে ও । ইন্ডিয়ানদের নিঃসাড়ে ঘুমাতে দেখে সক্রিয় হলো এবার ।

দু'হাত কোমরের কাছে নিয়ে এল ও । ভাগ্যিস, বয়সের তুলনায় শীর্ণ আর ক্ষীণকায় ও, একটু চেষ্টা করতে কোমর ছাড়িয়ে পশ্চাদ্ভাগ পেরিয়ে হাঁটুর পিছনে চলে গেল দড়িতে বাঁধা দু'হাত । আড়ষ্ট একটা অবস্থান, ঢলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা । কিন্তু দুই হাঁটু ভাঁজ করে একেবারে চিবুকের কাছে তুলে ফেলল মিমি । বাহু আর হাতের তৈরি চক্রে গলিয়ে দিল গোড়ালিতে বাঁধা জোড়া পা । সামনে চলে এল দু'হাত । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মিমি, দেরি না করে মুখের সামনে তুলে ধরল হাত দুটো । র-হাইডের গেরোতে দাঁত বসিয়ে কাজ শুরু করল ।

ঘণ্টাখানেকের ক্লান্তিকর ও উদ্ভিগ্ন চেষ্টার পর মুক্ত হলো হাত দুটো । পায়ের বাঁধন খুলতে আরও আধ-ঘণ্টা লাগল । সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল ও, পা টিপে টিপে সরে এল ক্যাম্পের এক পাশে । একটা ঘোড়া দখল করার চিন্তা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল । সাদা মানুষের গন্ধ পেলে ভডকে যাবে পনিগুঁলো । অস্বাভাবিক শব্দে

জেগে যাবে ইন্ডিয়ানরা। তারচেয়ে বরং পায়ে হেঁটে যাওয়াই মঙ্গল। একটা পানির ব্যাগ নিতে যা দেরি, তারপরই রওনা দিল মিমি। প্রথমে সন্তর্পণে, শেষে প্রায় পা চালিয়ে এগোল। চাপ চাপ অন্ধকার আড়াল দিল ওকে।

এই বসন্তে ষোলো হবে মিমির।-জনমদুঃখীই বলা যায় ওকে। ওর জীবনে ভালবাসা, মায়া বা সহানুভূতির পরিমাণ যতটা, তারচেয়ে একাকীত্ব আর কঠিন শ্রমের অংশই বেশি। বছরের পর বছর কেটে গেছে অসম্ভবের প্রতীক্ষা করে...ভেবেছে হয়তো কোন একদিন ভাগ্য বদলে যাবে ওর। মিথ্যে আশা। কিন্তু এ থেকে অর্জনও হয়েছে। স্বপ্ন সবসময়ই প্রেরণা দেয় মানুষকে। মিমি রজার্স তাই অনুভব করছে এখন, কোথেকে মনের জোর পেয়েছে জানা নেই, কিন্তু এই চালিকা শক্তি ত্রাণকর্তা হয়ে এসেছে ওর জন্য।

আত্মবিশ্বাসী, নিঃসঙ্কোচ পায়ে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধরে এগিয়ে চলল মিমি রজার্স, মনে এতটুকু ভয় বা সংশয় নেই।

তিন

ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় পাপাগো ওয়েল্‌সে পৌঁছল তিন রাইডার। স্যাডলে টিকে থাকার আশ্রয় চেষ্টা করছে মেলানি রিওস; শরীরে যা ক্লান্তি, ওর মনে হলো এই চেষ্টার শেষ হবে না কখনও। শুরু থেকে ড্যান কোয়ানের উপস্থিতি পছন্দ হয়নি বেন ডেভিসের, কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই বলে আপাতত মেনে নিয়েছে।

মেলানি রিওসের হাতে কোন আঙুটি নেই, খেয়াল করেছে ড্যান। আঙুটি থাকুক বা না-থাকুক, কে লেডি আর কে সাধারণ মহিলা.

দেখেই চিনতে পারে ও। মেলানি যে সত্যিকার সম্মানিত লেডি, এতটুকু সন্দেহ নেই ওর।

রিওস...মেলানি রিওস...বিগ জিম রিওসের মেয়ে না তো?

অবশ্যই! ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল ড্যান কোয়ানের কাছে। জিম রিওসের নাম কে না জানে! পশ্চিমে যত জায়গায় গুরু-চরে, সর্বত্র এই র্যাঞ্চারের নাম শোনা যায়। জিম রিওসের মেয়ে যদি কারও সঙ্গে পালিয়ে এসে থাকে, স্পষ্টত যে লোকটাকে পছন্দ হয়নি প্রতাপশালী র্যাঞ্চারের। ড্যান নিজেও রোমান্টিক মানুষ, জানে প্রেমের ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা নয়। মেয়েটি যদি ডেভিসকে ভালবেসে থাকে, আপত্তি করার অধিকার নেই জিম রিওসের। সুবালিকা কোন মেয়ে নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতেই পারে। এটাই নিয়ম।

বেন ডেভিসকে বিচার করল ড্যান। সে যে ভদ্রলোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও নিজে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মানুষ বলে ডেভিসকে একনজর দেখেই ধাতটা চিনে নিয়েছে—দক্ষিণা আভিজাত্যের ধারক। ড্যান যেখান থেকে এসেছে, উত্তরে একজন মানুষের বিচার গোলাগুলিতে বা খামারের কাজে তার দক্ষতায়, অথচ দক্ষিণের লোকের কাছে এটা বুনো এক সমাজের চালচিত্র। দশ বছর বয়স থেকে সারাক্ষণ সঙ্গে রাইফেল রাখে ড্যান, জানে ওটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

ভোরে পাপাগো ওয়েল্‌সে এসেছে ওরা। আগের রাতে এখানে পৌঁছেছে টনি চিডল আর এড মিচেল, তবে ধারে-কাছে কাউকেই দেখতে পেল না। ওরা যখন তেষ্ঠা মেটাতে ব্যস্ত, একই সময়ে, পূর্ব থেকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে মিমি রজার্স। কিপ্রিয়ানো ওয়েল্‌সের পাশে ঘুমন্ত ইন্ডিয়ানরা তখনও জেগে ওঠেনি।

কুয়ার কাছে এসে ঘোড়া থামাল ওরা। ‘এক কাজ করা যাক,’ নিচু স্বরে প্রস্তাব করল ড্যান কোয়ান। ‘আমি বরং চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসি। ইন্ডিয়ানরা থাকতে পারে।’

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল মেলানি, কিন্তু তার আগেই ডেভিস বলে

উঠল: 'বেশ, যাও...সাবধানে থেকে।'

তীক্ষ্ণ অসন্তোষের চাহনি হানল মেলানি, তবে কোন মন্তব্য করল না। ঘোড়াকে আগ বাড়িয়ে ওর পাশে চলে এল বেন, বলল: 'তুমি যতটা কাঁচা ভাবছ, তা কিন্তু নয় ও। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট সেয়ানা। পাহারার কাজটা ওকে দিয়ে করানো যাবে।'

এবারও কিছু বলল না মেলানি। ভোরের আলো ফোটেনি এখনও, চাঁদ রয়ে গেছে আকাশে। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শোলা ক্যাকটাস, জ্বলন্ত মশাল মনে হচ্ছে ওগুলোকে। কান পাতল মেলানি। ড্যান যদিকে গেছে, নুড়িপাথর গড়ানোর হালকা শব্দ ভেসে এল ওদিক থেকে। হালকা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, কুয়ার লাগোয়া গ্রিজউডের শাখা তিরতির করে কাঁপছে।

পশ্চিম বড় সুন্দর...ভাবছে মেলানি, কিন্তু নির্জন, শূন্য এবং একাকীত্বে ভরা। ঝলমলে শহুরে পরিবেশ, আনন্দময় পার্টি, উজ্জ্বল আলোর তুলনায় কত ম্লান আর নির্জীব! সৌন্দর্য, নৈঃশব্দ্য বা নির্জনতা থাকার পরও; আনমনে মাথা নাড়ল মেলানি, উঁহুঁ, এ জায়গা ওর জন্য নয়। এখানে থাকতে পারবে না।

র্যাঞ্জে কাটানো দিনগুলি রীতিমত দুর্বিষহ মনে হয়েছে। ওর সঙ্গে রুচির মিল হতে পারে, এমন একজন মহিলাও নেই। মেয়ের সঙ্গে জিম রিওসের অন্তরঙ্গ হওয়ার আড়ষ্ট ও অনভিজ্ঞ চেষ্টা মেকী মনে হয়েছে ওর কাছে। সর্বক্ষণ একটা পিস্তল সঙ্গে রাখে ওর বাবা। এই পিস্তলই হাসি-খুশি সুদর্শন এক তরুণের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মনে এলেই রাপ আর পিস্তলটার প্রতি ঘৃণা বোধ করে মেলানি।

মরুভূমি কোন মহিলার থাকার জায়গা হতে পারে না, নিজেকে শুধাল ও। কী আছে এখানে? মরুভূমি কেবলই মেয়েদের জীবনীশক্তি কেড়ে নেয়, পুড়িয়ে দেয় কোমল ত্বক, সৌন্দর্য শুষে নেয়। এই নরক ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে খুশি ও। ভাগ্যিস, পরিচয় হয়েছিল বেন ডেভিসের সঙ্গে! নিপাট ভদ্রলোক, অভিজাত পরিবারের সন্তান...

আবছা অন্ধকারে কুয়ার ওপাশে উদয় হলো ড্যান কোয়ান। 'এবার নরকে

নিশ্চিত হওয়া গেল। আশপাশে কেউ নেই। প্রচুর পানি আছে। ঘোড়াগুলোর জন্য নীচের ওতশে যথেষ্ট ঘাস আছে।

পূর্ব দিগন্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া পাহাড়শ্রেণীর খাঁজকাটা চূড়া কমলা আভা পেল সূর্যোদয়ের সময়, ধীরে ধীরে আলোকিত হলো বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর। সুউচ্চ রীজগুলো রক্তলাল হয়ে গেছে। ক্লান্ত হলেও, ঘোড়াটাকে নীচের কুয়ার কাছে নিয়ে এল মেলানি। ঠাণ্ডা পানি পান করতে ব্যস্ত ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ছেলেবেলায় এই শিক্ষাটা বাপের কাছ থেকে পেয়েছে ও।

‘ঘোড়াগুলোর যা অবস্থা,’ বলল বেন ডেভিস। ‘বিশ্রাম না নিলেই নয়।’

‘জায়গাটা ভাল,’ গোড়ালির উপর ভর দিয়ে মাটিতে বসল ড্যান। ‘আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করতে পারব। এরচেয়ে খারাপও হতে পারত অবস্থা।’

বেনের থরোব্রেড ঘোড়াটার অবস্থা কাহিল। চোখ কোটরে বসে গেছে, ক্ষীণকায় দেখাচ্ছে। এমন উত্তাপ আর পানিশূন্যতায় অভ্যস্ত নয় ওটা। যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ঢলে পড়ে যাবে। মেলানির ঘোড়াটা ক্লান্ত হলেও খাড়া আছে এখনও। থরোব্রেডের অবস্থা দেখে খানিকটা শঙ্কিত ও।

কুয়ার উপরে, লাভার চাঙড়ের পিছনে সত্তর্পণে মাথা তুলল এক লোক। কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনজনের দলটাকে দেখল সে। কৌতূহল ফুটে উঠল চোখে। একে একে তিনজনকে খুঁটিয়ে দেখল, মেলানিকে একটু বেশি সময় নিয়ে দেখল। তার পাশে মাথা তুলল এড মিচেল, সেও দেখল পানির টানে চলে আসা তিন আগন্তুককে। মাটিতে বসলেও রাইফেল হাতছাড়া করেনি ছেলেটা, দেখে সমীহ ফুটে উঠল মিচেলের চাহনিতে।

পুরুষদের কাউকেই আইনের লোক বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু এখানে এদের উপস্থিতি অস্বাভাবিক। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া এত দুর্গম জায়গায় আসার কথা নয় কারও। ‘বেশ, খুব সাবধানে যাব আমরা,’

ফিসফিস করল মিচেল। 'বেতাল কিছু করে বোসো না। ছোকরার ব্যাপারে সাবধান। দেখে মনে হচ্ছে আগে গুলি করবে ও, পরে লাশের উদ্দেশে প্রশ্ন করবে।'

উঠে দাঁড়াল ড্যান। 'কফি আছে আমার কাছে, ম্যা'ম,' জানাল সে। 'গর্তে ছোট করে আগুন জ্বালালে বোধহয় চোখে পড়বে না কারও। ধোঁয়া যাতে না ওঠে, সেভাবে তৈরি করব।'

'ধন্যবাদ, ড্যান,' বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখা গেল মেলানির মুখে, পাল্টা হাসল ড্যান কোয়ান। 'তুমি আগুন জ্বালাবে, কিন্তু কফিটা আমি তৈরি করব।'

বগলে শুকনো ডালপালা নিয়ে ফিরে আসছে, এসময় লোক দু'জনকে দেখতে পেল ড্যান। ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, পালাক্রমে দেখল দু'জনকে, দশ কদম দূরে রেখে যাওয়া রাইফেলের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি। কোমরের বেলেটে সিক্সশুটার আছে বটে, কিন্তু ড্র করতে হলে আগে কাঠ ফেলে দিতে হবে। দুশ্চিন্তার আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে, পিস্তলে তেমন চালু নয় ওর হাত।

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই,' দ্রুত বলল মিচেল। 'পুবে যাচ্ছি আমরা। তোমাদের মতই রাত কাটাতে থেমেছি এখানে।'

অপরিচিত কণ্ঠ শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বেন ডেভিস। খাটো ঝুলের একটা কোট পরেছে সে, ঝটিতি ড্র করতে যাতে সুবিধা হয়; ঘুরে দাঁড়ানোর সময় কোটের প্রান্ত একপাশে সরিয়ে দিল সে—দেখতে পেল ড্যান—স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি বশে করেছে কাজটা। বোঝাই যায় বহু অনুশীলনের ফসল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো ড্যানের, বেন ডেভিসের পিস্তলে অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর একটা কিছু নজরে পড়ল। নিজেকে বেকুব মনে হলো ওর। এই লোককে কি-না পুর্ব থেকে আসা নিপাট নিরীহ ভদ্রলোক ধরে নিয়েছে! যথেষ্ট কারণও ছিল—পশ্চিমা মানুষের চেয়ে ডেভিসের গায়ের রঙ তুলনামূলক ফর্সা; অথচ পশ্চিমের গানফাইটারদের চঙে পিস্তল ঝুলিয়েছে সে।

আগুন জ্বালাবে বলে যে-জায়গাটা ঠিক করেছে, মৃদু পায়ে সেখানে

চলে গেল ড্যান, কাঠ নামিয়ে রাখল।

‘পুবে রওনা দেওয়ার আগে ভেবে নাও আসলেই যাবে কি-না,’ দুই আগন্তুকদের উদ্দেশে বলল ড্যান। ‘বেটস ওয়েলে আমার দুই পার্টনারকে খুন করেছে অ্যাপাচিরা।’

‘তা হলে বরং অপেক্ষা করব,’ সবক’টা দাঁত বের করে হাসল মিচেল। ‘ওরা যদি এখানে আসেই, হাড়ে হাড়ে টের পাবে...’

‘আসবে ওরা।’

পাথরের বুলন্ত একটা চাঁইয়ের নীচে আগুন জ্বালাল ওরা। চাঁইয়ের কারণে আলোর প্রতিবিম্ব উপরে উঠবে না, যদিও আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেছে, প্রতিবিম্ব তৈরি হলেও দেখা যাবে না এখন। আগুনের পাশে বসে পড়ল ওরা, কফি খাওয়ার ফাঁকে যার যার নিজস্ব ভাবনায় মশগুল হয়ে গেল।

বাবা নিশ্চই বসে থাকেনি, ভাষছে মেলানি, এখন বোধহয় ওদের পিছনে কোথাও আছে। ওর খোঁজে তোলপাড় করে ফেলবে পুরো মরুভূমি। সঙ্গে অন্তত দশ-বারোজন থাকবে...হয়তো তার কাছে-পিঠেই রয়েছে রক্তপিপাসু হিংস্র ইন্ডিয়ানরা...

ভাষছে এড মিচেলও, তবে চিন্তাটা মোটেও স্বস্তিকর কিছু নয়। পিছনে ছুটে আসা পাসি ফাঁসির আতঙ্ক তৈরি করেছিল ওর মনে, শেরিফ যদি ইয়োমায় ওদের ফিরিয়ে নিয়েও যেত, বিচারে কোন জুরিই ওদের পক্ষে রায় দিত না-আদৌ বিচার যে হত, তাও মনে করে না মিচেল। আগন্তুকদের জন্য পশ্চিমের যে-কোন শহরই বড় নির্মম। নির্লিঙ অভ্যর্থনার পাশাপাশি অদৃশ্য ও অকারণ বিদ্বেষও থাকে আগন্তুকদের জন্য। শহরের একটা ছেলে খুন হয়েছে, দু’জন আহত হয়েছে, এ-অবস্থায় কেউই ওদের পক্ষ নিত না। তাদের বিবেচনায় উচ্ছল তারুণ্যের কারণে খানিকটা বেসামাল হয়ে গিয়েছিল তিন তরুণ, কিন্তু ঘুণাঙ্করেও কেউ আমল দেবে না যে পরিণত মানুষের তিনটা অস্ত্র ছিল এদের হাতে। ভবঘুরে এক মোষ শিকারী আর এক দোআঁশলা কী করে সুবিচার পায়?

মাঝে মধ্যে আগুনের পাশ থেকে উঠে চলে যাচ্ছে টনি চিডল, চারপাশ রেকি করে ফিরে আসছে। অভিজ্ঞ মানুষ সে, ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে শরীরে, যে-কারও চেয়ে মরুভূমিতে তার ইন্দ্রিয়গুলো বেশি সজাগ ও কর্মক্ষম।

সূর্য যখন পর্বতশ্রেণীর খাঁজকাটা চূড়া ছাড়িয়ে খোলা আকাশ ছুঁয়েছে, এসময় অন্যদের সতর্ক করল সে। ‘একটা লোক আসছে!’

পাথরের আড়াল থেকে তাকে দেখতে পেল ওরা। জেব্রা ডানে চড়েছে লোকটা। স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটছে ঘোড়াটা। দ্রুতই পৌঁছল সে, তবে একেবারে কাছে আসার আগে সম্ভাব্য প্রতিটি কাভারের আড়াল ব্যবহার করল, বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখল কুয়ার আশপাশের এলাকা। একবার ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল সে।

বিড়বিড় করে চিডলের উদ্দেশে কী যেন বলল মিচেল, চাপা শব্দে হেসে উঠল। ‘দারুণ সেয়ানা লোক! বাজি ধরে বলতে পারি, ও জেনে গেছে কোথায় আছি আমরা, এমনকী ক’জন তাও জানে! আমাদের ঘোড়াগুলোর অবস্থাও অজানা নেই ওর...দেখেছ না, একটু আগে ছাঁপ খুঁটিয়ে দেখেছে?’

‘সেয়ানা লোক এমন বোকামি করে নাকি?’ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বেন ডেভিস। ‘চাইলে এখান থেকে যে-কোন সময় ফেলে দিতে পারব ওকে।’

‘পারবে হয়তো, কিন্তু চেষ্টা করতে যেয়ো না। স্ক্যাবার্ডে ওর রাইফেলটা দেখেছ, কীভাবে রেখেছে? আমার তো মনে হয় আমরা যখন ওকে দেখেছি, একই সময়ে আমাদেরকেও দেখেছে সে। তখন যদি রাইফেল তুলতে, এতক্ষণে বুলেট খেয়ে ফুটো হয়ে যেতে। কেন ঘোরাঘুরি করছে ও, জানো? এটা যে ফাঁদ নয়, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে। বাজি ধরবে আমার সঙ্গে? এক ডলারে দুই ডলার। ঘোড়ার ওপাশে নামবে ও, আমাদের আর ওর মাঝখানে ঘোড়াটাকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করবে।’

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ঢাল ধরে ঝোপের কাছে উঠে এল আগন্তুক।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। সবার আগে আগে এগোল ডেভিস, ত্রিশ গজ দূরে থাকতে থামতে বাধ্য হলো ওরা। পমেলের উপর আড়াআড়ি শুয়ে আছে আগন্তুকের রাইফেল, নলটা ডেভিসের বুক বরাবর স্থির।

‘কফি আছে না তোমাদের?’ বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল এরিক ক্রেবেট। ‘সিকি মাইল দূর থেকে গন্ধ পেয়েছি।’

‘চলে এসো,’ আহ্বান করল ডেভিস।

স্যাডল ছাড়ল এরিক। নিজের আর ওদের মাঝখানে থাকল জেব্রা ডান, এবং একচুলও নড়েনি রাইফেলের নিশানা। শেষে ঘোড়াটাকে গাছের কাছে নিয়ে গেল সে, মিনিট খানেক পর ওদের কাছে ফিরে এল। এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে ক্যান্টিন আর স্যাডলব্যাগ।

‘ভোরের দিকে ধোয়ার গন্ধ পেয়েছি,’ জানাল সে। ‘দক্ষিণে গোলাগুলি হয়েছে, শব্দ শুনলাম।’

মেলানির সঙ্গে চোখাচোখি হলো, দৃষ্টি সরিয়ে নিল এরিক। মেয়েটির দেওয়া কফি সানন্দে গ্রহণ করল ও। নিজের উপর এড মিচেলের অনুসন্ধানী দৃষ্টি অনুভব করছে, খুঁটিয়ে ওকে দেখছে লোকটা, চকিত চাহনি হেনেছে ওর জোড়া পিস্তলের উপর।

কফি খাওয়ার ফাঁকে এদের সম্পর্কে ভাবল এরিক ক্রেবেট। ও নিশ্চিত, দুটো দল এখানে এসে মিলিত হয়েছে, তবে নিশ্চিত নয় কারা কোন্ দিক থেকে এসেছে। কাহিল ঘোড়াটার যে-ট্র্যাক দেখেছে, সম্ভবত প্রথম যে-লোকটা ওকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, সে বা মেয়েটা ওটায় চড়েছিল। তবে মেয়েটার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

অ্যাপাচিদের হামলায় কোয়ার্নের দুই বন্ধুর মৃত্যুর ঘটনা খুলে বলল এড মিচেল। ‘এখানে থাকলে বোধহয় বিপদে পড়ব,’ শেষে বলল সে। ‘এই জায়গা চেনে ইন্ডিয়ানরা, পানির জন্য ওরাও আসবে এখানে।’

‘তা হলে গাঁট হয়ে বসে থাকো,’ পরামর্শ দিল এরিক। ‘ধাওয়া খাওয়ার চেয়ে বরং এখানে থাকাই ঢের নিরাপদ।’

‘আমার নাম এড মিচেল।’

সামান্য দ্বিধা করল এরিক। নিজের উপর মেলানির দৃষ্টি টের পেল ও, মেয়েটির দিকে ফিরে পরিচয় দিল।

নামটা শুনেছে মেলানি, তবে আর কিছু মনে পড়ল না। কোথায় শুনেছে তাও জানে না। ক্ষীণ সঙ্কষ্টির হাসি দেখা গেল মিচেলের মুখে, যেন নামটা শুনতে ভাল লেগেছে তার। কিছু একটা জানতে মুখ খুলেছিল ড্যান কোয়ান, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল।

‘পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা,’ জানাল ডেভিস। ‘শুনেছি ইন্ডিয়ানরা পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে।’

মিনিট কয়েক কেউই কিছু বলল না। ভাবছে এরিক, জানে যে একই ভাবনা মিচেলের মনেও বয়ে চলেছে—ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে আগাম কিছুই বলা সম্ভব নয়, যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে রেডস্কিনরা।

নিজের মতামত জানাল ড্যান। ‘এই জায়গাটা মন্দ নয়। ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে যাওয়ার পক্ষপাতী আমি।’

শ্রাগ করল বেন ডেভিস, ইশারা করল চিডলের দিকে। ‘ও-ও তো ইন্ডিয়ান...ওর ব্যাপারে কী বলবে?’

‘ইন্ডিয়ান, তবে ও পিমা গোত্রের,’ বলল মিচেল। ‘অ্যাপাচিদেরকে আমাদের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে পিমা।’

‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানই। ওকে বিশ্বাস করব কীভাবে?’

‘তোমাকে করব কীভাবে?’ মৃদু স্বরে বলল এরিক। ‘কিংবা আমাকেই বা বিশ্বাস করবে কীভাবে? আমরা সবাই যার যার অপরিচিত।’

রাগে জ্বলে উঠল ডেভিসের চোখজোড়া, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই কফির পট তুলে এরিকের কাপ ভরে দিল মেলানি। ‘আমি বিশ্বাস করি ওকে,’ বলল মেয়েটি। ‘বাবার কাছে শুনেছি পিমা খুব ভালমানুষ...তাবৎ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ভালমানুষ।’

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল টনি চিডল, সামান্য বিকারও নেই মুখে।

তাকে নিয়ে আলাপ, অথচ সামান্যও আগ্রহ বোধ করছে না, কিন্তু মেলানির মন্তব্যে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। পরে, ডেভিস অধৈর্য ভঙ্গিতে অন্যদিকে ফিরে তাকাতে মেলানির দিকে আবার তাকাল চিডল। 'তোমার স্বামী ও, ম্যা'ম?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সে।

'ন-না...এখনও বিয়ে করিনি আমরা। ঠিক করেছি ইয়োমা ক্রসিঙে গিয়ে বিয়ে করব।'

যুগলটাকে দেখে এমন কিছুই আঁচ করেছিল এরিক। বেন ডেভিস দারুণ সুদর্শন মানুষ, আচরণে বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। নিপাট ভদ্রলোক সে, কিন্তু তারপরও একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে যা মিলছে না, বড়সড় কোন অসঙ্গতি। কারণটা সুস্তবত তুমি, নিজেকে শুধাল এরিক, তুমিই ঈর্ষা করছ তাকে!

কফিতে চুমুক দেওয়ার সময় আনমনে হেসে উঠল এরিক।

হাসিটা খেয়াল করেছে মেলানি। না চাইলেও লোকটির প্রতি আগ্রহ বোধ করল। রোদপোড়া মুখ সুদর্শন না হলেও আকর্ষণীয় একটা কিছু আছে।

সক্ষম সমর্থ মানুষ এরা, ভাবছে এরিক। মিচেল, চিডল, কোয়ান এবং ডেভিস...সবাই লড়াকু লোক। লড়াই যদি করতেই হয়, এটাই হবে উপযুক্ত জায়গা। সঙ্গীদের উপর নিশ্চিত্তে নির্ভর করা যায়। উপরের কুয়ায় এসে ক্যান্টিন ভরে নিল এরিক, তারপর ছায়াঘেরা একটা জায়গা পছন্দ করল ঘুমানোর জন্য। জীবনে আর কিছু না হোক কয়েকটা অভ্যাস গড়ে নিয়েছে ও, কখনও ব্যতিক্রম করে না। পিস্তল সবসময় লোডেড রাখতে হয়, ক্যান্টিন থাকা উচিত পূর্ণ, খাওয়া পেলে দ্বিধা করতে নেই এবং সুযোগ পেলে ঘুমিয়ে নিতে হয়। সময়ের সদ্ব্যবহার না-করাই বোকামি। ভবিষ্যতে কী ঘটবে কেউই বলতে পারে না, সেক্ষেত্রে সর্বক্ষণ তৈরি থাকা উচিত।

চোখ বুজতে মেলানি রিওসকে মনে পড়ল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বেন ডেভিস খুবই ভাগ্যবান। আত্মবিশ্বাসী, ভদ্র, অভিজাত চালচলন...কিন্তু কী যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে লোকটার মধ্যে, ঠিক

খাপ খায় না। জিনিসটা ডেভিসের নিজস্ব, খেলো আচরণে নয়।

ঘুমিয়ে পড়ল এরিক।

ধীর গতিতে দিন গড়াচ্ছে। পাথর শুষে নিচ্ছে উত্তাপ, মরুভূমিতে তাপতরঙ্গ ঘোলাটে পর্দা তৈরি করেছে দৃষ্টিপথে, দূরে হৃদের ন্যায় মরীচিকা জ্বলজ্বল করছে। মাছির ভনভন শব্দে জেগে গেল এরিক, হাত ঝাড়া মেরে ফেলে দিল ওটাকে। মাটিতে পড়ে গড়ান খেল মাছিটা, টলমল পায়ে এগোল কয়েক কদম, তারপর ছুটে চলে গেল সহজ শিকারের উদ্দেশে। উঠে বসল এরিক, হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল।

টানা দুই ঘণ্টা পাহারা শেষে পাথুরে চাতাল থেকে নেমে এল এড মিচেল। 'পূবে ধুলো দেখলাম। বেশ কয়েকজন লোক। চার থেকে আটজন হতে পারে।'

'কত দূরে?'

'অন্তত ঘণ্টাখানেকের পথ তো হবেই... দ্বিগুণও হতে পারে। দেখে মনে হলো ধীরগতিতে এগোচ্ছে। তবে নিশ্চিত হতে পারিনি। জানোই তো, এ ধরনের আলোয় স্পষ্ট ঠাহর করা যায় না।'

ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য নীচের অ্যারোয়োতে চলে এল এরিক, ঘোড়ার সঙ্গে নিজেও পানি করল। উঠে মুখ মুছল ও, সিঁধে হতে সামনে মেলানি রিওসকে দেখতে পেল, ওকেই দেখছে মেয়েটা। নীরবে পরস্পরকে নিরীখ করল ওরা, একইসঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল 'দু'জন-যেন অদৃশ্য সম্মতি বিনিময় হয়েছে।

হতাশ ও অসন্তুষ্ট বোধ করছে মেলানি। ক্যাম্পে এসে পানি চড়াল কফি তৈরি করার জন্য। ব্যাঞ্চে অন্তত একটা জিনিস শিখেছে ও-পশ্চিমের মানুষ কফি পছন্দ করে। ছায়া আছে অ্যারোয়োর এমন এক জায়গায় এরিককে ঘোড়াটা নিয়ে যেতে দেখল ও। স্বচ্ছন্দ লোকটার চলাফেরা। মামুলি কাউহ্যান্ড বা ওরকম কিছু নয় সে, সিঁদ্বান্তে পৌঁছল মেলানি, আত্মবিশ্বাস আর অকপটতা অন্যদের মধ্যে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয় তাকে। মেলানি এটাও খেয়াল করেছে,

এরিকের সঙ্গে সমীহের সঙ্গে কথা বলছে মিচেল।

ক্রেবেট...অপ্রচলিত নাম...এরিক ক্রেবেট। পরিচিত মনে হচ্ছে নামটা, তবে মেলানি নিশ্চিত নয় আদৌ শুনেছে কি-না, কিংবা ঠিক কোথায় শুনেছে।

ওর পাশে এসে বসল ডেভিস। 'চলে যেতে পারলেই ভাল হত,' বলল সে। 'এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না। বিচ্ছিরি অবস্থা! দুঃখিত, আমার কারণেই এমন অবস্থায় পড়েছ তুমি।'

'দূর, এ-নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

'আমার তো মনে হয় অন্তত চেষ্টা করা উচিত। সকালে তরতাজা হয়ে উঠবে ঘোড়াগুলো। হয়তো ইয়োমা ক্রসিঙে পৌছতে সক্ষম হব আমরা।'

'কিন্তু ইন্ডিয়ানদের ফাঁকি দেবে কীভাবে, বেন?'

'এ-মুহূর্তে পূর্ব দিকে আছে ইন্ডিয়ানরা। মনে হয় না এতদূর আসবে ওরা। ফোর্টের কাছাকাছি গিয়ে বিপদে পড়ার ইচ্ছে নেই ওদের। তবে যাই হোক, ইন্ডিয়ানদের কারণে ফিরে যেতে বাধ্য হবে তোমার বাবা।'

'বাবাকে তো চেনো না!'

'যে-হারে রেইড করছে ইন্ডিয়ানরা, এমনকী তোমার বাবাও বাধ্য হবে ফিরে যেতে।'

'বেন, ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। পশ্চিমেও আসতে পারে ওরা। বাবার কাছে শুনেছি বহুবারই ফোর্টের কাছে চলে গিয়েছিল ওরা, সৈন্যদের নাকের ডগায় খুন করেছে লোকজনকে। উঁহুঁ, তুমি যা ভাবছ তা নয়, সৈন্যদের একটুও ভয় পায় না ওরা।'

পাথুরে চাতাল থেকে নেমে এল এরিক ক্রেবেট, কফি খেতে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'ধারে-কাছেই আছে ওরা,' মন্তব্য করল সে। 'মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে, কিংবা কারও জন্য অপেক্ষা করছে।'

কথাটা একটুও বিশ্বাস করেনি বেন ডেভিস। ‘ফালতু কথা বোলো না! উনুনের মত তেতে ওঠা মরুভূমিতে থাকবে কে শুনি?’

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল এরিক, শান্ত স্বরে বলল: ‘কয়েক ঘণ্টা আগেও ওই উনুনে ছিলাম আমরা।’

চার

শুকনো একটা ওঅশের কাছে পৌঁছে সৈন্যদের থামার নির্দেশ দিল সার্জেন্ট টমাস হ্যালিগান। ওঅশের তলায় আসা মাত্র যার যার জায়গায় শুয়ে পড়ল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত সৈন্যরা। সতীর্থদের ছেড়ে এগিয়ে গেল হ্যালিগান, ওঅশের উল্টো কিনারার ঢালে এসে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে দৃষ্টি চালাল।

দশ বছর বয়সে পশ্চিমে এসেছিল হ্যালিগান, তখন থেকে কাজে লেগে গেছে। ষোলো বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এখন, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে, পোড়খাওয়া দক্ষ সৈনিকে পরিণত হয়েছে। চাকুরির নয় বছর মরুভূমিতে কেটেছে, তাই মরুভূমি সম্পর্কে জানে সে। অভিজ্ঞতাটা মরুভূমিকে সমীহ ও ভয় করার জন্য যথেষ্ট।

ঘণ্টাখানেক আগে দক্ষিণে চলে যাওয়া ছোটখাট এক দল ইন্ডিয়ানের ট্র্যাক পেরিয়ে এসেছে ওরা। ট্র্যাকিং সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষতা না থাকায় হ্যালিগান বুঝতে পারেনি দলে ক’জন রেডস্কিন ছিল। অন্তত ছয়জন, অনুমান করেছে সে, তবে এটা নিশ্চিত বুঝেছে যে-দলটা আক্রমণ করেছিল ওদের, এরা সেই দলের নয়, বরং ভিন্ন দল। এলাকায় একই সময়ে ইন্ডিয়ানদের একাধিক দলের আনাগোনার

তাৎপর্য একটাই-সীমান্তের ধারে কোন ঘটনা ঘটেছে। ইন্ডিয়ান তৎপরতার খবর ফোর্ট ইয়োমাতে রিপোর্ট করার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে উপলব্ধি করল সার্জেন্ট হ্যালিগান।

উপুড় হয়ে বালির উপর শুয়ে আছে সে, লাগাতার ছোট্ট ছোট্ট মাঝে ক্ষণিকের এই বিরতিটুকু উপভোগ্য মনে হচ্ছে। ঠোঁটজোড়া শুকিয়ে ফেটে গেছে, চোখের চারপাশ লালচে রঙ ধারণ করেছে; সারা শরীরে এতটাই ক্লান্তি যে হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে। চাইছে বটে, কিন্তু হ্যালিগান জানে বাস্তবে হাল ছেড়ে দেবে না সে, কিংবা দেওয়াও উচিত হবে না। একই জায়গায় ঠায় পড়ে থাকল, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিপদের কথা ভাবল মনে মনে। নিজের শরীরের গন্ধে ঘেন্না ধরে গেছে ওর, বেশ কয়েকদিন গোসল করা হয়নি। ঘামের বিশ্রী গন্ধের সঙ্গে ঘোড়া আর গানপাউডারের গন্ধ মিলেমিশে গেছে। এমনকী নোংরা ইউনিফর্মটাকেও এখন আর প্রেরণা বা গর্বের কোন বস্তু মনে হচ্ছে না।

সব মিলিয়ে ওরা ছয়জন, ঘোড়া আছে মোটে তিনটা। বাড়তি রাইফেল, অ্যামুনিশন আর ক্যান্টিন বহনের জন্য ঘোড়াগুলোকে ব্যবহার করছে, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর থেকে পায়ে হাঁটছে সবাই। পাপাগো ওয়েল্‌স থেকে অন্তত ত্রিশ মাইল পশ্চিমে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই থেকে টানা হেঁটে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে, কিন্তু সামনের পথটুকুকে এই মুহূর্তে অনতিক্রম্য এবং যোজন দূরত্ব মনে হচ্ছে।

সৈনিক জীবনে ফোর্ট ইয়োমায় খুব কম সময়ই নিয়োজিত ছিল সে, স্বভাবতই টুকসনের পশ্চিমের এলাকা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হ্যালিগান। পানিই এখানে মুখ্য বিষয়। শেরিফের পাসি বাহিনীর একমাত্র জীবিত সদস্য, মার্ক ডুগানের কাছে জেনেছে কিপ্রিয়ানো ওয়েল নামে আরও একটা ভ্রগভীর কূপ রয়েছে...বছরের এই সময়ে ওটায় পানি থাকার সম্ভাবনা কম; কিন্তু এটাই ওদের শেষ আশা। পাপাগো ওয়েল্‌স পর্যন্ত যাওয়ার মত যথেষ্ট পানি যদি কিপ্রিয়ানো ওয়েলে পাওয়া যায়...

সামনে, দিগন্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া নিচু পাহাড়সারির নাম এণ্ডিয়া ডালস, কিপ্রিয়ানো ওয়েলের অবস্থান ওই পাহাড়ে। আসলে এ-ধরনের কূপ বা পুকুর হচ্ছে অগভীর খাদে বা গর্তে বৃষ্টিপাতের ফলে জমে যাওয়া পানি। পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারে না। সঙ্গে যে-পানি আছে, কিপ্রিয়ানোয় পৌঁছানোর আগেই শেষ হয়ে যাবে, জানে টমাস হ্যালিগান। কিপ্রিয়ানোয় যদি পানি না পাওয়া যায়, পাপাগো ওয়েল্‌সে যেতে হবে। সেটা সম্ভব হবে না, একরকম নিশ্চিত সে।

তাপ, পানিশূন্যতা আর লাগাতার পথচলার কারণে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সৈন্যরা। আধ-ঘণ্টার বিশ্রাম দিয়েছিল হ্যালিগান, সহকর্মীদের করুণ দশা ওকে দ্বিধান্বিত করে তুললেও উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল। এখানে বসে থাকলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

জড়সড় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সৈন্যরা।

‘কাছাকাছি থেকে সবাই,’ নির্দেশ দিল সার্জেন্ট। ‘আশপাশে আরও ইন্ডিয়ান থাকতে পারে।’

মাইল দুয়েক সৈন্যদের মার্চ করাল সে, তারপর থামার নির্দেশ দিল। ‘ডাফি, ব্লট, কেলার...ঘোড়ায় চড়ে তোমরা।’ অন্যদের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল হ্যালিগান। ‘হতাশ হয়ো না। পালাক্রমে সবাই ঘোড়ায় চড়ব আমরা। বাকি পথটা এভাবেই পেরোতে হবে।’

কিছু বলতে গিয়েও দ্বিধা করল মার্ক ডুগান, শেষে না-বলাই সাব্যস্ত করল। তিন ঘোড়ার একটা ওর, সেটা কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে যাবে কেন? করলেও, সার্জেন্ট নির্দেশ দেওয়ার কে? ছয়জনে মিলে বিপদ উতরে যেতে হবে, উপলব্ধি করল সে, এ-মুহূর্তে সাধারণ মানুষ বা সৈন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। খাটো, গাট্টাগোটা মানুষ মার্ক ডুগান; মাথা-মোটা, একগুঁয়ে এবং রগচটা বলে বদনাম আছে তার। সেনাবাহিনীর পোষ্ট স্থাপন আর ফেরি চলাচল শুরু হওয়ার পর প্রথম যারা ইয়োমায় বসতি করেছিল, ডুগান তাদের একজন।

ওঅশের তলা বেশ গভীর, আলগা বালিতে ভরা; তবে কিনারার

দিকে বালির সঙ্গে পাথর থাকায় হাঁটতে সুবিধা হচ্ছে। ওঅশ থেকে উঠে আসা তেমন কঠিন নয়, তবে খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে। বিপজ্জনক তো বটেই, হঠকারিও হবে কাজটা। সেধে বিপদে পড়ার ইচ্ছে নেই সার্জেন্ট হ্যালিগানের।

শরীর আর কাপড় ধুলোয় একাকার হয়ে গেছে সবার, কিন্তু ক্রম্বেপ করছে না কেউ। আসলে পানির চাহিদা, ক্লান্তি এবং ইন্ডিয়ানদের আচমকা আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়া অন্য কিছুতে আমল দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেওয়ার কথাও নয়। টলমল পায়ে এগিয়ে চলল ছয়জন মানুষ। অদৃশ্য কোন যাদুবলে আক্রান্ত হয়েছে যেন, ঘোরলাগা মানুষের মত একই ভঙ্গিতে এগিয়ে চলছে সবাই; উত্তাপ, ধুলো আর দূরত্ব সম্পর্কে অসচেতন।

হাঁটতে হাঁটতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল সার্জেন্ট হ্যালিগান। অ্যাপাচি চীফ চুরতি যে লোকবল সংগ্রহ করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিগ্গিরই মহা উৎসাহে আক্রমণ করবে। ইন্ডিয়ানদের তীব্র আক্রোশ আর প্রতিহিংসার শিকার হবে সাদারা, শত মাইলের মধ্যে কোন এলাকায় বাদ পড়বে না। সব মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেকের বেশি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু এই পঞ্চাশজনই নরক নামিয়ে আনতে সক্ষম। এদেরকে কোনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে আকস্মিক কিন্তু তীব্র এই বিশৃঙ্খলা রোধ করা সম্ভব। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারছে হ্যালিগান—যত দ্রুত সম্ভব ফোর্টে গিয়ে কমান্ডিং অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

ইন্ডিয়ান আক্রমণের প্রথম তোপে পড়বে বিচ্ছিন্ন বাথান বা খনির লোকজন। সাহায্য পৌঁছানোর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এরা। সৌভাগ্যবান কয়েকজন যদি পালাতে পারে, হয়তো ইয়োমা বা টুকসনে পৌঁছতে পারবে।

সূর্যাস্তের একটু আগে কিপ্রিয়ানো ওয়েলে পৌঁছল সার্জেন্টের দল।

মূল দল থেকে একটু আগে রয়েছে মার্ক ডুগান, স্কাউটের দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদের এগোতে দেখে হাত তুলে থামার ইশারা করল

সে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে ট্র্যাক জরিপ করতে শুরু করল।
'এখানে এসেছিল ওরা, সার্জেন্ট,' একটু পর ফলাফল জানাল সে।
'সঙ্গে একজন বন্দি ছিল।'

ডুগানের দেখানো ট্র্যাক খুঁটিয়ে দেখল হ্যালিগান। ইন্ডিয়ানদের
পায়ের ছাপের সঙ্গে মিশে গেলেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বন্দি একজন
মহিলা...সাদা মহিলা।

কূপের কাছে চলে গিয়েছিল টেরিল ডাফি, ফিরে এসে রিপোর্ট
করল সে: 'বেশি নেই, সার্জেন্ট। যা আছে, ক্যান্টিন ভরার পর
ঘোড়াগুলোকে খাওয়ালে শেষ হয়ে যাবে সব পানি।'

'পাঁচ কি ছয়জন ইন্ডিয়ান ছিল,' মৃত মিউলটাকে দেখিয়ে বলল
ডুগান, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ওটা থেকে। 'মিউলটাকে জবাই করার জন্য
এখানে থেমেছিল ওরা। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়েছে।'

নিজের অসহায়ত্বে অস্থির বোধ করছে সার্জেন্ট। মেয়েটাকে
সাহায্য করবে কী, নিজেদেরই বেহাল দশা! সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘোড়া, খাবার
বা অ্যামুনিশন ছাড়া ইন্ডিয়ানদের পিছু নেওয়া দারুণ বোকামি হবে।
'কী বুঝলে, ডুগান?' জানতে চাইল সে।

মিনিট কয়েক সার্জেন্টের দেখানো ট্র্যাক খুঁটিয়ে দেখল ডুগান,
শেষে বলল: 'মেয়েটা পালিয়ে গেছে। বোধহয় ইন্ডিয়ানরা ভরপেট
খেয়ে ঘুম দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল ও, তারপর চুপিসারে কেটে
পড়েছে।'

'একটা ঘোড়া নিয়ে গেলেই পারত!' মন্তব্য করল ডাফি।

'হয়তো ইন্ডিয়ানরা জেগে যাবে বলে নেয়নি। পায়ে হেঁটে চলে
গেছে মেয়েটা।'

চিহ্ন দেখে বোঝা গেল মেয়েটাকে অনুসরণ করেছে অ্যাপাচিরা।
ভাগ্য নেহাত সুপ্রসন্ন না হলে এতক্ষণে ধরাও পড়ে গেছে বোধহয়।
ফিল্ডগ্লাস তুলে বিস্তীর্ণ মরুভূমির যতটুকু সম্ভব, খুঁটিয়ে নিরীখ করল
সার্জেন্ট; কিন্তু তাপতরঙ্গের কারণে বেশিদূর দেখতে পাচ্ছে না,
দৃষ্টিসীমায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচণ্ড দাবদাহ। আসলে কিছুই করার

নেই ওদের, তিজ্ঞ মনে ভাবল টমাস হ্যালিগান, যা ঘটার কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটে গেছে।

‘শেষ রাতের দিকে রওনা দিয়েছিল,’ বলল মার্ক ডুগান। ‘মনে হয় না ধরা পড়ার আগে বেশিদূর যেতে পেরেছে মেয়েটা।’

‘হয়তো,’ নিজেই ট্র্যাকগুলো খুঁটিয়ে দেখল সার্জেন্ট। ‘নাক বরাবর ধীর গতিতে এগিয়েছে মেয়েটা। চালাক মেয়ে। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেনি। জানত যে ছোট্টাছুটি করলে মরুভূমিই খুন করে ফেলবে ওকে। আমার তো মনে হয় একটা সম্ভাবনা আছে ওর।’ মুখ তুলে সহযোদ্ধাদের দিকে তাকাল সে। ‘বেশ, ক্যান্টিন ভরা হয়ে গেলে রওনা দেব আমরা।’

‘সার্জ,’ প্রস্তাব করল ডাফি। ‘আমাদের দুই বা তিনজন যদি ঘোড়ায় চড়ে পিছু নেয়, হয়তো সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার আগেই মেয়েটাকে বাঁচাতে পারব।’

‘উঁহুঁ, আলাদা হওয়া চলবে না। একসঙ্গে থাকব আমরা।’

মুখ আর ঘাড়ে ঘামের ধারা নামছে, টের পেল হ্যালিগান। দুস্তর মরুভূমিতে কতদূর যেতে সক্ষম হবে কমবয়সী মেয়েটা, তাও রাতের বেলা? পায়ে হেঁটে দুর্ধর্ষ অ্যাপাচিদের ফাঁকি দেওয়া আদৌ সম্ভব? সমর্থ, অভিজ্ঞ পুরুষমানুষ হলে না হয় কথা ছিল। বুদ্ধি করে যদি কোথাও লুকিয়ে পড়ে, কিছুটা হলেও সম্ভাবনা থাকবে; মেয়েটাকে খুঁজে না পেলে হয়তো চলে যাবে অ্যাপাচিরা।

ক্লান্ত সৈনিকদের সার বেঁধে দাঁড়াতে দেখল সার্জেন্ট। মিনিট খানেকের মধ্যে রওনা দিল ওরা।

অস্তমান সূর্যকে সামনে রেখে পশ্চিমে এগোল ওরা। শিগ্গিরই অন্ধকার নামবে। ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত সবাই, কিন্তু তারপরও, মার্চ শুরু করার পর এই প্রথম কিছুটা হলেও উৎসাহ নিয়ে এগোচ্ছে। গোমড়ামুখো একগুঁয়ে জেফ কেলারও দ্রুত পা ফেলছে, যেন বুঝতে পেরেছে দুর্ভোগের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা।

সারারাত ধরে এগিয়ে চলল ছোট্ট দলটা। দু’বার ঘণ্টাখানেকের

জন্য থেমে ঘুমানোর সুযোগ দিয়েছে সার্জেন্ট। ক্লাস্তির চরমে পৌঁছে গেছে সবাই, পা আর চলছে না, কিন্তু নেতার দায়িত্ব ছাড়াও বাড়তি একটা দায় রয়েছে টমাস হ্যালিগানের—ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটার কথা ভুলতে পারছে না...একটু নাগাড়ে চললে হয়তো সময়মত পৌঁছতে সক্ষম হবে ওরা।

কিপ্রিয়ানো ওয়েল থেকে পানি পেয়েছে, কিন্তু এতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে গিয়ে নিজেদের শক্তি আর সামর্থ্যও বিসর্জন দিতে হয়েছে। উত্তাপ এবং মরুভূমি কেড়ে নিচ্ছে ওদের শক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে লাগাতার হাঁটা বা মার্চ করার অবসাদ। যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। বলতে গেলে পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই চলার মধ্যে রয়েছে—যে-কোন বিচারে নির্মম নিষ্ঠুরতা বলা চলে, কিন্তু কেউই অভিযোগ করছে না। সবাইকে বাঁচানোর জন্য এই দুর্ভোগ—জানে ওরা—চেষ্টা করছে সার্জেন্ট, যদিও সাফল্য অনিশ্চিত।

পুবাকাশ যখন ধূসর হয়ে এসেছে, তখন ওদের প্রতি প্রথম দয়া হলো ভাগ্যদেবীর—দুর্ভাগ্যের শেকলটা ছিন্ন হলো ক্ষণিকের জন্য। বোল্ডারসারি পেরিয়ে খোলা জায়গায় পা রাখবে, এসময় একটু দূরে একটা পানির পিঠে দেখতে পেল এক ইন্ডিয়ানকে। ঘোড়ার পিঠে ঠায় বসে আছে সে, এতটুকু নড়ছে না, সামনের পাথুরে ঢালে কোন কিছুর উপর স্থির হয়ে আছে সমস্ত মনোযোগ। সার্জেন্টকে হাত তুলতে দেখে নিঃশব্দে থেমে গেল অন্যরা।

ত্রিশ গজ দূরে বোল্ডারের আড়ালে কিছু দেখছে ইন্ডিয়ান। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরেক রেডস্কিন, সতর্কতার সঙ্গে এগোল লক্ষ্যের দিকে। জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে না সৈন্যরা।

সার্জেন্টের ইশারা পেয়ে পাথুরে ঢালের দিকে এগোল ডাফি, ব্লট আর কেলার; এমন পথ বেছে নিয়েছে যাতে ইন্ডিয়ানদের চোখের আড়ালে থাকতে পারবে। অন্য দু'জন এগিয়ে এসে হ্যালিগানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

অপেক্ষায় থাকল সার্জেন্ট। ইন্ডিয়ানরা যদি ওদের আগেই মেয়েটাকে খুঁজে পায়, ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে পরিস্থিতি, কারণ সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে ওরা যদি আক্রমণ করে, সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে হতভাগী। আক্রমণ যদি করতেই হয়, সবার আগে দুই ইন্ডিয়ানকে খোলা জায়গায় পেতে হবে...

‘গুলি চালাও!’

নির্দেশটা শেষ দিকে ঢাকা পড়ে গেল রাইফেলের সম্মিলিত গর্জনে। পানির পিঠে আসীন ইন্ডিয়ানের শরীর ঝাঁকি খেল বার দুয়েক, তারপর ভোঁতা শব্দে আছড়ে পড়ল বালিময় মাটিতে। ঢালের উপর, দুই পদক্ষেপ এগোল দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান। বুলেটের ধাক্কায় পাথুরে মাটিতে ভূপতিত হলো সে, ঢাল ধরে গড়িয়ে নেমে এল শরীরটা, রক্তের ধারা ফেলে এল পিছনে।

একেবারে ডানে রয়েছে টেরিল ডাফি। আচমকা গুলি করল সে, পরপর দু’বার।

কাছাকাছি আরও ইন্ডিয়ান থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করা বোকামি জেনেও চিৎকার করল সার্জেন্ট হ্যালিগান। ‘এই যে, শুনতে পাচ্ছ?’

জোড়ায় জোড়ায় এগোল ওরা। পাথরের আড়াল থেকে একটা গুলি ছুটে এল, কিন্তু কারও গায়ে লাগল না। ততক্ষণে ছুটে কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। সবার আগে পৌঁছল জেফ কেলার, কোমরের কাছে ধরে রেখেছে রাইফেল। তবে তার আগেই গুলি করল টম হার্শ। বোল্ডারের ওপাশে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, ঝড়ের বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে নীরব হয়ে গেল জায়গাটা।

বোল্ডারের ফাঁক গলে উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল সৈন্যরা। দূরে তিন রেডস্কিনকে ঘোড়ায় ছুটে যেতে দেখতে পেল, একজন বেকায়দা ভঙ্গিতে বসেছে স্যাডলে, আহত হয়েছে নির্ঘাত। ধারে-কাছে পড়ে আছে তিনটা লাশ। কিছুটা হলেও সম্ভ্রষ্ট বোধ করল সার্জেন্ট। উচিত শিক্ষা দেওয়া গেছে বদমাশগুলোকে!

দুটো বোল্ডারের ফাঁকে ছোট্ট ফাটলে বসে ছিল মেয়েটা। নেহাত সঙ্কীর্ণ ফাটল, একটা বাচ্চার জন্যও বোধহয় যথেষ্ট নয়। সৈন্যদের দেখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, হেঁটে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। প্রায় শীর্ণদেহ মেয়েটার, পরনে এলোমেলো ধূলিমলিন কাপড়।

‘আমার নাম মিমি রজার্স,’ বলল মেয়েটা। ‘তোমাদের দেখে কী যে খুশি হয়েছি!’

পাঁচ

ভোরের উন্মেষে, লুকআউট থেকে দূরে ধুলো উড়তে দেখতে পেল এরিক ক্রেবেট। মরুভূমি আসলে মায়ার সমুদ্র, কতরকম ভেঙ্কি যে দেখায়! জানে বলেই অপেক্ষায় থাকল ও, যাচাই করতে চায় আসলেই ঠিক দেখেছে, নাকি দৃষ্টিভ্রম। ধুলো উড়তে দেখার একটু আগে রাইফেলের দূরগত শব্দ শুনেছে, কিন্তু এখানেও ভুল হতে পারে—হয়তো ভুল শুনেছে।

এত ভোরে আগন্তুকদের আসার দুটো তাৎপর্য—সারারাত চলার মধ্যে ছিল, এবং সেক্ষেত্রে, মোটামুটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এরা ইন্ডিয়ান নয়।

হালকা বাতাস বইছে, পরিবেশ ঠাণ্ডা...দক্ষিণে লাভার তৈরি বোল্ডারের আড়ালে ডেকে উঠল একটা কোয়েল। এরিক নিশ্চিত যে এটা আসল কোয়েলের ডাক। দু’দিন আগের রাতে এমনই ডাক শুনেছিল, তবে আসল কি-না, এ-নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল ও।

বিস্তীর্ণ লাভার চাঙড়ের দিকে তাকাল এরিক। দিগন্ত ছাড়িয়ে চলে

গেছে লাভাভূমি, ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।
মেক্সিকানরা এটাকে বলে সিঁদুরের সাগর! যথার্থ নাম।

ক্লান্তিহীনভাবে লাভার চাঙড় আর বালিয়াড়ি খুঁটিয়ে দেখছে এরিক,
খুঁটিনাটি কোন জায়গা বাদ দিচ্ছে না, একই জায়গা জরিপ করছে
বারবার। একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ও, অদৃশ্য কেউ নজর রাখছে
ওদের উপর। সমস্যার কথা হচ্ছে, প্রতিপক্ষের অবস্থান ওর জানা
নেই।

কেথায় লুকিয়ে আছে তারা?

খুবই ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে আগন্তুকরা, উড়ন্ত ধুলো প্রায়
আটকে আছে বাতাসে, থিতুয়ে আসতে সময় লাগছে। এত ধীর গতির
কারণ একটাই হতে পারে—দলে সবাই অশ্বারোহী নয়, কেউ কেউ
হাঁটছে নিশ্চই। ধুলোর মেঘের মাঝখানে নীল রঙের ঝিলিক দেখেছে
মনে হলো ওর। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আবার, কিন্তু নিশ্চিত
হতে পারল না।

পিছনে পাথরে বুটের সংঘর্ষে হালকা শব্দ হলো, ছায়া পড়ল ওর
পাশে। ছায়াটা মেলানি রিওসের, দেখে চিনতে পারল এরিক। কপালে
হাত ঠেকিয়ে চোখ কুঁচকে দূরের ধুলোর স্তম্ভটা দেখছে মেয়েটি।

বগলে রাইফেল গুঁজে উঠে দাঁড়াল এরিক। 'আমার মনে হচ্ছে ওরা
সেনাবাহিনী,' বলল ও। 'তবে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে।'

'একটা মেয়ে আছে ওদের সঙ্গে।'

ব্যাপারটা ওর মাথাব্যথা নয় জেনেও অজানা কারণে হঠাৎ প্রশ্নটা
করে বসল এরিক। 'সত্যি কি ওকে বিয়ে করবে তুমি?'

ধীরে ধীরে পাশ ফিরল মেলানি, ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত ও সরাসরি দৃষ্টিতে
দেখল ওকে। 'এটা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত বিষয়, মি. ক্রেবেট।'

'নিশ্চই।'

'নিপাট ভদ্রলোক ও,' যোগ করল মেলানি, পরমুহূর্তে সাফাই
গাইছে বলে নিজের উপর রেগে গেল। 'দ্রুত সবকিছু শিখে নিচ্ছে ও।'

'ওর ঘোড়াটাও শিখছে। কী জানো, এই এলাকায় রাইড করার

জন্য সঙ্গী হিসাবে কখনোই ওকে বেছে নেব না আমি।’

‘এখানে থাকার ইচ্ছে নেই আমার।’

মেলানির মন্তব্যে ত্যক্ত বোধ করছে এরিক। ‘থাকতে চাইছ না কেন? প্রথম থেকে বসতি করেছে যারা, দেশটাকে নিজের হাতে গড়ে নিয়েছে, তোমার বাবা তাদেরই একজন। এলাকাটাকে রীতিমত ভালবাসে সে।’

‘হ্যাঁ, এখানে কীভাবে বসতি করতে হয়, সেটা নিজের চোখে দেখেছি আমি। বিশ্বাস করো, পদ্ধতিটা একটুও ভাল লাগেনি। কেমন লেগেছে, মনে হয় না আমার অনুভূতি বুঝতে পারবে তুমি, মি. ক্রেবেট।’ সরাসরি এরিকের চোখে চোখ রাখল মেলানি। ‘তুমি কী ধরনের লোক, সেটাও ভাল করে জানা আছে আমার।’

‘তাই?’ চোখ কুঁচকে লাভা আর বালির সমুদ্র নিরীখ করছে এরিক। ‘উঁহু, মনে হয় না আমার মত মানুষদের বা এই এলাকা সম্পর্কে জানা আছে তোমার। বুনো এলাকায় বসতি করতে হলে মনের জোর থাকতে হয়, মিস্ রিওস, দৃঢ়চেতা এবং একইসঙ্গে ভালমানুষ না হলে টিকে থাকা যায় না। তোমার বাবা ওই ধরনের লোক। তুমি ঠিক উল্টো প্রকৃতির, এখান থেকে চলে গেলেই বোধহয় ভাল হবে তোমার জন্য। হটহাউসের একটা ফুল তুমি, খুব কোমল, আদুরে, আকর্ষণীয় কিন্তু অকেজো।’

‘তোমার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না।’

‘রাখটাকের কি কোন দরকার আছে?’ সিগারেটের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল এরিক, চোখের কোণে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়তে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল ও। টানটান হয়ে গেছে শরীর, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। ঝোপের কিনারে একটা পোকাকার সঙ্গে ক্ষীণকায় এক গিরগিটিকে ধস্তাধস্তি করতে দেখে পেশিতে তিল পড়ল ওর। ‘যেখানে যেতে চাইছ, সেখানে সুন্দরী কিন্তু অকেজো মেয়েদের চায় পুরুষরা। ক্ষণিকের প্রমোদের জন্য খেলনা চায় ওরা। এখানেও ওই ধরনের মেয়ে আছে, তবে তাদের ভিন্ন নামে ডাকি আমরা। বাড়ির

কাজকর্ম সামলাবে, প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, এমন মেয়ে চাই আমরা।’

‘তোমার কি ধারণা আমি সেটা পারি না?’

‘হয়তো পারো। তুমি কি ছেড়ে চলে যাচ্ছ না? পালাচ্ছ না?’

‘আমাকে ছাড়াই চলে যাবে বাবার। বহু বছর চলে এসেছে যখন, ভবিষ্যতেও চলবে তার।’

‘সম্ভবত এই বহু বছরে সে প্রত্যাশা করেছে কোন একদিন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি। কী মনে হয় তোমার, কেন এমন বেগার খাটছে তোমার বাবা? তোমার জন্য, তোমার বাচ্চাদের জন্য...যদি আদৌ কখনও বাচ্চার মা হও তুমি।’

নিজের অজান্তে রোগে গেছে এরিক, উপলব্ধি করতে পারছে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না। অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে। ‘ওর ব্যাপারে কী বলবে?’ বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে ঘুমন্ত বেন ডেভিসকে দেখাল ও। ‘ও-ও কি পালাচ্ছে না? থেকে গিয়ে তোমার বাবার মুখোমুখি হলো না কেন? মুখের উপর বলে দিলেই পারত তোমাকে বিয়ে করবে, সে মেনে না নিলে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে ও?’

‘আমার বাবাকে তো চেনো না!’

মেলানির নির্লিপ্ততাই ওর রাগের কারণ, ব্যাপারটা অনুধাবন করে স্মিত হাসল এরিক। ‘হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কিন্তু তোমার বাবার ধাতটা জানি আমি। এও জানি যে হাজারবার জন্মালেও ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বেন ডেভিস, অতটা বুকের পাটা নেই তার। ওর সম্পর্কে আমার ধারণাটা শুনবে? বোধহয় তুমিও একই ধারণা পোষণ করছ।’

রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেছে মেলানির দেহ। ইচ্ছে করছে চলে যায় এখান থেকে, কিন্তু তা হলে নিজের পরাজয় স্বীকার করা হয়; উপরন্তু, এরিক ক্রেবেটের প্রতিটি ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হবে। কড়া একটা কিছু বলা দরকার, মরিয়া হয়ে চিন্তা করল ও, কিন্তু মাথায় আসছে না!

কাছে চলে এসেছে সৈন্যরা, খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে এখন।

হঠাৎ মুখ খুবড়ে পড়ে গেল একজন, নিজের চেষ্ঠায় খাড়া হলো আবার।

‘নিজেকে যদি এতই করিৎকর্মা আর চৌকস ভেবে থাকো, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, নীচে গিয়ে ওদের সাহায্য করলেই পারো?’

‘ছোট্ট একটা গল্প বলি, ম্যা’ম। সত্য ঘটনা। নীল পোশাক পরা সৈন্যদের আসতে দেখে দেখা করতে এগিয়ে গিয়েছিল আমার দাদা, কাছে গিয়ে দেখে ওরা আসলে ইন্ডিয়ান। মৃত সৈন্যদের পোশাক নিজেরাই গায়ে চাপিয়েছে। উঁহু, ওদের সাদা চামড়া দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি।’

পাথুরে লাভার উপর সিগারেটের শেষাংশ ফেলে বুটের ডগা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলল এরিক।

ব্যাপারটা খেয়াল করল মেলানি। একই চণ্ডে, অবিকল একই উপায়ে বাবাকে এভাবে সিগারেট নেভাতে দেখেছে ও, ব্যাপারটা খেপিয়ে তুলল ওকে।

বোল্ডারের উপর উইনচেস্টারের ব্যারেল রাখল এরিক। ‘ব্লেশ, এবার থামো! তোমরা কে?’ ওর কণ্ঠ চড়া না হলেও শুনতে পেল সৈন্যরা, আচমকা থমকে দাঁড়াল সবাই।

ধুলো থিতিয়ে আসছে। গাট্টাগোটা শরীরের একজন অন্যদের ছেড়ে এগিয়ে এল দুই কদম। ‘আমি সার্জেন্ট টমাস হ্যালিগান, ইউনাইটেড স্টেটস ক্যাভালরি। আমার সঙ্গে চারজন সৈন্য আর দু’জন সাধারণ নাগরিক। তোমাদের পরিচয় কী?’

‘চলে এসো, সার্জেন্ট! আমাদের পরিবারে স্বাগতম!’

ঘুম থেকে জেগে গেছে ড্যান, চিডল আর ডেভিস। সৈন্যদের ক্যাম্পে ঢুকতে দেখল ওরা।

সবার শেষে, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিছানা ছাড়ল ডেভিস, খেয়াল করল মেলানি। এরিকও দেখেছে ঘটনাটা, বুঝতে পেরে খেপে গেল ও, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না সে, স্থিত হেসে অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল এরিক, মনোযোগ দিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে অন্যদের উত্তেজিত আলাপ শুনছে। ঠিক কী ঘটেছে, জানার জন্য সার্জেন্টের দলের সঙ্গে আলাপ করার প্রয়োজন বোধ করছে না ও, সৈন্যদের দশা দেখে দিব্যি বুঝতে পারছে। অলস আলাপে মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে, অথচ দারুণ বিপজ্জনক পরিস্থিতি এটা-যে-কোন সময়ে হামলা করতে পারে ইন্ডিয়ানরা। সত্যি যদি তাই হয়, ভরাডুবি ঠেকানো যাবে না, কারণ সৈন্যদের দলভুক্তির উত্তেজনায় মনোযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে ওদের।

স্বস্তির বিষয়, তেমন কিছু ঘটল না। মরুভূমিতে দৃষ্টি রাখল ও, মনে মনে ভাবছে জিম রিওসের কথা।

খ্যাতি শুনে প্রতাপশালী এই ব্যাংগরকে চেনে এরিক। তবে রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর মানুষ হিসাবেও কুখ্যাতি রয়েছে জিম রিওসের। সব মিলিয়ে ভালমানুষই বলা চলে। অহঙ্কারী হতে পারে, কিন্তু দান্তিক নয়। অকপট, শান্তিপ্ৰিয় ও স্পষ্টভাষী। এ-ধরনের মানুষের ধাত জানা আছে ওরু। এরিকের ধারণা জিম রিওস মানুষ হিসাবে প্রায় ওরই মত।

নির্জন, বুনো অঞ্চলে বসতি করা চাট্টিখানি কথা নয়—দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল, দুর্জয় মানসিকতা; অ্যাপাচি আর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে হয় বেপরোয়া ঔদ্ধত্য, জেদ ও সহিষ্ণুতা নিয়ে; এখানে জীবন হয় নিঃসঙ্গ, কঠিন-মেয়েলি সামাজিকতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বাড়ির আরাম-আয়েশ, নিরাপত্তা বা খুঁটিনাটি জিনিস, কোনটাই পাওয়া যায় না মরুভূমিতে; তবে ঘরে একজন নারীর উপস্থিতিতে এর সবই যোগাড় করতে প্রেরণা পায় পুরুষরা। ঘরে একজন নারীর উপস্থিতিই মূল ব্যাপার।

মেলানি রিওসকে যা বলেছে, সেসব সত্য বলে বিশ্বাস করে এরিক। নিঃসন্দেহে মেয়ের জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছে জিম রিওস, ভেবেছে মেয়ের ছোঁয়ায় বদলে যাবে তার বাড়ি; মেয়ে বিয়ে করবে, নাতি-নাতনি হবে—বুড়ো একজন মানুষের জন্য এটাই সবচেয়ে স্বস্তি ও আনন্দের উপলক্ষ্য। জিম রিওসের মত এমন বহু মানুষ

দেখেছে এরিক, যাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

ওর বদলি হিসাবে পাহারা দিতে চলে এসেছে ড্যান কোয়ান। কোন বাক্য বিনিময় হলো না দু'জনের মধ্যে। নীচে নেমে এল এরিক, এবং পড়বি তো পড় একেবারে ঝামেলার মধ্যে!

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে এড মিচেল, কোমরের পাশে স্থির হয়ে আছে দু'হাত, ড্র করার জন্য তৈরি। মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে, নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ সে।

কয়েক গজ দূরে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মার্ক ডুগান।

'এভাবেই যদি মরার ইচ্ছে থাকে তোমার, আমার কী করার আছে!' নিস্পৃহ স্বরে বলল ডুগান, পিস্তলের বাঁট ছুঁছুঁই করছে তার হাত।

'খামো!' চাবুকের মত তীক্ষ্ণ শোনাল এরিকের কণ্ঠ। 'বোকার হদ্দ! নিজেদের বিপদের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে বসে আছ?'

'এই ব্যাটা ফেরারী!' একগুঁয়ে স্বরে বলল ডুগান। 'একেই তাড়া করছিলাম আমরা।'

'বুলেটের অপচয় করার দরকার নেই,' উপদেশ দিল এরিক। 'এখান থেকে বেরোনোর আগেই দেখবে একে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছ তোমরা।'

'বেজন্মা আউটলটার পক্ষ নিচ্ছ তুমি?'

'না বিপদ কেটে গেলে, নিরাপদে যদি বেরিয়ে যেতে পারি সবাই, তখন ফয়সালা করে নিয়ো তোমরা, একটুও আপত্তি করবে না কেউ। এবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো।'

'নিজেকে কী মনে করো তুমি, অ্যা?'

'মি. ডুগান,' মুখ খুলল সার্জেন্ট হ্যালিগান। 'তোমার জায়গায় থাকলে ওর কথা শুনতাম আমি। অযথা ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার? কষ্ট করে এতদূর এসেছি, সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো লোকালয়ে ফিরে যেতে পারব আমরা। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে সম্ভাবনাটা নষ্ট করা উচিত হবে না।'

সার্জেন্টের কথায় কোন লাভ হয়েছে বলে মনে হলো না। ভীষণ জেদী মানুষ মার্ক ডুগান। ইয়োমা থেকে বেরোনোর আগে ডেপুটি হিসাবে শপথ করেছে, নির্দিষ্ট একটা মিশন ছিল, কাজটা শেষ করাই তার লক্ষ্য। পাসি বাহিনীর মধ্যে কেবল সে-ই বেঁচে আছে, এটাও আমল দিচ্ছে না ডুগান। ‘বেঠিক কিছু বলিনি আমি, কিংবা বেআইনী কাজও করছি না। এড মিচেল নামের এই লোকটা ফেরারী, আইন খুঁজছে ওকে।’

‘আইনী দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে খুন হয়ে যাবে তুমি,’ ঠাণ্ডা স্বরে বলল মিচেল।

হিমশীতল চাহনিত্তে তাকে দেখল এরিক। ‘চুপ করো!’ কৰ্কশ হয়ে গেল ওর কণ্ঠ। ‘ডুগান, এক কাপ কফি গিলে চাঙা হয়ে নিলেই পারো তুমি।’

রাগে লালচে হয়ে গেল মার্ক ডুগানের মুখ, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে আগুনের কাছে চলে গেল সে।

ডুগানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এড মিচেল, চাহনি বা মুখ দেখে বোঝা গেল না মনে কী ভাবনা চলছে। তামাকের দলা থেকে এক টুকরো কামড়ে মুখে পুরল সে। ‘ধন্যবাদ, ক্রেবেট। কী জানো, ইয়োমার লোকজন যদি ওদের ঝামেলাবাজ ছেলেদের লাইনে রাখত, তা হলে কোন বিপত্তিই ঘটত না। স্রেফ অচেনা বলে আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল ওরা, ধরে নিয়েছিল সহজে শিকার করতে পারবে।’

‘সেটা তোমার সমস্যা,’ নিস্পৃহ স্বরে বলল এরিক। ‘যতক্ষণ একসঙ্গে আছি আর বিপদ না কাটছে, ডুগানের কাছ থেকে দূরে থাকো।’

পাথরের কাছে চলে এল এরিক। সবে মাত্র শুরু হয়েছে, আনমনে ভাবল ও। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই শুরু হলে সব ভুলে যাবে এরা, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত কামড়াকামড়ি লেগেই থাকবে।

আগুনের ধারে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল সার্জেন্ট।

‘মাথামোটা বোকার হৃদ ওরা। ধন্যবাদ, ক্রেবেট, সময়মত ওদের থামিয়েছ তুমি।’

ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল এরিক, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। ‘ঘোড়ার দিকে খেয়াল রাখতে হবে সবসময়,’ বলল ও। ‘ইন্ডিয়ানরা স্ট্যাম্পিড করতে পারে, যাতে পায়ে হাঁটতে বাধ্য হই আমরা। নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটা করাল তৈরি করতে হবে আমাদের। ইন্ডিয়ানরা থাকুক বা না-থাকুক, ঘোড়া না থাকলে কখনোই ইয়োমায় পৌঁছতে পারব না আমরা।’

চিন্তিত মনে সায় জানাল সার্জেন্ট। ‘ঠিকই বলেছ। ভাবছি পাহারা দেব কীভাবে। আমার লোকজন এত ক্লান্ত...’

উঠে দাঁড়াল এরিক, চড়া স্বরে কথা বলল যাতে সবাই শুনতে পায়। ‘ঘোড়াগুলোকে রাখার জন্য একটা করাল তৈরি করতে হবে আমাদের। স্বেচ্ছায় কাজ করতে চাও কেউ?’

সবার আগে উঠে দাঁড়াল এড মিচেল। মিচেলকে চোখের আড়াল করতে নারাজ দুগান, তাই সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়াল। একে একে উঠে দাঁড়াল ডেভিস, ডাফি এবং কেলার। সবাইকে নিয়ে অ্যারোয়োয় নেমে এল এরিক। ঘন ঝোপের একটা দেয়াল খুঁজে পেয়ে, ওকটিয়ার লম্বা ডাল জুড়ে দিল ঝোপের সঙ্গে। ঝোপের শাখাপ্রশাখা বাঁধল পরস্পরের সঙ্গে। এরিকরা কী করছে, দেখে এগিয়ে এসে হাত লাগাল অন্যরা।

গভীর অ্যারোয়োর তলা উনুনের মত তেতে আছে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। ধীরে-সুস্থে টানা কাজ করে চলল ওরা, সবার মিলিত চেষ্টায় টেকসই একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে গেল, এমনকী কোন ঝাঁড়ও ভাঙতে পারবে না ওটা। দু’একটা ফাঁকফোকর ছিল, সেগুলো ভরাট করল পাথর বসিয়ে।

কাজ শেষ হতে, এরিকের পাশে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল সার্জেন্ট হ্যালিগান। দম বন্ধ করা গরম পড়ছে। ‘কখনও আর্মিতে ছিলে নাকি?’

‘একবার, খুব অল্প সময়ের জন্য।’

‘যা পরিস্থিতি, একজন নেতা না হলে চলছে না।’

‘ডেভিস বোধহয় কনফেডারেট বাহিনীতে ছিল,’ প্রস্তাব করল এরিক। ‘সে-ই তো নেতা হতে পারে।’

‘উঁহু, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ে অভিজ্ঞ এমন একজন লোক দরকার আমাদের,’ দৃষ্টি নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল সার্জেন্ট। ‘এক ক্রেবেটকে মনে পড়ছে, কর্নেল কুকের সঙ্গে কাজ করত, স্কাউটদের চীফ ছিল সে। তুমি নাকি?’

‘খুব অল্প দিনের জন্য।’

‘যথেষ্ট। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের চিনতে ভুল করত না কুক। যোগ্যতা আছে বলেই তোমাকে বেছে নিয়েছিল সে।’

‘তেমন কিছুই করতে হয়নি। সীমান্ত ধরে মেক্সিকোয় অভিযানে গেছি একবার।’

‘এই কাজে সেরা ছিল কুক।’ উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট। ‘যাক্গে, তোমার যখন অনীহা, ভোটাভুটি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমরা।’

আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করল সার্জেন্ট। যোগ্য একজন নেতা দরকার ওদের, যে ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে জানে, একইসঙ্গে নেতৃত্ব দিতেও সক্ষম। এরিক ক্রেবেটের নাম প্রস্তাব করল সে।

‘বেন ডেভিস,’ ঘোষণা করল মেলানি। ‘আমার তো মনে হয় ও-ই যোগ্য নেতা হতে পারে। কনফেডারেট বাহিনীতে কর্নেল ছিল ও।’

‘ক্রেবেটের পক্ষে আমি,’ বলল মিচেল।

ঝট করে মাথা তুলল ডুগান। ‘ডেভিস।’

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরিল ডাফি, চোখ মেলে একে একে সবার উপর দৃষ্টি চালাল সে। ‘ক্রেবেট,’ নামটা ঘোষণা করে চোখ বন্ধ করে ফেলল আবার।

ডেভিসের পক্ষে ভোট দিল কেলার, কিন্তু ইশারায় এরিককে দেখিয়ে দিল মিমি রজার্স।

‘ইউনিয়ন আর কনফেডারেট যাই হোক, আমি আর্মির পক্ষে,’

জানালা টম হার্শ।

আড়চোখে এরিকের দিকে তাকাল ডেভিস, ঠোঁটে মৃদু হাসি।
'তো?'

উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল সার্জেন্ট হ্যালিগান। 'ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি,' ঘুরে পাথরসারির দিকে তাকাল সে। 'এই যে, ছেলে! নেতা নির্বাচন করার জন্য ভোটাভুটি করছি আমরা। ডেভিস অথবা ক্রেবেট। তুমি কার পক্ষে?'

মরুভূমির উপর থেকে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরাল না ড্যান কোয়ান। 'ক্রেবেট,' জানিয়ে দিল সে।

'সমান সমান,' শ্রাগ করে বলল ডেভিস।

মাথা ঝাঁকিয়ে চুপচাপ বসে থাকা দোআঁশলার দিকে ইঙ্গিত করল এড মিচেল। 'ওর মতামতটা জেনে নাও। ও তো ভোট দেয়নি।'

'ইনজুনটার মতামত নেব?' বিহ্বল শোনালা ডুগানের কণ্ঠ।
'ইনজুনরা আবার ভোট দেওয়ার অধিকার পেল কবে থেকে?'

'গুলি যে করতে পারে, সে ভোটও দিতে পারবে,' বলল সার্জেন্ট।

'আমার আপত্তি নেই,' জানালা ডেভিস। 'তোমার কী মত, চিডল?'

আঙুল চালিয়ে বালিতে একটা গর্ত করছিল টনি চিডল। মুখ তুলে তাকাল সে, কালো চোখে নিষ্প্রাণ চাহনি। 'আমি ওর পক্ষে,' এরিককে দেখাল সে। 'আমার ধারণা ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে যথেষ্ট জানে ও।'

এরিকের দিকে ফিরল ডেভিস, মুখ নির্বিকার, মনে কী ভাবনা চলছে বোঝা গেল না। শ্রাগ করল সে। 'বেশ, ক্যাপ্টেন, এবার তোমার নির্দেশ শুনি?'

'সর্বক্ষণ ঘোড়ার সঙ্গে থাকবে দু'জন। প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর লোক বদল হবে লুকআউটে। বৃত্তাকার একটা জায়গাকে সীমানা নির্দিষ্ট করব আমরা, অনুমতি ছাড়া এর বাইরে যেতে পারবে না কেউ।' হ্যালিগানের দিকে ফিরল এরিক। 'সার্জেন্ট, খাবার আর অ্যামুনিশন চেক করবে তুমি। অনুমান নয়, সঠিক তথ্য জানতে চাই আমি।'

'ইয়েস, স্যার।'

পাহারা দিতে কোয়ানের জায়গায় চলে গেল এড মিচেল, ছেলেটা লুকআউট থেকে নেমে আসতে তাকে ডাকল এরিক। 'সুযোগ পেলে কথা বোলো মেয়েটার সঙ্গে,' বলল ও। 'এখনও ভয় কাটেনি ওর।'

'খাইছে! এ-কাজটা সবচেয়ে কঠিন মনে হয় আমার। তুমি বরং অন্য কিছু করতে বলো। এ-ব্যাপারে আনাড়ি আমি।'

'তোমার কথা শুনবে ও,' সামান্য দ্বিধা করল এরিক, শেষে খেই ধরল। 'বাচ্চা মেয়ে ও, ড্যান, কিন্তু পরিণত মহিলার মত আচরণ করার চেষ্টা করছে। একটু বেশিই চেষ্টা করছে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে মানা কোরো ওকে। কথাবার্তা চালিয়ে যাও কিছুক্ষণ, দেখবে কাজ হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট কোন বিষয় লাগবে না...স্রেফ কথা বললেই হবে। ভয় বা আতঙ্ক কেটে যাবে ওর। ইন্ডিয়ানরা আশেপাশে রয়েছে, স্বভাবতই এখনও আতঙ্কে আছে ও। মনে রেখো, ভুলেও ওর বা ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে কথা বলতে যেয়ো না।'

'জীবনে কখনও কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলিনি, জানিও না কী বলতে হবে!'

'আতঙ্কে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেছে ও। একটা কিছু নিয়ে কথা বললেই হবে, পরে ভেবে নিয়ো। ওর কাছাকাছি তোমার বয়স, নাচের অনুষ্ঠানে তোমার বয়সী ছেলেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ওর। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই পারবে ওর ভয় কাটাতে।'

'বেশ...চেষ্টা করব।'

পাথরের উপর উঠে এসে মরুভূমিতে দৃষ্টি চালানল এরিক। এড মিচেলের তামাকের অফার প্রত্যাখ্যান করল।

'ডুগানকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলল মিচেল। 'বিশ্বাস করো, ইয়োমার ঘটনাটা ফেয়ার ফাইট ছিল।'

'ওর কাছ থেকে দূরে থেকো।'

'অনেকের মত ডুগানও মনে করে অভিযুক্ত মানুষ মানেই দোষী ধ্যেৎ, ওকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমার, কিন্তু ওভাবে চড়াও হলে এলে কী করব আমি? দাঁড়িয়ে থেকে বুকে বুলেট নিতে তো পারি না

মনে হয় না সহজে হাল ছাড়বে ও ।’

‘ওর মুখোমুখি তোমার হতেই হবে ।’

এ-ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত এরিক । প্রচণ্ড একগুঁয়ে লোক মার্ক ডুগান, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত, অটল থাকতে অভ্যস্ত; কিংবা বিপদ বা ঝামেলার ভয়েও পিছিয়ে আসার মানুষ নয় । লোকটার সৎ গুণগুলোই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে ।

*

ক্যাম্পের চারপাশের এলাকা পরিদর্শন করল এরিক ক্রেবেট । ভিতরে ভিতরে অস্থির বোধ করছে ও । অ্যারোয়োতে তিন কূপের অবস্থান, ঢালের কারণে পর্যায়ক্রমে নিচু হয়ে গেছে জমি । প্রথম দুই কূপের দূরত্ব বা উচ্চতার পার্থক্য বেশি নয়; কিন্তু তৃতীয়টা বেশ দূরে, মাঝখানে প্রায় একশো ফুটের মত বিস্তৃতি পেয়েছে অ্যারোয়োটা । তৃতীয় কূপ ছাড়িয়ে, ঢালু জমি আর অ্যারোয়োর কিনারে ঘন ঝোপ জন্মেছে । সবচেয়ে উঁচু এবং ছোট কূপটার ঠিক উপরের জায়গাটা লুকআউট হিসাবে পছন্দ করেছে ওরা-লাভার চাঙড় আর বোল্ডারে ভরা । চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায় ওখান থেকে, গোলাগুলির সময়ও বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে । একটু নীচে ওকটিয়া আর ঝোপের তৈরি বেড়া, ঘোড়ার করালকে ঘিরে রেখেছে । খোলামেলা, বড়সড় জায়গা হলেও আক্রান্ত হলে সহজে প্রতিরোধ করা যাবে; কারণ প্রয়োজনে বাইরে থেকে চট করে ভিতরে ঢোকান জন্য বেড়ায় কয়েকটা ফাঁক রাখা হয়েছে, এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি না দিয়েই দূর থেকে ভিতরে চোখ রাখা সম্ভব । কিন্তু তারপরও, আশপাশে অনেক আড়াল রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করতে পারে শত্রুরা, এ-ব্যাপারে ইন্ডিয়ানদের দক্ষতা ঈর্ষণীয় ।

তবে পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব নয় । এতেই সম্ভ্রষ্ট থাকতে হবে ওদের ।

সন্ধ্যার একটু আগে মিমি রজার্সের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল ড্যান কোয়ান । কূপের পাশে অগভীর একটা পাথরের গর্ত রয়েছে,

বেসিন হিসাবে ব্যবহার করা যায়, ওটায় পানি জমিয়ে চুল ধুয়েছে মেয়েটি। এ-মুহূর্তে চুল শুকাচ্ছে।

‘তুমি আসায় বোধহয় খুশি হয়েছে মিস্ মেলানি,’ আড়ষ্ট স্বরে শুরু করল ড্যান, বুঝতে পারছে না প্রসঙ্গটা সঠিক হলো কি-না। ‘মন খুলে কথা বলার মত একজন তো পেয়েছে। সম্ভবত নিঃসঙ্গ বোধ করছিল ও।’

চুল নিয়ে ব্যস্ত থাকল মিমি, কিছু বলল না, এমনকী তাকালও না ড্যানের দিকে। কূপের পানিতে ছায়া ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, দেখতে পেল ড্যান।

‘জায়গাটা সুন্দর, নীরবও।’

কূপের পানিতে প্রতিবিম্ব দেখে আয়নার কাজ চালিয়ে নিচ্ছে মিমি, তবে প্রতিবিম্বটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

‘শুনেছি নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া আদর্শ জায়গা,’ একতরফা আলাপ চালিয়ে গেল ড্যান। ‘খনিতে কাজ করা যায়, চাইলে এক টুকরো জমি দিয়েও শুরু করা সম্ভব।’

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল মিমি, তবে তাকাল না ড্যানের দিকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এরিক ক্রেবেট, ও নিশ্চিত উদাসীন দেখালেও আসলে ড্যানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে মিমি।

‘বাড়িতে এমন কেউ নেই যে ফিরে যাব,’ খেই ধরল ড্যান। ‘একেবারে ঝাড়া হাত-পা আমার, চাইলে এখানেও থেকে যেতে পারি। ভাবছি সম্ভব হলে কোন একদিন ছোট্ট একটা জমির মালিক হব, গরু পালব, ফলের বাগান করব। জায়গাটা বড় না হলেও চলবে, তবে পর্যাপ্ত পানির যোগান থাকতে হবে। বাড়িটা আমি নিজেই তৈরি করব। অন্যদের সঙ্গে দু’-তিনটা বাড়ি তৈরি করেছি, আমার তো মনে হয় একা নিজের জন্য একটা তৈরি করতে পারব আমি।’

পানিতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল মিমি, কিন্তু অস্পষ্ট কাঠামোটা বিলীন হয়ে গেছে অন্ধকারে। নিজেকে একই পরিস্থিতির শিকার মনে হলো ওর-অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

লাভার তৈরি ক্লিফের কিনারার উপর, আকাশে নিঃসঙ্গ একটা তারা দেখা যাচ্ছে, আর ড্যান কোয়ানের কণ্ঠ-এই হচ্ছে অন্ধকার সমুদ্রে একমাত্র সাড়া। কিংবা আশার আলো!

‘পাহাড়ে হয়তো একটা জমি খুঁজে পাব,’ বলে চলেছে ড্যান। ‘গাছ আর ঘাস আছে, এমন জায়গা থাকার কথা। অমন একটা জমি খুঁজে পেলে সত্যি খুশি হব আমি।’ থেমে নিঃসঙ্গ তারাটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ‘পেলে...বেগার খাটতে হবে। একা বলে অনেক কাজ পড়ে যাবে হাতে।’

মিনিট কয়েক নীরব থাকল সে। ‘কী জানো, এখানে একটা জিনিসের অভাবই অনুভব করছি আমি। জ্যাম আর জেলি। আমাদের বাড়িতে জিনিসগুলো সবসময়ই থাকত। মা নিজ হাতে তৈরি করতেন। জারে ভরে সেলারে রেখে দিতেন শীতের জন্য। তুষারপাত শুরু হলে বের করতেন। সারা বছর ধরে ধুলো জমত জারের গায়ে। ছোটবেলায় প্রায়ই সেলারে চলে যেতাম আমি, পীচ আর চেরিতে ভরা জারের উপর প্রদীপের আলো ফেলতাম। কাচের জারে আলো ঠিকরে পড়তে দেখতে এত ভাল লাগত! ওরকম জ্যাম বা জেলি কখনও দেখতে পাব বলে মনে হয় না।’

আঙুল চালিয়ে শুকনো চুল ঘাড়ের পিছনে তুলে দিল মিমি, তারপর টেনেটেনে ঠিক করল পরনের পোশাক।

‘গরম গরম বিস্কুটের সঙ্গে জেলি! আহ, জিভে স্বাদ লেগে আছে এখনও! চিন্তা করলেই খিদে পেয়ে যায় আমার।’

মরুভূমির দিকে দৃষ্টি চালানোর ঠিক ক্রেবেট, ক্রমশ ঠাণ্ডা ও উপভোগ্য হয়ে আসছে পরিবেশ, ছোটবেলায় গরম বিস্কুট খাওয়ার অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য ঘটনা মনে পড়ল ওর। সময়ের স্রোতে মানুষ বড় হয়, বয়স বাড়ে, কিন্তু একইসঙ্গে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে, যা আর কখনোই ফিরে পায় না। আনমনে মাথা নাড়ল ও, হঠাৎ নিজের গভীরে এক ধরনের শূন্যতা এবং বিষাদ অনুভব করল।

‘মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না আমি,’ শেষপর্যন্ত পরাজয় নরকে

মেনে নিল ড্যানু কোয়ান । ‘জানিই না কী বলা উচিত!’
‘ভালই তো চালাচ্ছিলে,’ মৃদু স্বরে বলল মিমি রজার্স ।

ছয়

কোয়েলের ডাক শুনেই এরিক বুঝতে পারল শিগ্গিরই অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে যাবে, কারণ এই ডাকটা আসল নয় । ব্যাপারটা কীভাবে বুঝতে পারল ব্যাখ্যা করতে পারবে না, বুনো প্রকৃতিতে কাটানো জীবন থেকে এই ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে নিয়েছে ও । এক ধরনের দৈব ক্ষমতা বা সহজাত প্রবৃত্তি । অন্ধকারে হারানো ট্রেইল খুঁজে পাওয়ার মত, কিংবা বহু প্রাচীন ইন্ডিয়ান ট্রেইলের অস্তিত্ব অনুভব করার অনুভূতি-চোখে দেখা যায় না, কিন্তু জানা আছে যে কোন একসময় সত্যি ট্রেইল ছিল ।

রাতের বেলায় আক্রমণ করে না ইন্ডিয়ানরা, জানে এরিক, তবে নিশ্চিত করে বলাও যায় না । অ্যাপাচিদের ব্যাপারে শেষ কথা বলে কিছু নেই ।

ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে রাতের বেলায় কোন যোদ্ধা মারা গেলে আজীবন ঘুরে বেড়ায় তার আত্মা, ইহ আর পরকালের মাঝখানে নারকীয় স্তরের অন্ধকারে হা-পিত্যেশ করতে থাকে ।

সেক্ষেত্রে, সকালেই শেষ হয়ে যাবে ওদের বহু কাঙ্ক্ষিত অবকাশ ।

তবে অন্তত একজন পাহারায় না থাকলেই নয় । চালাক-চতুর, সন্দেহপ্রবণ ও সাবধানী ইন্ডিয়ানও আছে, যারা পুরানো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না । অতি সতর্কতার জন্য একাধিকবার অন্যের কাছে হাসির পাত্র হয়েছে এরিক, কিন্তু অসতর্ক ছিল এমন বহু লোককে

কবরও দিয়েছে। উন্মেষে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করবে ইন্ডিয়ানরা, জানে ও, ভোরের স্নান আলোকে কাজে লাগাবে। গোধূলির সময় মরুভূমিতে ধুলো উড়তে দেখেছে ও, অনুমান করে নিয়েছে আরও ইন্ডিয়ান চলে এসেছে। দূরের নীলচে পাহাড়ের অবয়বের বিপরীতে ধুলো উড়তে দেখেছে, দেখে মনে হয়েছে ধুলো আটকে আছে বাতাসে।

ভোরের উন্মেষে বুনো আক্রোশ নিয়ে হামলা করবে অ্যাপাচিরা, ওদের ধূলিমলিন বাদামি শরীর দেখে মনে হবে মাটি থেকে গজিয়ে উঠেছে; প্রয়োজনে চোখের পলকে উধাও হয়ে যাবে। আসলে মরুভূমির বালির বুকে সূর্যের প্রথম আলোকছটা দৃষ্টিভ্রম তৈরি করে—বালির সঙ্গে মিশে থাকা ইন্ডিয়ানদের পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় বালির রঙ আর রেডস্কিনদের বাদামি শরীর মিলেমিশে যায়। চোখের সামনে ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি, অথচ টের না পেয়ে এ-পর্যন্ত মারা গেছে কত মানুষ। নিজের চোখে এক সৈনিককে মরতে দেখেছে এরিক, বিশ হাত দূরে খোলা মরুভূমিতে শুয়ে থাকা ইন্ডিয়ানকে দিনের আলোয়ও দেখতে পায়নি লোকটা।

আক্রমণ আসছে, অথচ বেকার থেকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, ব্যাপারটা অস্থিরতা আর অস্বস্তির জন্ম দিল ওর মনে। নিজের মালপত্রের কাছে এসে বুট বদলে মোকাসিন পরল এরিক। সকৌতূহলে ওকে দেখেছে সার্জেন্ট হ্যালিগান।

‘চারপাশে রেকি করে আসি,’ তাকে বলল এরিক।

‘ঝুঁকি নিচ্ছ।’

‘উপায় কী!’

পাথরসারির কাছে চলে এল ও, আয়রনউড ঝোপের কিনারা ধরে নেমে এল মরুভূমিতে। তাড়াহুড়া করছে না এরিক, জানে যে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে। ঝোপের আড়ালে বসে অপেক্ষায় থাকল, কান খাড়া। দীর্ঘক্ষণ পর সন্তর্পণে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, পাথরের উপর আলতো পা ফেলে নিঃশব্দে এগোল। কয়েকবার থেমে শব্দ

শুনল, কিন্তু রাতের শব্দ ছাড়া কিছুই কানে এল না।

পাতার মর্মরধ্বনি, ছোট্ট পোকা বা গিরগিটির চলাফেরার ক্ষীণ শব্দ, ভূমিধসের কারণে নুড়িপাথর গড়ানোর আওয়াজ...মানুষের চলার শব্দ ছাড়াও কত রকমের আওয়াজ যে রয়েছে মরুভূমিতে!

মরুভূমি থেকে যখন বেরিয়ে এল এরিক, কয়েক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মেলানি। এত নিঃশব্দে এসেছে! প্রায় ভূতের মত উদয় হয়েছে, আচমকা। স্যাডলে রাখা পাইপ আনতে ঘোড়ার কাছে গেছে বেন ডেভিস, ক্যাম্পের কিনারে একাই ছিল মেলানি। দক্ষিণে পিনাকেটের জোড়া শৃঙ্গ রাতের আকাশের বুকে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে।

‘ওহ্, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি!’ অস্ফুট স্বরে বলল মেলানি।

মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াল এরিক, রাতের মরুভূমির দিকে তাকাল। সুনসান নীরবতা, অস্বাভাবিক শান্ত; আলো না থাকায় দক্ষিণের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকাকে নরক বলে মনে হচ্ছে। ‘এত শান্ত,’ মৃদু স্বরে বলল এরিক। ‘আসলে দারুণ বিপজ্জনক।’

‘সত্যি কি আশপাশে লুকিয়ে আছে ইন্ডিয়ানরা?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু সবকিছু তো শান্ত!’

‘শান্ত বলেই তো এত নিশ্চিত। মরুভূমিতে হালকা ছোট ছোট শব্দ হয়, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; ওসব যখন থাকে না, তারমানে আশপাশে এমন কারও উপস্থিতি রয়েছে যে একেবারে চুপ মেরে গেছে ক্ষুদ্র প্রাণীরা।’

‘ইন্ডিয়ানরা থাকার পরও বাইরে গেলে কেন?’

‘কাভার হিসাবে ব্যবহার করবে ওরা, এমন জায়গাগুলো দেখার দরকার ছিল।’

‘মারা যেতে পারতে তুমি। এটাকেই তো সেধে বিপদে পড়া বলে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, মারা যেতে পারতাম। এখন থেকে ইয়োমায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের, এতটুকু কম নয় কারও। আমি কিন্তু সেধে বিপদে পড়তে চাইনি, কারণ ওই কাজটা করে নেহাত বোকা বা বাচ্চারা, কারণ কর্তব্য স্থির করার বুদ্ধি তাদের থাকে না। বিপদ সুখের বিষয় নয়, কিংবা উপভোগ্যও নয়; আসলে খুবই কুৎসিত, কষ্টকর এবং নৃশংস একটা পরিস্থিতি। যন্ত্রণা, উদ্বেগ বা উৎকর্ষায় অতিষ্ঠ হওয়া।

‘বোকা বা নেহাত মাথাগরম বাচ্চা না হলে কেউই সেধে বিপদে জড়ায় না। অন্ধকার রাত্রিতে বিপদের মুখোমুখি হওয়া আর একই অভিজ্ঞতা বইয়ে পড়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। যারা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলে বেড়ায়, বাস্তবে অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা তাদের নেই বললেই চলে, সেসব অন্যের মুখ থেকে শোনা।’

সিগারেটের শেষাংশ ফেলে দিল এরিক। ‘তোমার বাবা কিন্তু জানে এসব। এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেই একটা সাম্রাজ্য গড়েছে সে, যেখানে নিরাপদে থাকতে পারবে তুমি।’

‘আমার কোন কাজেই অনুমোদন নেই তোমার, তাই না?’

‘অনুমোদন দেওয়ার মত কিছু আছে কি? স্বীকার করি, তুমি সুন্দরী, অথচ ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারবে, এমন সুবিধাগুলো হেলায় ফেলে চলে যেতে চাইছ; তোমার বাবাকেও অবহেলা করছ। পুর্বের শিক্ষা দিয়ে তাকে বিচার করছ তুমি, ওর জীবনের উত্থান-পতন বা বাধাকে বিচার করছ। তুমি আসলে...’ মেলানির উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল এরিক। ‘বীয়ারের ফেনার মত। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কোন কাজে আসে না।’

হেঁটে আগুনের কাছে চলে গেল এরিক, নিজের উপর রেগে গেছে। অধিকার নেই, এমন কতগুলো কথা বলেছে, অথচ এ-ধরনের অনধিকার চর্চায় অভ্যস্ত নয় ও। জিম রিওসকে চেনে না বটে, কিন্তু পশ্চিমে বসতি করতে আসা রিওসের মত মানুষদের সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানে। শূন্য থেকে শুরু করেছে এরা, যার যার অবস্থানে টিকে

থেকেছে। ব্যক্তিত্ব, সামর্থ্য বা দৃঢ় মনোবল না থাকলে সম্ভব হত না; এরা প্রত্যেকেই লড়াকু, বিচক্ষণ মানুষ। অন্যরা যে সমীহ করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আগুনের পাশে বসল ও। মিমি রজার্সের দেওয়া রুটি আর মাংস চিবালা নীরবে। ভুলেও আগুনের দিকে তাকাল না। আগুনের দিকে তাকায় বোকা কিংবা পুবের ভদ্রলোকেরা। আগুনের দিকে তাকানোর পরমুহূর্তে যদি অন্ধকারে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে, ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে মানুষ, যেটা তার মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মেলানির সঙ্গে পাথুরে চাতাল থেকে ক্যাম্পে নেমে এল বেন ডেভিস।

মেয়েটিকে দেখেই এরিক বুঝতে পারল খেপে বোম হয়ে আছে, রাগের কারণটাও জানে—ও নিজে। স্মিত হাসল ও।

‘দু’একটা রেডস্কিনকে পেয়েছ?’ তির্যক সুরে জানতে চাইল ডেভিস।

‘ইন্ডিয়ানদের খোঁজে যাইনি আমি।’

ওদের সঙ্গে যোগ দিল সার্জেন্ট হ্যালিগান, আলো পড়ে উজ্জ্বল দেখাল তার ইতস্তত পাকা চুল। ‘ক’জন আছে ওরা, ক্রেবেট? তোমার অনুমান-জানতে চাইছি।’

‘বিশ থেকে চল্লিশজন পর্যন্ত হতে পারে। তবে কোনমতেই পঞ্চাশের বেশি হবে না।’

‘কীভাবে হিসাব করলে?’ জানতে চাইল ডেভিস।

‘অ্যাপাচিরা সবসময় ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়ায়। জীবন ধারণের জন্য মরুভূমির উপর নির্ভর করে ওরা। মরুভূমিতে যথেষ্ট খাবার বা পানি পাওয়া যায় না বলেই দল ছোট রাখে। দশটা ওঅর পার্টি যদি দেখো, নয়টার মধ্যে দেখবে সদস্য সংখ্যা দশ থেকে ত্রিশজন। চুরতির দলে ষাটজনের বেশি থাকার কথা নয়, এত ইন্ডিয়ানকে পাবে না সে। আমার ধারণা বড়জোর বিশ কি পঁচিশজন আছে আশপাশে।’

আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেফ কেলার, মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওদের কথা। দানবের মত বিশাল লোমশ দেহ তার, সারা মুখে ঘন দাড়ির জঙ্গল, ক্ষৌরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। হঠাৎ চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে এরিকের দিকে তাকাল সে। ‘এই ইন্ডিয়ানটার ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি?’

‘চিডল? ও তো পিমা।’

কাপের অবশিষ্ট কফি আগুনে ছুঁড়ে ফেলল কেলার, ভঙ্গিটা উস্কানিমূলক। ‘ও তা হলে পিমা,’ রাগে ককর্শ শোনাল তার কণ্ঠ। ‘কথাটা আগেও বলেছ। আমার কথাটা এবার শুনে নাও: আমি বলছি ও ইন্ডিয়ান, এবং সব ইন্ডিয়ানই এক, পিমা আর অ্যাপাচি হোক। ব্যাটাকে ধরে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।’

‘না,’ মৃদু স্বরে বলল এরিক। ‘আমাদের মধ্যে সেরা একজন যোদ্ধা ও।’

‘সেটা তোমার ধারণা। আমার মতামত হচ্ছে এই ব্যাটাকে ফুটো করে লড়াই শুরু করা উচিত।’

‘কেউ ওর দিকে একটা আঙুল তুলেছ তো,’ এখনও শান্ত এরিকের কণ্ঠ। ‘ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাকে।’

কুণ্ঠসিত হয়ে গেছে কেলারের মুখ, ইতস্তত করছে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো চ্যালেঞ্জটা নেবে সে। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটায় আগেই বাদ সাধল সার্জেন্ট হ্যালিগান।

‘যথেষ্ট হয়েছে, কেলার,’ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। ‘সবাই মিলে ক্রেবেটকে নেতা বানিয়েছি আমরা, ওর নির্দেশ পালন করবে তুমি।’

‘বলতে চাইছ ওর নির্দেশ না মানলে কোর্ট মার্শাল হবে আমার?’ যুগপৎ ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল কেলারের স্বরে। ‘বেকুব মনে করেছ আমাকে? এই ঝামেলা শেষে গল্পটা বলার জন্য খুব কম লোকই বেঁচে থাকবে। উঁহুঁ, তোমার বা অন্য কারও সেই সুযোগ হবে না।’

কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না সে, হনহন করে হেঁটে চলে গেল। অন্ধকারে মিশে যাওয়া পর্যন্ত তার বিশাল কাঠামোর দিকে

তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট ।

উপরে, পাথুরে চাতালের কিনারে এসে দাঁড়াল এড মিচেল ।
'ক্রেবেট, পুবে গোলাগুলির শব্দ শুনলাম । বেশ দূরে ।'

পাথুরে চাতালে উঠে এল এরিক, আগুনের কাছে বিব্রতকর পরিবেশ ছেড়ে আসতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে । মিচেলের পাশে এসে কান পাতল, কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে পেল না । চওড়া একটা পাথরের উপর বসে পড়ল ওরা, অপেক্ষায় থাকল-আশা করছে গুলির শব্দ শুনতে পাবে; কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও শুনতে পেল না ।

ত্যক্ত মনে নীচের পরিস্থিতি বিবেচনা করল এরিক । জেফ কেলার বিপজ্জনক চরিত্র, অন্যের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অনিচ্ছুক; হুমকির সুরে সার্জেন্টের উদ্দেশে মন্তব্যটা করেছে সে । নিজেদের শত্রু নিজেরাই বনে গেছে ওরা, আশপাশে যেন ইন্ডিয়ানরা নেই ।

পাসিবাহিনী তাড়া করেছে, ব্যাপারটা অস্বীকার না করেও বলা যায় এড মিচেল ভালমানুষ; খানিকটা বেপরোয়া কিন্তু সমর্থ এবং নির্ভরযোগ্য । এ-ধরনের পরিস্থিতিতে মিচেলের মত মানুষ পাশে থাকা ভাগ্যের ব্যাপার । জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এরিক জানে এড মিচেল কর্মঠ ও দক্ষ লোক, যে-কোন কাজে বা যে-কোন অস্ত্রে দক্ষ, কখনও অভিযোগ করবে না । পরিস্থিতি অনুকূল হলে সামর্থ্যের মধ্যে যে-কোন একটা কাজকে নিজের পেশা হিসাবে বেছে নেবে, ব্যস্ত থাকবে নিজেকে নিয়ে-টীমস্টার, কামার কিংবা ছোট র্যাঞ্চার বনে যাবে; জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন করবে না, কিন্তু খেটে যাবে সবসময় ।

তুমি কী হবে? নিজেকে শুধাল এরিক । কোথায় যাবে, কী করবে?

কোন একদিন পিস্তলে ক্ষিপ্ততা কমে যাবে, কিংবা মরুভূমির কোথাও পা ভেঙে ফেলবে বা ক্যান্টিন হারিয়ে ফেলবে, পানির উৎস খুঁজে পাবে না । এমন ঘটনা বহু মানুষের ভাগ্যে ঘটেছে, ওর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে । উচ্ছল ঝর্না বা বয়স্ক ওকের ছায়াময় পরিবেশে ছোট একটা বাথানের মালিক হওয়া সম্ভব হবে না, কিংবা অনেক বই পড়ার

তৃষ্ণাও বোধহয় কখনও মিটবে না। ওর বাবাও পড়ুয়া লোক ছিল, এমনকী মৃত্যুর সময়ও বই পড়ছিল জর্ডান ক্রেবেট, বাইরে থেকে খোলা জানালা দিয়ে তাকে গুলি করে স্কট ওয়াইল্ডার নামে এক বন্দুকবাজ।

এরিকের তখন ষোলো চলছে। বয়স কম হলে কী হবে, ততদিনে পিস্তলে নিপুণ হয়ে গেছে ওর নিশানা। স্কট ওয়াইল্ডার ভেবেছিল কাজ শেষে নিরাপদে ফিরে যাবে, শিকারের তরুণ ছেলেকে আমলই দেয়নি। কিন্তু আঙিনা পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি তার, এরিকের বুলেট তার কপাল ফুটো করে দেয়।

‘অবস্থা ভাল ঠেকছে না,’ মৃদু স্বরে বলল এড মিচেল। ‘কেউ নিশ্চই বিপদে পড়েছে, নইলে এ-সময়ে গোলাগুলি হত না।’

সত্যি সত্যি কেউ যদি বিপদে পড়েও থাকে, কিছুই করার নেই ওদের, তাই গাঁট হয়ে বসে থাকল; অপেক্ষায় রইল হয়তো আরও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাবে, কিংবা কারও উপস্থিতির নমুনা টের পাবে। একটু পর চাতালে উঠে এল বেন ডেভিস, ঠিক পিছনে ড্যান কোয়ান।

মিনিট কয়েক কেটে গেল। তারপর আচমকা, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের দূরগত শব্দ শুনতে পেল...বেশ দূরে। সম্ভবত কোন একটা আশ্রয় খুঁজছে লোকগুলো, তুমুল গতিতে ছুটিয়েছে ঘোড়া।

হঠাৎ একটা গুলি হলো, অন্ধকারে কমলা আগুন স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা, যতটা দূরে ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক কাছে; পরপরই আরও কয়েকটা গুলি হলো।

তীব্র বেগে ছুটে এল ঘোড়াটা, লাফিয়ে উঠে পড়ল চাতালের উপর। ঠিক পিছনে আরেকটা ঘোড়া, তবে এটার স্যাডল খালি। আবছা অন্ধকারে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে ঘোড়া আর সওয়ারীর গাঢ় কাঠামো। স্কিড করে পাথুরে চাতালের মাঝপথে থেমে গেল প্রথম ঘোড়া, ঝটিতি স্যাডল ছেড়ে মাটিতে পা রাখল এক মহিলা, হাতে মান্ধাতার আমলের একটা রেমিংটন পিস্তল।

বিশালদেহী মহিলা। দোহারা গড়ন। চর্বিবহুল দেহ। চওড়া মুখে মানানসই স্মিত হাসি, মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এপাশ-ওপাশ দৃষ্টি চালান। চাহনিতে ভয় বা স্বস্তি কোনটাই নেই, বরং পলকের চাহনিতে পরিস্থিতি বুঝে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল মহিলা। কণ্ঠটা কর্কশ, তীক্ষ্ণ এবং আমুদে। ‘একেই বলে কপালের ফের! একেবারে জায়গামত পৌঁছে গেছি! অথচ দশ মিনিট আগেও ভেবেছি এইবারে আর চামড়া বাঁচাতে পারব না!’

ফের চারপাশে দৃষ্টি চালান মহিলা। ‘বয়েজ, আমি হচ্ছি বিগ জুলিয়া। নামটা শুনেছ? ক্যান্সাস সিটি থেকে বেরিয়ে উইচিটা, অ্যাবিলিন আর এল পাসো হয়ে এখানে এসেছি। তোমাদের দেখে কী যে খুশি হয়েছি! কারও কাছে ড্রিঙ্ক আছে?’

সাত

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে ওরা, কেউই কথা বলছে না, বেকুবের মত তাকিয়ে আছে মোটকু মহিলার দিকে; কিন্তু সামান্য বিকারও দেখা গেল না বিগ জুলিয়ার মধ্যে। চওড়া হাসি উপহার দিল সে, চোখ টিপল এড মিচেলের উদ্দেশে। ‘কী জানো, জীবনে কাউকে দেখে এত খুশি হইনি আমি! মাইকের কাছে এই ওঅটর হালের কথা শুনেছিলাম। বলেছিল ওর কিছু হয়ে গেলে এখানে চলে আসতে।’

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি এরিক ক্রেবেট, এখনও জুলিয়ার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে; মহিলাকে ছাড়িয়ে গেল ওর দৃষ্টি। প্যাক-হর্সটাকে দেখল, ভারী দুটো স্যাডল ব্যাগ ঝুলছে ওটার পিঠে। দারুণ

ঘোড়া, যেমন তেজী তেমনি শক্তিশালী। সমীহের চোখে ঘোড়াটাকে দেখল ও, শেষে জুলিয়ার দিকে মনোযোগ দিল আবার।

‘আমরা তো মনে করেছিলাম টুকসন পর্যন্ত যেতে পথে কারও দেখা পাব না। লোকজন হয় খুন হয়ে গেছে, নয়তো ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে।’

টুকসন থেকেই তো এসেছি আমরা! হঠাৎ গুলি খেল মাইক, সুযোগ বুঝে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে ও। শরীরের বুলেটটা নিয়ে একটুও গ্রাহ্য করেনি। কেনই বা করবে, অন্য লোকটার শরীরে যে পাঁচটা ঢুকিয়েছে ও!

‘না গেলেই পারত ও। তবে ওর তো জানার উপায় ছিল না যে একদল ইন্ডিয়ানের কোলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু অ্যাপাচিদের আগেই গুলি করল ও, শটগান দিয়ে দু’জনকে ফেলে দিল। আরও দুটো গুলি ঢুকল ওর শরীরে, তারপরও খুন করেছে একজনকে। শেষে ওকে কায়দা করে ফেলল ইন্ডিয়ানরা। ওর উইনচেস্টারটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি আমি।’

চাতালের একপাশে ঝোপে ঘেরা ছোট্ট একটা গুহার মত জায়গা নিজের জন্য বেছে নিয়েছে মেলানি, সেখান থেকে বেরিয়ে এল ও। ‘বাজি ধরে বলতে পারি তুমি জিম রিওসের মেয়ে,’ ওঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল জুলিয়া।

‘আমার বাবাকে চেনো তুমি?’

‘ওর কথা কত শুনেছি! আর সেদিন নিজের চোখে দেখলাম টুকসনে। র্যাটলস্নেকের চেয়েও খেপা ছিল সে, শুধু লেজ ছিল না, এই যা! বলছিল অকম্মার ধাড়ি এক টিনহর্ন নাকি ওর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে!’ সবার উদ্দেশে দাঁত বের করে হাসল জুলিয়া। ‘তোমাদের মধ্যে সেই সৌভাগ্যবান অকম্মার ধাড়িটা কে, বলো তো?’

চুলোর গোড়া পর্যন্ত রক্তিম হয়ে গেছে বেন ডেভিসের মুখমণ্ডল। ‘মিস্ রিওস আর আমি শিগ্গিরই বিয়ে করব,’ আড়ষ্ট স্বরে বলল সে।

নিঃশব্দে হাসল বিগ জুলিয়া। ‘মিস্টার, ওকে বিয়ে করতে পারবে তুমি, যদি না তোমাকে ধরতে পারে জিম রিওস! আর যদি ধরতে পারে, দশ নম্বরী বুট দিয়ে ব্র্যান্ড বসাবে তোমার পিঠে!’

ঝট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেলানি, অপমানে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে অপূর্ব মুখটা। সামান্য ইতস্তত করল বেন ডেভিস, মোক্ষম একটা জবাব দেবে যেন, শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেলানির পিছু নিল।

পাথরের আড়ালে, লুকআউটে ফিরে গেল এরিক ক্রেবেট। এদিকে দ্রুত হাতে, প্যাকহর্সের পিঠ খালি করে ফেলল জুলিয়া, ঘোড়া দুটোকে নীচের করালে নিয়ে গেল এড মিচেল। দুটো ঘোড়াই দারুণ অবস্থায় আছে, ওদের যেকোন ঘোড়ার চেয়ে শ্রেয়তর তো বটেই, এমনকী টুকসন থেকে এ-পর্যন্ত আসার পথে এত চটপটে বা শক্তিশালী কোন ঘোড়া চোখে পড়েনি এরিকের।

হাতে সময় নেই। পূব দিগন্তে হলুদ ছোপ পেয়েছে আকাশ, শিগ্গিরই সূর্য উঠবে।

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় মাইলকে মাইল জুড়ে বিস্তৃত বাদামি বালির সমুদ্র চোখে পড়ছে, কদাচিৎ সাদা ছোপ রয়েছে, এগুলো আসলে মৃত ঘোড়ার ক্ষয়ে যাওয়া কঙ্কাল। বহু বছর ধরে পড়ে আছে এভাবে—চলার পথে মারা গিয়েছিল অসহায় প্রাণীগুলো। পথটাকে এলাকার লোকজন বলে ক্যামিনো ডেল ডায়াবলো, অর্থাৎ শয়তানের মহাসড়ক। গোল্ড রাশের গুরুর দিকে এই পথে যাত্রা করেছিল ভাগ্যান্বেষী মানুষ, চারশোরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল ক্ষুধপিপাসায়; বালিয়াড়ি আর অনুচ্চ পাথুরে রীজের বুক চিরে চলে যাওয়া অস্পষ্ট পথটাকে অলঙ্কৃত করেছে সাদা হাড় এবং পরিত্যক্ত ওয়্যাগনের ধ্বংসাবশেষ। প্রথম যখন এই পথে যাত্রা করেছিল এরিক, একদিনে ষাটটারও বেশি কবর গুনেছিল। কিন্তু কত লাশ গোর দেওয়া হয়নি বা কতজনের হাড়গোড় কয়োটের দল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলেছে, সেই হিসাব কারও জানা নেই।

দিনের আলো বাড়ছে। নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হলো না, যার

যার পজিশনে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল সবাই। মনোযোগ দিয়ে সকালের শব্দ শুনছে, প্রত্যেকেই জানে কিছু যদি ঘটে, সেটা আজই ঘটবে।

সত্যি কি ঘটবে?

চুরুতি সম্পর্কে শোনা বিভিন্ন গল্প মনে পড়ল এরিকের। নেকডের মতই ধূর্ত, অবিশ্বস্ত ও বিপজ্জনক লোকটা। ক্লান্তি নামক শব্দটার সঙ্গে পরিচয় নেই তার। বেপরোয়াও, অনেক সময় দলের লোকজনের স্বার্থও দেখে না। ওদের কাছে ঘোড়া, বন্দুক এবং অ্যামুনিশন আছে, সবই কাজে লাগবে অ্যাপাচিদের। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সাহায্য আসার কোন সম্ভাবনা নেই। পানির উৎস খুঁজে পেলে স্রেফ অপেক্ষা করলেই চলবে চুরুতির, সাদারা একসময় দুর্বল হবেই। ক্ষুধপিপাসা, উদ্ভিগ্ন অপেক্ষা বা স্নায়ুর চাপের প্রভাব সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানে চুরুতি।

হঠাৎ করেই গর্জে উঠল একটা রাইফেল, বলা যায় বালির বুক থেকে গর্জে উঠল, কারণ রাইফেলধারী ইন্ডিয়ানকে কেউই দেখতে পায়নি ওরা। ড্যান কোয়ানের মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে পাথরে লেগে ছিটকে গেল বুলেট, তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাসে শিস কেটে মাটিতে পড়ল ওটা।

ওদের পিছনে, লাভার তৈরি পাথুরে জমি থেকে আরেকটা গুলি ছুটে এল।

তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল সব। নীরবতা, নির্জনতা এবং সূর্যোদয়। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার মত মিলিয়ে গেল পরিবেশের স্বস্তিকর শীতলতা। ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। আরও এক ঘণ্টা পেরোল। হঠাৎ, করালের কাছ থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল, মিনিট খানেক পর মাত্র একটা গুলি হলো, এবং শেষে গর্জে উঠল দুটো। ডেভিস, চিডল আর মিচেল রয়েছে ওখানে।

ক্রল করে এরিকের পাশে চলে এল সার্জেন্ট হ্যালিগান। 'একটা ঘোড়া মেরে ফেলেছে হারামজাদারা!' তিক্ত স্বরে জানাল সে।

ঝট করে তার দিকে ফিরল এরিক, ওর ডান ঘোড়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

‘না, তোমারটা না,’ জানাল সার্জেন্ট। ‘আমারটা!’

‘একটা কমে গেল। আশা করছি হাঁটতে দক্ষ তুমি, সার্জেন্ট।’

‘এখান থেকে যদি জীবিত বেরোতে পারি, সেজন্য হাঁটতে বা ক্রল করতেও আপত্তি নেই আমার,’ হ্যাটের সুয়েটব্যান্ড থেকে ঘাম মোছার সময় বলল হ্যালিগান।

অনেকক্ষণ হলো নীরব হয়ে আছে পরিবেশ। আকাশে সামান্য মেঘও নেই। শয়তানের উদ্বাহ নৃত্যের মত তাপতরঙ্গ নাচছে খোলা মরুভূমিতে। রাইফেলটা হাত বদল করল সার্জেন্ট, ঘর্মাঙ্ক হাতের তালু মুছল শাটে।

‘ক্রেবেট, ফোর্ট থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা কোরো না,’ নিচু স্বরে বলল সে। ‘অন্তত শিগ্গিরই পৌঁছাবে না। আমরা চলে আসার সময় ওখানে বিশজনও ছিল না। যত জরুরিই হোক, ফোর্ট অরক্ষিত রেখে কারও সাহায্যে সৈন্য পাঠাবে না কমান্ডার।’

অধৈর্য ভঙ্গিতে পাশ ফিরল ড্যান কোয়ান। ‘কীসের অপেক্ষায় আছে বেজন্মা ইন্ডিয়ানরা? লড়াই করতেই যদি এসে থাকবে, শুরু করছে না কেন?’

‘ইন্ডিয়ানদের মতি-গতি কবে কে বুঝতে পেরেছে? কারণও কি অনুমান করা সম্ভব? হয়তো ভাবছে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।’

নীরব হয়ে গেল কোয়ান, একটু পর বলল: ‘আমি কী ভাবছি, জানো? ঠিক কাজটাই করছে ওরা।’

বেন ডেভিসের অবস্থান থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, পরপরই নীরবতা নেমে এল, শুধু হালকা বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ। বাতাস দ্রুত গরম হয়ে উঠছে।

সবার পজিশন আর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চলে গেল সার্জেন্ট। রাইফেলটা হাত বদল করে চোখ কুঁচকে বালির সমুদ্রের দিকে তাকাল ড্যান। ‘মিমি মেয়েটা খুব ভাল,’ হঠাৎ মন্তব্য করল সে।

গম্ভীর মুখে সাই জানাল এরিক। 'ভাগ্যবান কোন লোকের গুণী স্ত্রী হবে ও,' যোগ করল ও।

'বয়স যদি আরেকটু বেশি হত, হয়তো...' শুরু করেও থেমে গেল ড্যান। 'উঁহু, আগে দেশটা ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই। শুনেছি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গাছ আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়! ওগুলো দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা কি ঠিক হবে?'

'চাইলে দেখবে,' মরুভূমিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে এরিক, দূরে এক জায়গায় বালির উপর জড়ো হওয়া কয়েকটা পাথর দেখতে পেল, ঠিক পাথর বলে মনে হচ্ছে না। এরিকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। 'মরার আগে সবারই ঘুরে-ফিরে দেশটা দেখা উচিত।'

রাইফেল তুলে নিল এরিক, পাথরের স্তূপের একটু পিছনে চ্যাপ্টা একটা পাথরে সাইট নির্দিষ্ট করল। লম্বা দম নিয়ে নিজেকে সুস্থির করল, চোখ পিটপিট করে চোখ থেকে ঘাম ছাড়াল, শেষে ট্রিগার টেনে দিল।

পাথরস্তূপের পিছনে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, তৎক্ষণাৎ আবার গুলি করল এরিক, তৃতীয় গুলিটা করল পাথর ছাড়িয়ে। আর কোন চিৎকার শুনতে পেল না।

'এই রিকোশেটগুলো কখনও কখনও গুলির চেয়েও কার্যকরী,' বলল ড্যান। 'শরীরে ঢুকে ছিঁড়ে ফেলে নরম মাংস। তলোয়ারের কোপ খাওয়ার মত দশা হয়।'

পিছিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটা জায়গায় সরে এল এরিক, উঠে দাঁড়াল। 'এখানেই থাকো, ড্যান। একটু হলেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওরা, তবে সাবধান থাকো।' পাথুরে চাতাল ধরে নীচে নামতে শুরু করল ও। 'ঠিকই বলেছ, মিমি ভাল মেয়ে। আমার ধারণা খুব ভাল মেয়ে।'

কফি পান করার জন্য আগুনের কাছে থামল ও। সময় নিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করল। একটা ঘোড়া খুন হয়েছে, কোনভাবেই নরকে

দুর্ঘটনা বলা চলে না, কারণ সওয়ার না থাকা মানে পায়ে হাঁটতে বাধ্য হওয়া, আর পায়ে হাঁটতে গেলে মরুভূমিতে টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

নিজের অবস্থান ছেড়ে আগুনের কাছে চলে এসেছে জেফ কেলার। কফিপট তুলল। এক ঝলক দেখেই তার মতিগতি টের পেয়ে গেল এরিক-ঝামেলার ফিকির করছে বিশালদেহী। কেলারের মত মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই চলতে থাকবে-তারপর একদিন ভুলের মাশুল দেবে, অন্যের হাতে খুন হয়ে যাবে। তবে সমস্যার কথা, এটা এমন এক মুহূর্ত যখন প্রতিটি লোককে প্রয়োজন ওদের।

‘ইনজুনটাকে পালছ নাকি?’ কর্তৃত্বের স্বরে জানতে চাইল সে।

‘এখান থেকে যদি বেরিয়ে যেতে পারো, ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে তুমি। এখন সবার সাহায্য দরকার আমাদের।’

‘জ্ঞাতিভাইদের কাছে পাঠিয়ে দাও ওকে,’ পরামর্শ দিল কেলার। ‘আসলে কি কোন পার্থক্য আছে ওদের? এটা সাদাদের জায়গা।’

‘চিডল পিমা গোত্রের। পিমারা নিরীহ ইন্ডিয়ান, অন্যদের মত মারকুটে বা হিংস্র নয়। প্রাচীন কাল থেকে অ্যাপাচি এবং ইয়াকি, দুই গোত্রের শত্রু ওরা। তুমি অ্যাপাচিদের যতটা ঘৃণা করো, টনি চিডল তারচেয়েও বেশি করে। সুতরাং আমাদের সঙ্গে থাকবে ও।’

‘সেক্ষেত্রে,’ কফিতে চুমুক দিল সে, সময় নিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল। ‘ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার কাজটা আমাকেই করতে হবে।’

‘প্রথম কথা...’ উঠে দাঁড়াল এরিক। ‘যোদ্ধা হিসাবে তোমার চেয়ে ঢের সেয়ানা ও, টিকতেই পারবে না ওর সঙ্গে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাকে নেতা মেনেছে সবাই। ওর সঙ্গে যদি লাগতে যাও, আগে আমার সঙ্গে লাগতে হবে।’

কফিপটের কিনারার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে কেলার, সাবধানী চাহনিতে মাপল ওকে। যা দেখতে পেল, একটুও পছন্দ হলো না তার। ছিপছিপে দেহের স্বল্পভাষী এ-ধরনের মানুষ আগেও দেখেছে সে,

এরিক ক্রেবেটের নির্লিপ্ত উদাসীনতার মানে এই নয় যে বিপদ বা ঝামেলার সঙ্গে মোলাকাত ঘটেনি তার। তবে নিজের সামর্থ্য বা দানবীয় শক্তির উপর আস্থা আছে কেলারের, জীবনে বহুবার ভরসা করেছে এর উপর, এবারও করার সাহস পেল। ‘আমার সঙ্গে লাগতে এসো না,’ স্পষ্ট হুমকির সুরে পরামর্শ দিল সে। ‘শরীরে বড় হতে পারি, কিন্তু পিস্তলটা ভালই চলে আমার হাতে। ঠিক ফুটো করে ফেলব তোমাকে।’

‘এখনই হয়ে যাক না হয়?’ মৃদু স্বরে চ্যালেঞ্জ করল এরিক।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। ‘সময়টা আমিই বেছে নেব, তোমার পছন্দমত হবে কেন? নিজের ভাল চাইলে আমার পথ থেকে দূরে থাকো।’

ঘুরে হেঁটে চলে গেল বিশালদেহী সৈনিক।

আপাতত মূলতবি থাকল ব্যাপারটা, টের পাচ্ছে এরিক, তবে একসময় লোকটার মুখোমুখি হতেই হবে। এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কেলারের মারমুখী স্বভাব আর নির্জলা ঘৃণাবোধ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে একই কাতারে নামিয়ে এনেছে এরিককে। সম্ভবত ছোটবেলা থেকে সব ইন্ডিয়ানকে এক দৃষ্টিতে মাপতে শিখেছে, নির্জলা এসিডের মত ক্রিয়া করেছে এতটা বছর, তিজু ঘৃণার দাস হয়ে গেছে কেলার, যা থেকে তার মুক্তি নেই। নেই শোধরানোর সুযোগও। এ-ধরনের মানুষের কাছে নিজের অহমই মুখ্য, একটা অঙ্গ হারাবে কিন্তু অহঙ্কার বিসর্জন দেবে না, কারণ ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

আচমকা এল আক্রমণটা। বাদামি ভূতের মত উদয় হলো অ্যাপাচিরা, উধাও হয়ে গেল একইভাবে। অদৃশ্য ইঙ্গিতে যেন, কিংবা কোন শব্দও শুনতে পেল না ওরা, হঠাৎ ছুটে এল। ছুটতে ছুটতে গুলি করল, ঝাঁপিয়ে পড়ল বালির উপর, এবং পরমুহূর্তে উধাও হয়ে গেল ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে, শূন্য মরুভূমিতে তাদের চিহ্নও দেখা গেল না। দেখে মনে হবে আচমকা এই তৎপরতা বালিতে সূর্যালোকের কারসাজি বা দৃষ্টিভ্রম...কিন্তু ফল: আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে ওরা।

এবং আরও একটা ঘোড়া মারা গেছে।

চাপা স্বরে মুখখিস্তি করল এরিক, ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে।

চারপাশে অটুট নীরবতা, অপেক্ষায় আছে সবাই, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে বালি আর লাভাভূমির উপর; আশা করছে আবারও ত্বরিত তৎপরতা দেখাবে ইন্ডিয়ানরা—ছুটে আসবে ঝড়ের বেগে, এই সুযোগে ছুটন্ত টার্গেট পেয়ে যাবে ওরা। উদ্ভিগ্ন মনে কপাল থেকে ঘাম মুছল সার্জেন্ট হ্যালিগান, মনে মনে ভাবছে না জানি ফোর্টের কী অবস্থা। গুটিকয়েক লোক আছে ওখানে, মাঝারি মাত্রার একটা ইন্ডিয়ান হামলা ঠেকানোর জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।

‘গুলি করব কাকে?’ অভিযোগ করল ড্যান। ‘ভূতের মত, এই ছিল এই নেই!’

‘অযথা সময় নষ্ট করেছি!’ ত্যক্ত স্বরে বলল মার্ক ডুগান। ‘ইয়োমার দিকে চলে যাওয়া উচিত ছিল।’

‘তোমার পাসি যেমন গেছে?’ জানতে চাইল এরিক।

‘ওটা তো দুর্ঘটনা ছিল!’ রাগে কেঁপে উঠল ডুগানের কণ্ঠ। ‘এমন কিছু ঘটবে না আর। দুর্ঘটনা একবারই ঘটে।’

‘অ্যাপাচিরা এ-ধরনের দুর্ঘটনা তৈরিতে ওস্তাদ।’

একইসঙ্গে গুলি চালাল মিচেল আর চিডল, শব্দ শুনে মনে হলো একটা রাইফেল থেকে গুলি হয়েছে; পরপরই গর্জে উঠল ডেভিসের অস্ত্র। কাছের বালিয়াড়ির চূড়ায় বিদ্ধ হলো বুলেটগুলো, মুহূর্ত খানেক আগে সেখানে উঁকি দিয়েছিল এক ইন্ডিয়ান।

‘যাহ্, লাগেনি!’ বিতৃষ্ণায় থুথু ফেলল মিচেল।

‘কিন্তু ভড়কে দিয়েছি ওদের,’ খানিকটা সম্ভ্রষ্টির সুরে তাকে আশ্বস্ত করল ড্যান কোয়ান। ‘এখন থেকে ওভাবে লাল মুখ দেখানোর সাহস করবে না। তুমি হয়তো মিস্ করেছ, কিন্তু মুখের কাছ দিয়ে গুলি গেলে খেপে যায় ইন্ডিয়ানরা, ওরাও বুঝতে পারে যে অস্ত্রের জন্য বেঁচে গেছে।’

ধীরে ধীরে সময় কাটছে। তাপতরঙ্গের উদ্বাহ নৃত্য কমে এসেছে। পশ্চিমাকাশে গড়িয়ে গেছে সূর্য। একসময় অন্ধকার নেমে আসবে। তখনই হবে আসল বিপদ। অন্ধকারে চুপিসারে এগিয়ে আসতে পারবে হিংস্র অ্যাপাচিরা।

একে একে সবার কাছে গেল এরিক, বিভিন্ন স্থান অর্থাৎ কোণ থেকে মরুভূমি জরিপ করল। প্রায় একশো গজ দীর্ঘ এলাকা কাভার করছে ওরা, কিন্তু হামলা করে সুবিধা করতে পারবে না প্রতিপক্ষ। ওদের প্রতিরক্ষা পরিধির বাইরে কাভার রয়েছে, তবে ভিতরের কাভার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। বিশেষ করে উপরের দুই কূপের মধ্যবর্তী খোলা জায়গাটা বেশ সুরক্ষিত, সীমানার দিকে পাথরসারি পেরোতে না পারলে ওদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না ইন্ডিয়ানরা।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। মাঝে মধ্যে দু'একটা গুলি করছে রেডস্কিনরা, কিংবা তীর ছুঁড়ছে। তবে মানুষ বা ঘোড়া, কারোই ক্ষতি হলো না। পুরো দলের মধ্যে শুধু বেন ডেভিসই একবার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেল, ছুটন্ত এক ইন্ডিয়ানকে বেঁধাতে চাইল সে; মেস্কিট আর শোলা ক্যাকটাসের ফাঁকে একটা ছায়া দেখেছিল মুহূর্তের জন্য; গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে নাকি টার্গেটে বিঁধেছে, কারও পক্ষে বলা সম্ভব হলো না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে খরতাপ ছড়িয়ে পশ্চিম আকাশে চলে গেল ক্লান্ত সূর্য, দূরের পাহাড়সারির আড়ালে চলে গেল একসময়। লাভাভূমির ওদিক থেকে ডেকে উঠল একটা কোয়েল, অনাগত রাতের ঘোষণা দিল।

আগুনের পাশে বসে কফি গিলছে এরিক, উষ্ণতা পেতে দু'হাতে মুঠো করে ধরেছে কাপটা। এখানে যা কিছু আছে, আনমনে ভাবছে ও, শুধু আগুন আর কফিকে বন্ধু বলা চলে; এই লড়াইয়ে বা এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায়নি ও, কিংবা এদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। একা থাকলে, নিজের পথে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারত ও, ইন্ডিয়ানদের অবরোধের মুখে পড়ত না; ওর ঘোড়াটা মরুভূমিতে

চলতে অভ্যস্ত, সঙ্গের ক্যান্টিন দুটো তুলনামূলক বড়-দুটোয় যতটুকু পানি আঁটে, দিব্যি কয়েকদিন চলে যেত। টুকসনের ট্রেইলে থাকার কথা, অথচ এখানে আটকা পড়ে গেছে, সঙ্গী হিসাবে আছে এমন কিছু মানুষ যাদের সঙ্গে হৃদয়তা নেই; ওর প্রতি দরদ দূরে থাক, বেশিরভাগ লোক ঘৃণাই করে ওকে।

‘আমরা কি বেরিয়ে যেতে পারব?’ জানতে চাইল মেলানি।

‘পারব।’

‘তোমার কী ধারণা—এরাই সব? নাকি আরও ইন্ডিয়ান আছে ধারে-কাছে?’

‘সঠিক বলা মুশকিল।’

‘বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবা হয়তো আমাকে খুঁজছে।’

‘ওর জায়গায় থাকলে আমিও তাই করতাম।’

‘কিন্তু খোঁজাখুঁজির দরকারটা কি? বেনকে ভালবাসি আমি, ওকে বিয়ে করব বলেই চলে এসেছি।’

‘বেশ তো, কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না।’

‘তুমি ওকে পছন্দ করো না, তাই না?’

শ্রাগ করল এরিক। ‘ওর সম্পর্কে কীই-বা জানি আমি? হয়তো ভালমানুষ সে...তবে তোমার যোগ্য নয়।’

‘তুমি এমনকী আমাকেও পছন্দ করো না।’

‘তোমার সমস্যাটা বড় কিছু নয়, সামান্য উপলব্ধির ব্যাপার মাত্র। এই দেশে তোমার বাবার গুরুত্ব কিংবা তার কাছে দেশটার গুরুত্ব যেদিন বুঝতে পারবে, মনে হয় না তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবে কেউ।’

‘বাবা একটা লোককে খুন করেছে, নিজের চোখে দেখেছি আমি।’

‘খুনোখুনি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, অন্তত এখানে। আমাদের কথাই ধরো, সত্যি যদি এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, দেখা যাবে অন্তত একজন হলেও ইন্ডিয়ান খুন করেছে আমরা, কিংবা নিজেদেরই খুন করেছে।’

‘বাবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা!’

‘আসলেই কি?’ স্মিত হাসল এরিক, ইশারায় ডোভসকে দেখাল। ‘ওর ব্যাপারে কী বলবে? যুদ্ধে ছিল ও, খুনোখুনি ছাড়া নিশ্চই কর্নেল হয়নি?’

‘কিন্তু সেটা তো যুদ্ধ ছিল!’

‘তোমার বাবাও যুদ্ধে রত ছিল, তবে তার সঙ্গে কোন ব্যানার বা গায়ে ইউনিফর্ম ছিল না, এই হচ্ছে পার্থক্য। ওর মত বহু মানুষ লড়ছে, কখনও একা কখনও হয়তো সঙ্গী পাচ্ছে...এটা বেঁচে থাকার লড়াই, টিকে থাকার লড়াই; এবং এভাবেই এই দেশটাকে গড়ে তুলছে ওরা। তোমার প্রতিবেলার খাবার, প্রতিটি পোশাক...সবকিছু ওই লড়াই বা যুদ্ধের ফসল।’

‘বাবা একটা ছেলেকে খুন করেছে, নিজের চোখে দেখেছি আমি...একেবারে বাচ্চা ছেলে!’

‘হ্যাঁ, তবে ওই ছেলেটার হাতে একটা পিস্তল ছিল, তাই না?’ উঠে দাঁড়াল এরিক। ‘বুনো দেশ এটা, ম্যা’ম। এখানে টিকে থাকতে হলে কঠিন হতে হয় পুরুষদের, সমর্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার যোগ্যতা থাকতে হয় মেয়েদের।’ ইশারায় মিমি রজার্সকে দেখাল ও। ‘ওকে দেখো, এই মেয়েটা পশ্চিমে টিকে থাকার জন্য যোগ্যা, যে-কোন পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হতে পারে ও। ওর মধ্যে দৃঢ়তা আছে, আবার মেয়েলি সত্তারও কমতি নেই। পরিপূর্ণ নারী।’

পানির কাছ থেকে দূরে সরে গেল ও, চুরুতির দুশ্চিন্তা জুড়ে বসল মনে। রেনিগেড এই ইন্ডিয়ান সম্পর্কে শোনা সব গল্প বা তথ্য মনে করার প্রয়াস পেল, টুকরো টুকরো ঘটনা জোড়া দিল; এসবের উপর নির্ভর করছে ওদের জীবন। চুরুতির দলকে ঠেকাতে হলে নানান তথ্য জানতে হবে, সেগুলোকে নিজেদের কাজে লাগাতে হবে।

পিছনে, রেগে গেছে মেলানি রিওস, একইসঙ্গে দ্বিধাশ্রিতও। প্রায় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মিমি রজার্সের দিকে তাকাল ও। কী আছে মেয়েটার মধ্যে যা ওর নেই? প্রশ্নটা নিজেকে করলেও, উত্তরটা জানা আছে ওর। সাহস আছে মিমির, প্রায় বিরল প্রকৃতির সাহস। খুব কম মেয়ের মধ্যে

গুণটা দেখা যায়। বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দুঃসময় পেরিয়ে এসেছে মেয়েটি, অথচ কাঁদা দূরে থাক, সামান্য ফোঁপায়ওনি। আর ও, তিক্ত মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো মেলানি, অ্যারিজোনার সবচেয়ে সুন্দর ও বিলাসবহুল র্যাঞ্জে থাকার পরও প্রতিদিন অভিযোগ করত যে ওখানে থাকা সম্ভব নয় ওর পক্ষে!

পাথুরে চাতালে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে এরিক ক্রেবেট, তবে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সচেতন। কূপ ছাড়াও আশপাশে কোথাও পানির উৎস রয়েছে নিশ্চই, সেগুলো খুঁজে পেয়েছে চুরুতি। ইন্ডিয়ানদের খুব বেশি পানির প্রয়োজন হয় না, অল্পতে অভ্যস্ত ওরা; কয়োট বা চ্যাপারাল মুরগীর মত দু'এক চুমুক পানি হলে দিব্যি কয়েকদিন কাটিয়ে দিতে পারে।

হামলা করতে দেরি হওয়ার কথা নয়, ধৈর্য ধরার নিশ্চই উপযুক্ত কারণ আছে চুরুতির। নিজেদের রক্ষিত সীমানা ছাড়িয়ে অন্ধকার মরুভূমির দিকে উদ্ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাল এরিক। কী পরিকল্পনা করছে চুরুতি?

আট

পাথুরে চাতাল থেকে কূপের কাছে নেমে এল এরিক। পানির কিনারার পিছন দিকে, একজন শুতে পারবে এমন একটা জায়গা খুঁজে পেল। দিনের উত্তাপ চলে যাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে পরিবেশ, দক্ষিণে উপসাগর থেকে ধেয়ে আসছে হালকা ঝিরঝিরে বাতাস।

বিছানায় শুয়ে, খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, হাজারো তারা জ্বলজ্বল করছে; মনে মনে একটা সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছে এরিক।

মিনিট কয়েক আকাশ-পাতাল ভাবার পর বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলো, চোখ বন্ধ করার পরক্ষণে ঘুমিয়েও পড়ল। কিন্তু হঠাৎ পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তুলেছে ওকে। অস্বাভাবিক নড়াচড়া টের পেয়েছে।

স্থির শুয়ে থাকল ও, সামান্যও নড়েনি, চারপাশে আবছা অন্ধকার। কান খাড়া করল। জেগে ওঠার পর মনে হয়েছিল, একটু আগে ঘুমিয়েছে, কিন্তু তারার অবস্থান দেখে বুঝল ইতোমধ্যে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অপেক্ষায় থাকল, একরকম নিশ্চিত যে কারও ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দে ঘুম ভেঙেছে। পাথুরে চাতাল, লাভাভূমি আর রক্ষিত সীমানার প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে নিরীখ করল। ফের শুনতে পেল শব্দটা, তবে এবার আগের চেয়ে কাছে।

কূপের কাছে একটা কিছু নড়ছে। আবছা একটা অবয়ব উঠে দাঁড়াল, মুহূর্ত কয়েক স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। বিশাল কাঠামো, এমনকী বিশালদেহী জেফ কেলারের চেয়েও...বিগ জুলিয়া!

এমন নয় যে কূপের কাছে যাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না মহিলার, কিংবা একই জায়গায় থাকার কথাও নয়; কিন্তু জুলিয়ার চলাফেরার মধ্যে এমন অস্বাভাবিকতা আছে যে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এরিক। ভারী স্যাডল ব্যাগ দুটো হাতে রয়েছে জুলিয়ার, পায়ে নিশ্চই মোকাসিন-শব্দ হচ্ছে না বললেই চলে। চুপিসারে, ইন্ডিয়ানদের মত ভূতুড়ে কায়দায় ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কূপের দক্ষিণে লাভার চাঙড়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেল, সারাক্ষণই ধাতব পদার্থের সঙ্গে ধাতবের সংঘর্ষের হালকা বনবান শব্দ হচ্ছে।

অনুসরণ করবে বলে উঠতে উদ্যত হয়েছিল এরিক, কিন্তু দ্বিধা করল। জুলিয়া যাই করুক, চায় না সেটা দেখে ফেলুক কেউ। কাজটা যাই হোক, সম্ভবত ওর কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই...নাকি আছে?

জুলিয়া যখন ফিরে এল, তখনও উদ্বিগ্ন এরিক। দেখল স্যাডল ব্যাগ দুটো নেই মহিলার হাতে।

মেয়ে তো বটেই, এমনকী গড়পড়তা পুরুষদের চেয়েও যথেষ্ট

শক্তিশালী জুলিয়া। স্যাডল ব্যাগ দুটো ওর জন্যও ভারী ছিল। প্রথম যখন এসেছিল, ঘোড়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ দুটো তুলে নিয়েছিল, অন্য কেউ নাড়াচাড়া করার সুযোগ যাতে না পায়; আর এখন...গোপনে ব্যাগ দুটো লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। অস্বাভাবিক তো বটেই, রীতিমত কৌতূহল বোধ করার মত...

আসলে কে এই বিগ জুলিয়া? সত্যি টুকসন থেকে এসেছে? সেক্ষেত্রে ঘোড়া দুটো এত তরতাজা থাকে কী করে? যদি অন্য কোথাও থেকে এসে থাকে, এত কম সময়ে টুকসনে গেল কী করে যেখানে মেলানির খোঁজে আসা জিম রিওসের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

এটা ওর ব্যাপার নয়, নিজেকে বোঝালেও ভারী ব্যাগের কথা মনে পড়ল এরিকের...এত ভারী কী হতে পারে? একমাত্র সোনারই এত ওজন। মূল্যবান কিছু না হলেই বা লুকিয়ে রাখবে কেন? এরিক ছাড়া অন্য কেউ কি দেখেছে ঘটনাটা?

অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর একসময় তুলতে শুরু করল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না, পরে যখন চোখ মেলে তাকাল, ধূসর ফ্যাকাসে আকাশ চোখে পড়ল। ঝড়িটি বিছানা ছাড়ল ও, বোডরোল গুটিয়ে রেখে নীচে কূপের কাছে চলে এল। হাত-মুখ ধয়ে রুমাল দিয়ে মুছল। আঙুল চালিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে কালো হ্যাট চাপাল মাথায়।

পাহারায় থাকা এড মিচেল এগিয়ে এল ওর দিকে। 'সব শান্ত,' জানাল সে। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল সে, চোখের কোণ দিয়ে দেখল এরিককে। 'উপসাগর কত দূরে, জানো? জানতে চাইছি, ওখানে যাওয়া সম্ভব?'

'তিনদিন লাগবে, বেশিও লাগতে পারে। পৌঁছতে হলে ভাল একটা ঘোড়া, প্রচুর পানি আর শয়তানের ভাগ্য দরকার হবে। এখান থেকে দক্ষিণে এক ফোঁটাও পানি পাবে না, সেরি ইন্ডিয়ান ছাড়া কোন মানুষ থাকে না ওদিকে।'

'এটাই হয়তো বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।'

‘অসম্ভব!’ কার কাছ থেকে ধারণাটা পেয়েছে মিচেল, মনে মনে ভারছে এরিক। ‘প্রচুর পানি লাগবে, অথচ একজন লোকের কাছে ক্যান্টিন থাকে একটা, বড়জোর দুটো। ওই পানিতে এতদূর যাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, ওখানে পৌঁছেই বা কী করবে?’

‘বোটে যদি চড়তে পারি...’

‘সম্ভাবনা কম। খুব কম বোটই এতদূর আসে, আর কোনটাই তীরে ভিড়ে না। উঁহুঁ, এড, অন্য কিছু ভাবো।’

ওর ব্যাখ্যায় নিরস্ত হয়েছে বলে মনে হলো না, পিছন থেকে মিচেলকে চলে যেতে দেখল এরিক। উপসাগরের দিকে যাওয়া চরম বোকামি হবে, যেখানে যথেষ্ট ঘোড়া বা পানি নেই সঙ্গে। যাবেও বা কীসের আশায়? কোন আশ্রয় বা বাহন সেখানে থাকলে তো? তা ছাড়া, পুরো পথে আছে লাভার চাঙড় আর পাথুরে জমি; কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই, নেই লোকালয়, এমনকী ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোন বাথানও পাওয়া যাবে না। পিনাকেটের চারধারে এরচেয়ে দুস্তর ও নির্জন এলাকা আর নেই। কিন্তু কারও কাছ থেকে ধারণাটা পেয়েছে মিচেল, সত্য-মিথ্যে বলে তাকে প্ররোচিত করেছে কেউ।

বাঁচার একটাই পথ—ইয়োমার দিকে যেতে হবে। অন্য কোন পথে চেষ্টা করা পণ্ড্রম হবে। দক্ষিণে মরুভূমিকে স্রেফ মৃত্যুফাঁদ বলা চলে। বাঁচতে হলে এখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, সম্ভব হলে ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্পের অবস্থান জানতে হবে। ক্যাম্পের অবস্থান জানা হয়ে গেলে পাল্টা আক্রমণ করতে পারবে ওরা, উচিত একটা শিক্ষা দিতে পারলে হয়তো ওদের ব্যাপারে আত্মহ হারিয়ে ফেলবে অ্যাপাচিরা। মাঝখানের সময়টুকু, এখানেই মোটামুটি নিরাপদ ওরা।

এমন নয় যে ইন্ডিয়ানরাই ওদের একমাত্র বা সবচেয়ে বড় শত্রু, বরং নিজেদের মধ্যকার বিদ্বেষ, ঈর্ষা বা প্রতিহিংসা এবং উদ্ভিন্ন অপেক্ষাই ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে। জানে হামলা করবে ইন্ডিয়ানরা, প্রতিটি মুহূর্ত তটস্থ থাকছে, অথচ আক্রমণ আসছে না—দুঃসহ এই উদ্বেগ বা স্নায়ুর চাপ কাটিয়ে ওঠা মুশকিল বটে।

*

পাহাড়ী চাতালে উঠে এল এরিক ক্রেবেট। চারপাশ বড় নীরব, মরুভূমিতে কিছুই নড়ছে না। চরম এই বিপদের মধ্যেও-অবরুদ্ধ অবস্থায়, যখন যে-কোন মুহূর্তে নৃশংস ইন্ডিয়ানরা হামলে পড়বে ওদের উপর, চারপাশে প্রতিটি পাথর বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে অ্যাপাচিরা-সকালের মরুভূমির সৌন্দর্য অভিভূত করছে এরিককে। মরুভূমির স্থবিরতা, সীমাহীন বিস্তৃতি, দূরে চিরুনির মত খাঁজকাটা পর্বতসারি, নিঃসঙ্গ শৃঙ্গ এবং সর্বোপরি সুনীল খোলা আকাশ...অপূর্ব লাগছে দেখতে।

কোথাও কিছু নড়ছে না, এমনকী গিরগিটিও নয়। মরুভূমির এই শান্ত চেহারা আসলে সতর্কসঙ্কেত, নৈঃশব্দ্য মানে অনাগত আক্রমণের আগমনবার্তা। টুকসনের পূর্বে বা ধারে-কাছে থাকলে হয়তো সাহায্য পেতে পারতেন, কিন্তু এখানে নিজেদের চেপ্টায় যা কিছু করতে হবে ভবিষ্যতে বা ভাগ্যে যাই থাকুক, সেটা নিজেদেরই নির্ধারণ করতে হবে।

হঠাৎ গতরাতে বিগ জুলিয়ার রহস্যময় তৎপরতার কথা মনে পড়ল ওর।

চোখের কোণে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল, চট করে রাইফেলটা একটু উপরে সুবিধাজনক পজিশনে নিয়ে এল এরিক, সতর্ক এবং প্রস্তুত।

কিছুই ঘটল না।

কিন্তু এরিক নিশ্চিত, ঝোপের পিছনে একটা কিছু আছে। জীবন্ত কিছু।

সোনাগুলো-যদি সত্যি সোনা হয়ে থাকে-কোথায় লুকিয়েছে জুলিয়া? কাজটা করতে বেশিক্ষণ লাগেনি, মিনিট কয়েকের মধ্যে সেরে ফেলেছে; তারমানে বেশি দূরে যানি, যেহেতু ইন্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়ার কিংবা হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আশপাশে গুপ্ত জায়গার অভাব নেই লাভার চাঙড আর বোল্ডারের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য জায়গা বায়েছে

যেখানে লুকিয়ে রাখতে পারে স্যাডল ব্যাগ দুটো-গর্ত, ফাটল, ধসে পড়া পাথর...। ব্যাগ দুটো সম্ভবত মাটি বা পাথরচাপা দেয়নি, কারণ এ-ধরনের কোন শব্দ কানে আসেনি ওর। বেশি দূরে যেহেতু যায়নি, পাথর চাপা দিলে পাথর গড়ানোর শব্দ নির্ঘাত শুনতে পেত। সেক্ষেত্রে, নিশ্চই কোন গর্ত বা ফাটলে নামিয়ে রেখেছে।

কফির জন্য আগুন ধরিয়েছে কেউ, ধোঁয়া উঠছে। মরুভূমি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকাল এরিক, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল মিমি রজার্স নয়, বরং মেলানি রিওস পানি চড়িয়েছে।

বগলে রাইফেল চেপে ধরে আগুনের দিকে যাচ্ছে জেফ কেলার, একপাশে চুল ঝাড়ছে জুলিয়া। মুহূর্তের জন্য মহিলাকে খুঁটিয়ে দেখল এরিক, বোঝার চেষ্টা করল; শেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো-বিপজ্জনক মহিলা; পুরুষদের মতই শক্তিশালী, কঠিন পাত্র।

সামনের মরু প্রান্তর খুঁটিয়ে দেখল এরিক। যথেষ্ট আড়াল আছে, চাইলে হামলার আগে একত্রিত হতে পারবে অ্যাপাচিরা। ঠিক ওখানেই একটু আগে নড়াচড়া চোখে পড়েছে ওর। অবচেতন মনের তাড়নায় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ও, সামনে দেখতে পেল ড্যান কোয়ানকে। চারটা আঙুল তুলে দেখাল তাকে।

সামান্য ইতস্তত করল ড্যান, পরে বুঝতে পারল কী চাইছে এরিক; কেলার, ডেভিস, ডাফি আর হার্শকে পাঠিয়ে দিল। পাথুরে ঢাল ধরে দ্রুত উপরে উঠে এল চারজন। বিপজ্জনক জায়গাটাকে সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায় তাদের বসিয়ে দিল এরিক, যার যার অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষায় থাকল সবাই।

ক্যাম্পে আকস্মিক তৎপরতায় আধো-ঘুম থেকে জেগে গেল এড মিচেল, রাইফেল তুলে নিয়ে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। পাথর আর ঝোপের আড়ালে অপেক্ষায় থাকল ওরা। মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল, কিন্তু কিছুই ঘটছে না; সকাল এখনও শীতল, স্বস্তিদায়ক। মরুভূমিতে কোন নড়াচড়া নেই। কিছুই নড়ছে না, এমনকী ধূলিও উড়ছে না। একেবারে শান্ত।

ঝাড়া বিশ মিনিট কেটে গেল। এরিকের সামনের পাথরটাকে ঘিরে চক্কর মারছে একটা মাছি। একই অবস্থানে থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওর পেশি।

আধ-ঘণ্টা পর অধৈর্য হয়ে উঠল ওরা। পঞ্চাশ ফুট দূরে এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা পাখি, ডানা ঝাপটাল। ক্যাম্পে আগুনে যোগ করার জন্য শুকনো ডাল ভাঙল কেউ, নিস্তরঙ্গ সকালে তীক্ষ্ণ শোনাল শব্দটা। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে মেলানি আর জুলিয়া, পাথুরে চাতালের উপরে অপেক্ষমাণ পুরুষরা কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

নিঃশব্দে গলা পরিষ্কার করল এরিক, লম্বা শ্বাস নিল। পকেট থেকে তামাক বের করছে কেলার। সূর্য উঠছে, পশ্চিমের পাহাড়ের চূড়ায় হলুদ আর গোলাপি ছোপ লেগেছে। হাই তুলে একটু পাশে সরে গেল ড্যান। আচমকা খমকে গেল পাখিটা, এক লাফে শূন্যে উঠল, তারপর দ্রুত সটকে পড়ল ঝোপের আড়ালে। পরপরই ঝড়ের বেগে এল অ্যাপাচিরা।

বালি বা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, অথচ একটু আগেও দেখে মনে হয়েছে ওখানে কিছু নেই; লাভার চাঁড়ের প্রান্ত থেকে বড়জোর ত্রিশ গজ দূরে। ভেবেছিল একজন পাহারায় থাকবে, বড়জোর দু'জন; কিন্তু ছয় রাইফেলের তোপের মুখে এসে পড়ল। চুরুতিকে দেখেই গুলি করল এরিক ক্রেবেট, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পিছনের এক অ্যাপাচির শরীরে বিদ্ধ হলো গুলিটা। পরমুহূর্তে চাতালে উঠে এল ছুটন্ত ইন্ডিয়ানরা। লড়াইটা পৌঁছে গেল হাতাহাতির পর্যায়ে, সমানে সমান।

এরিকের গুলির পরপরই চাতালে পা রাখল এক অ্যাপাচি। খপ করে ওর রাইফেলের ব্যারেল চেপে ধরল সে, কষে তার কুঁচকিতে লাথি হাঁকাল এরিক। ভারসাম্য হারাতে রাইফেল ছেড়ে দিল সে। রাইফেল ঘুরিয়ে গায়ের জোরে অ্যাপাচির মাথার উপর নামিয়ে আনল এরিক। পরিণতিতে কী হয়েছে দেখার সুযোগ হলো না, চোখের কোণ দিয়ে

আরেকজনকে দেখতে পেয়ে ঝটিতি গুলি করল, দেখল হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছে অ্যাপাচিটা।

পরপরই উধাও হয়ে গেল ইন্ডিয়ানরা, মিনিট দুয়েক আগে যেমন ছিল, তেমনি শান্ত ও নির্জন হয়ে গেল মরুভূমি। দু'এক জায়গায় রক্ত পড়ে আছে। আহত বা নিহতদের টেনে নিয়ে গেছে সঙ্গীরা।

একজনও নেই...এমনকী এরিক যার মাথায় রাইফেলের ব্যারেল চালিয়েছিল, সেও নেই। কোনভাবে গড়িয়ে সরে গেছে, তারপর বোল্ডার বা পাথরের আড়ালে চলে গেছে। ইন্ডিয়ান হামলার চিহ্ন নেই কোথাও, কেবল কয়েক জায়গায় বালিতে পড়া রক্ত, গানপাউডারের কটু গন্ধ এবং টম হার্শের বুকো একটা তীর সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নিখর পড়ে আছে হার্শ। বোল্ডারের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে কব্জি ব্যান্ডেজ করছে ড্যান, গুলি আঁচড় কেটেছে।

'ক'টাকে সাবাড় করেছি আমরা?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল টেরিল ডাফি।

'দুই বা তিনজন,' জবাবে বলল এরিক। 'আর তিন-চারজন আহত হয়েছে।'

'কীভাবে বুঝলে যে ওরা আসছে?' বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করল ড্যান।

'অনুমান। একটা ঝোপ নড়তে দেখে মনে হলো মোক্ষম সময় এসে গেছে।'

'এবার?' বেন ডেভিসের প্রশ্ন, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হার্শের দিকে। আহত সৈনিককে আগুনের কাছে বয়ে নিয়ে গেল জেফ কেলার।

'অপেক্ষা করব, ঘোড়ার উপর নজর রাখব। এবার ঘোড়ার জন্য চেষ্টা চালাবে ওরা।'

নিজের বেডরোলে চলে গেছে মিচেল। মরুভূমি শান্ত, স্থবির। মাংস আর কফি নিয়ে চাতালে উঠে এল মেলানি, গোথাসে গিলল এরিক।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে মেলানির দেওয়া কফিতে চুমুক দিল নরকে

ড্যান। ডেভিস আর ডাফি অপেক্ষা করছে।

‘সত্যি কি সম্ভাবনা আছে আমাদের?’ জানতে চাইল মেলানি।

‘আমার মতে আধাআধি, যদি গাঁট হয়ে বসে থাকতে পারি এখানে।’

‘ওরা এখানে চলে আসবে না তো?’

‘একটা মিনিট যদি অসতর্ক থাকি, দেখবে ঠিক ঠিক চলে এসেছে।’

উঠে দাঁড়াল ডাফি। ‘নীচে ঘোড়ার কাছে যাচ্ছি আমি।’

নীচ থেকে উঠে এল কেলার। বিশাল শরীর হলেও চলাফেরা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ, বাড়তি আয়াস খরচ করতে হয় না। গোড়ালির উপর বসে পাইপে তামাক ঠাসল সে। ঘন দাড়ির কারণে কালচে দেখাচ্ছে দুই চোয়াল। ‘রক্তক্ষরণ থামছে না,’ জানাল সে। ‘আমার মনে হয় এ-যাত্রা টিকবে না হার্শ।’

‘বিগ জুলিয়া ওর গুশ্রাষা করছে,’ বলল ড্যান।

‘হ্যাঁ,’ দেয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে কষে পাইপে টান দিল কেলার।

‘ওর স্যাডল ব্যাগ দুটো দেখেছ? মনে হলো খুব ভারী।’

বিশালদেহী সৈনিকের দিকে তাকাল ডেভিস। ‘নিজের চরকায় তেল দাও।’

‘দিতেই তো চাই, কিন্তু ব্যাগ দুটো দেখে কৌতূহল হচ্ছে। সোনা আছে বোধহয়, নইলে এত ভারী হবে কেন?’

কেউ কিছু বলল না। মরুভূমিতে ব্যস্ত এরিক ক্রেবেটের দুই চোখ। আর কেউ না হলেও ঠিকই খেয়াল করেছে কেলার, ভাবছে এরিক, নির্ঘাত ঝামেলা করবে সে। যা স্বভাব, সেনাবাহিনীতে আছে বলে প্রভাব খাটাবে কেলার, চাই কি সোনা নিয়ে পগার পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করতে পারে।

করালের ওদিকে মুহূর্মুহু গুলির শব্দ হলো, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এল। সবশেষে, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা টনি চিডলের বন্দুক গর্জে উঠল।

সূর্য প্রায় মাথার উপর উঠে গেছে। দারুণ গরম পড়বে। এরইমধ্যে পিঠ তাতাচ্ছে। ক্রল করে ওদের পাশে চলে এল মার্ক ডুগান। 'পানির লেভেল প্রায় দুই ইঞ্চি নেমে গেছে,' বলল সে। 'কেউ বোধহয় এ-নিয়ে আমল দেয়নি। আমরা খাচ্ছি, ঘোড়াও কম নয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করে ফেলেছি। আজীবন তো থাকবে না কূপের পানি।'

কেউ ভাবেনি তা নয়, এরিক ভেবেছে। তিনটা কূপই তলার দিকে সরু। নীচের কূপে পানি এমনিতে কম ছিল, ওটা থেকে ঘোড়াগুলোকে খাইয়েছে; অন্য দুটোয় পানি থাকলেও দলটা বেশ বড় ওদের, যোগানের সঙ্গে খরচের কথা চিন্তা করলে দুশ্চিন্তা হতে বাধ্য। এভাবে খরচ করলে শিগ্গিরই শেষ হয়ে যাবে।

এভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় কতদিন টিকতে পারবে? দু'দিন, তিনদিন? উঁহু, বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না অ্যাপাচিদের। এদের সম্পর্কে জানে বলে সেই চেষ্টা করার ইচ্ছে নেই এরিকের। কিন্তু বিকল্প কোন উপায়ও নেই। বিশাল মাথাটাকে খাটাচ্ছে কেলার, ডুগান সারাক্ষণই গম্ভীর হয়ে আছে আর বুড়ো নেকড়ের মত সতর্ক চোখে ডুগানকে নজরে রাখছে এড মিচেল। যে-কোন সময়ে গাড্ডা বেধে যেতে পারে। মেয়েদের ব্যাপারেও নিশ্চিত নেই এরিক, বিগ জুলিয়া অস্বস্তি ধরিয়ে দিয়েছে ওর মনে, কারণটা নিজেও জানে না।

মাথার উপর উঠে এসেছে সূর্য। দাবদাহে খাক হয়ে যাওয়ার যোগাড়। কপাল থেকে ঘাম মোছার সময় বিড়বিড় করে উত্তাপ, ধূলি আর নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল এরিক; মনে মনে ভাবছে, যাই ঘটুক এদের কাছে ওর হতাশা প্রকাশ করা যাবে না। বরাবরের মত আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে।

'নচ্ছারগুলো আবার হামলা করলেই ভাল হত,' অধৈর্য স্বরে বলল বেন ডেভিস। 'এভাবে অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না!'

সারেক কর্নেলের দিকে তাকাল এরিক। আভিজাত্য হারিয়ে গেছে। ক্ষৌরিহীন অবস্থায় লোকটাকে তুলনামূলক দুর্বল এবং বিরক্তিকর মনে

হচ্ছে। ডেভিসের দামী ঝলমলে পোশাকের দশা এ-মুহূর্তে ওরগুলোর চেয়েও করুণ; সব মিলিয়ে জড়সড়, পরাজিত একজন মানুষ মনে হচ্ছে তাকে।

দূরে, মরুভূমিতে নাচছে তাপতরঙ্গ। অসীম ধৈর্য নিয়ে মাথার উপর চক্কর কাটছে একটা শকুন।

নয়

প্রলাপ বকছে টম হার্শ, জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে গেছে সে। সবাই জানে কী ঘটতে যাচ্ছে, এমনকী অ্যাপাচিরাও জেনে গেছে। মাঝে মধ্যে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে হার্শ, তপ্ত নিস্তরঙ্গ বাতাসে বড় করুণ আর তীক্ষ্ণ শোনাচ্ছে চিৎকারটা। হার্শের শিয়রে বসে আছে মিমি, কপালে জলপট्टি লাগিয়েছে, কিছুক্ষণ পর পর জ্বরে পুড়তে থাকা মুখ মুছে দিচ্ছে।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছে বেন ডেভিস। কোটের কিনারা সরে গেছে একপাশে, জামার আস্তিন গুটিয়ে ফেলেছে। হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা চোখে, পড়ছে এখন, চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকে দেখল এরিক ক্রেবেট। পিস্তলের চকচকে বাঁট দেখে বোঝা যাচ্ছে বহুল ব্যবহৃত। উদ্ভান্ত দেখাচ্ছে ডেভিসের ক্ষৌরিহীন মুখ, আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

প্রচণ্ড উত্তাপ, উদ্ভিন্ন অপেক্ষা, হামলার আশঙ্কা এবং মুমূর্ষু টম হার্শের চিৎকার...সবই চাপ সৃষ্টি করছে ওদের মনে। মাথার উপর আগেরটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরেকটা শকুন...নিতান্ত আলসেমি কিন্তু অসীম ধৈর্য নিয়ে বড়সড় চক্কর কাটছে। এদিকে কিছুই ঘটছে না।

হঠাৎ এরিকের মুখোমুখি হলো ডেভিস। 'বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!' চোঁচিয়ে বলল সে। 'এখানে আর একটা মুহূর্তও থাকা যাবে না!'

'দুঃখিত, একমত হতে পারলাম না।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পিঠ-পিছন থেকে দেখতে পেল এরিক।

আঙনের ধারে ওর পাশে এসে দাঁড়াল মেলানি। 'এরিক, খাবার কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে গেছে,' জানাল মেয়েটি।

সম্বোধনটা শুনে রীতিমত বিমূঢ় বোধ করল এরিক। চমক সামলে নিয়ে জানতে চাইল: 'কতটুকু আছে, বলো তো?'

'আজকের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু কালকে সবার হবে না।'

এ-নিয়ে আগেই ভাবা উচিত ছিল। কারও সঙ্গেই যথেষ্ট খাবার ছিল না, এবং খাচ্ছে কম করে, যাতে যত বেশিদিন সম্ভব চলে। ইতোমধ্যে যে ফুরিয়ে যায়নি, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার; এর কারণ: অন্য সব বিষয়ে এতটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে যে খাওয়ার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না কেউ। সামান্য কিছু মুখে দিয়েই সন্তুষ্ট সবাই।

সারাক্ষণ পাহারা না দিয়ে উপায় নেই, খাবার যোগাড় করার চেয়েও ঢের জরুরি কাজ এটা। অ্যারোয়োতে ওদের অবস্থান যত সুদৃঢ়ই হোক, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে সচেতনতা; অ্যারোয়োর কিনারে মাত্র একজন অ্যাপাচি পৌঁছতে সক্ষম হলে উল্টে যাবে পরিস্থিতি।

তখন হয়তো...এখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

তবে এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে, খোলা মরুভূমিতে টিকে থাকার সম্ভাবনা যে কত কম, ভাল করেই জানে এরিক। মিচেল, চিডল বা সার্জেন্ট হ্যালিগানও জানে। অন্যরা কতটা উপলব্ধি করেছে সঠিক জানা নেই ওর, কেবল অনুমানই করতে পারে, তবে ডেভিস, ডুগান আর কেলার চলে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু খোলা মরুভূমিতে, যেখানে সবার জন্য একটা করে ঘোড়া থাকবে না, অ্যাপাচিদের জন্য স্রেফ নরকে

সহজ শিকারে পরিণত হবে ওরা। সেক্ষেত্রে, স্রেফ লেগে থাকলেই হবে, দূর থেকে গুলি করে ওদের ঘায়েল করে ফেলতে পারবে ইন্ডিয়ানরা।

উঁহু, তারচেয়ে এখানে থাকা ঢের নিরাপদ।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেও মনে মনে বিকল্প ভাবছে এরিক, আশায় আছে হয়তো একটা সুযোগ আসবে, নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হবে ওরা।

দক্ষিণে যাবে? কতদূর যাবে? বহু মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই, দুস্তর মরুভূমি আর রুক্ষ প্রান্তর, সবশেষে রয়েছে পরিত্যক্ত বালিময় উত্তপ্ত সাগরতীর, পানির উৎস আছে কি-না জানা নেই ওদের, ক্ষীণ আশা নিয়ে থাকতে হবে যে দক্ষিণ থেকে আসা জেলে-বোট বা কলোরাডোর উদ্দেশে যাত্রা করা কোন স্টীমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

‘তো, কী করব আমরা এখন?’ ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল জেফ কেলার। ‘এখানে থেকে অনাহারে কাটাব, নাকি শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রাণপণে ছুটব?’

আগুনের ধারে বসে ছিল বেন ডেভিস, প্রশ্নটা শুনে চোখ তুলে এরিকের দিকে তাকাল, মুখ নির্বিকার। ‘হ্যাঁ, বলো, নেতা হিসাবে তোমারই কর্তব্য বাতলে দেওয়া উচিত,’ ক্ষীণ উপহাস ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। ‘আমরা জানতে চাই আসলে কী করতে চাইছ তুমি।’

‘গাঁট হয়ে বসে থাকব এখানে।’

‘নিকুচি করি!’ ঝট করে উঠে দাঁড়াল ডুগান। ‘মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার? এখানে থাকলে স্রেফ ভুখায় মারা যাব, নইলে একেকবারে একজন করে শেষ হয়ে যাব। হার্শের মত হবে আমাদের দশা! উঁহু, এখানে থাকার খায়েশ নেই আমার। মরুভূমিতে নেমে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছোটানোর পক্ষে আমি!’

‘মেয়েরাও কি তোমার মত ছুটবে?’ মৃদু স্বরে জানতে চাইল এরিক।

দৃষ্টি সরে গেল ডুগানের, রাগে জ্বলছে চোখজোড়া, নিজের ধারণা থেকে সরে আসতে নারাজ। 'আবারও বলছি, হাতে জান নিয়ে ছোট উচিত আমাদের।'

'খোলা জায়গায় টিকে থাকার কতটা সম্ভাবনা আছে আমাদের?' এরিকের প্রশ্ন। 'আমার মতে সামান্য সম্ভাবনাও নেই। তা ছাড়া, সঙ্গে ঠিক কতটুকু পানি নিয়ে যেতে পারবে?'

'যে-কোন সময়ে ছোট্র জন্য তৈরি আছি আমি,' বলল টিমথি ব্লট। 'আমার তো মনে হয় দশ-বারোজনের বেশি হবে না অ্যাপাচিরা।'

'যতজনই থাকুক,' দৃঢ় স্বরে বলল এরিক। 'এখানেই থাকছি আমরা।'

'এত খায়েশ যখন তুমি থাকো!' কুৎসিত শোনাল কেলারের কণ্ঠ। 'আমি চলে যাচ্ছি, এবং এখনই!'

'আমিও যাব!' ঘোষণা করল ব্লট।

'বেশ, যেতে চাইলে যাবে, কিন্তু কোন ঘোড়া পাবে না। পায়ে হাঁটতে হবে তোমাদের,' সোজাসাপটা জানিয়ে দিল এরিক।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল জেফ কেলার। ঠাণ্ডা হিসাবী চাহনিতে মাপল এরিককে। 'শুনে নাও ভাল করে, এখান থেকে চলে যাব আমি,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'এবং জেব্রা ডানটায় চড়ব।'

কনুই পিছনে ঠেলে দিয়ে শরীরের ভার চাপাল ডেভিস, আধশোয়া হয়ে বসেছে, পা মেলে দেওয়া। মৃদু হাসি খেলা করছে ঠোঁটের কোণে, ব্যঙ্গাত্মক; চাহনিতে অগ্রহ। দারুণ মজা পাচ্ছে সে, আশা করছে বিশালদেহী সৈনিকের হাতে নাকাল হবে এরিক।

হ্যালিগান, মিচেল বা চিডল, কেউই ধারে-কাছে নেই। হয় পাহারায় আছে, নয়তো ঘুমাচ্ছে। পাথুরে চাতালের উপরে আছে ড্যান কোয়ান। যারা আছে, মেয়েদের বাদ দিলে, এরিকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সবাই।

শোডাউন চাইছে কেলার...দিব্যি টের পাচ্ছে এরিক। কেলার কেন, কাউকেই খুন করতে চায় না, কিন্তু নাচার ও। এগিয়ে আসছে

বিশালদেহী সৈনিক, খানিক পাশে সরে গেল টিমথি ব্লট।

চট করে এক পা পিছিয়ে গেল এরিক, সিক্সশূটারের বাঁটে চলে গেছে হাত। ‘সময় থাকতে পিছিয়ে যাও,’ শীতল সুরে বলল ও। ‘তোমাদের কাউকেই খুন করতে চাই না আমি। সত্যি কথা হচ্ছে, দু’জনকেই দরকার হবে আমাদের।’

‘কিন্তু তোমাকে দরকার নেই আমাদের!’ খরখরে স্বরে হাসল কেলার। ‘খুন করবে কি, ড্র করার সুযোগই পাবে না।’

‘ঠিকই বলেছ,’ সায় জানাল ডেভিস। ‘মরতে চাইলে পিস্তল ড্র করতে পারে ও।’

নাজুক, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি... ডেভিসের হাতে পিস্তল দেখে জমে গেল এরিক। ওর বুক বরাবর নিশানা করেছে সাবেক কর্নেল।

‘বেন!’ চিৎকার করল মেলানি। ‘না!’

‘ওরা তো বেঠিক কিছু বলেনি, মেলানি,’ সাফাই গাইল ডেভিস। ‘এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের। শুধু তা হলেই যদি প্রাণ রক্ষা হয়। ওর পিস্তলটা তুলে নাও, কেলার।’

‘ওই কাজটা করতে যেয়ো না, বিগম্যান,’ মেয়েলি একটা কণ্ঠ শুনে জায়গায় জমে গেল সবাই।

বিগ জুলিয়ার শটগানটা দেখা যাচ্ছে মিমি রজার্সের হাতে, অস্ত্র ধরার ভঙ্গি অনায়াস, অভ্যস্ত লোকের মত। নলটা স্থির হয়ে আছে বেন ডেভিসের পেট বরাবর, দূরত্বটা মাত্র ত্রিশ ফুট।

‘পিস্তল ফেলে দাও, মি. ডেভিস, এখনই। সামান্য নড়েছ কি তোমাকে দুই টুকরো করে ফেলব;’ তীক্ষ্ণ স্বরে জানিয়ে দিল মিমি। ‘দ্বিতীয় ব্যারেলটা খালি করব ওর উপর।’ মাথা ঝাঁকিয়ে জেফ কেলারের দিকে ইঙ্গিত করল ও। ‘গুলি করব কি-না, যদি সামান্য সন্দেহও থাকে তোমার মনে, আমি দুই গোনা পর্যন্ত হাতে ধরে রাখো পিস্তলটা। এক, দু...’

পিছিয়ে গেল ডেভিস, মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। পিস্তল ফেলে দিয়ে এরিকের দিকে ফিরল, চোখে বিদ্বেষ। ‘ভুলেও ঘুমিয়ো না, ক্রেবেট,

পস্তাবে তা হলে । ঘুমিয়েছ কি তোমাকে খুন করে ফেলব আমি!’

‘ও যখন ঘুমাবে,’ মৃদু স্বরে বলল মিমি । ‘আমি তখন জেগে থাকব, মিস্টার ।’

*

তিন বিদ্রোহী চলে যাওয়ার পর মিমি রজার্সের দিকে ফিরল এরিক । ‘ধন্যবাদ,’ সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা জানাল ও ।

ওর দিকে ফিরল মেয়েটি । ‘কেউ যদি এখান থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যেতে পারে, সেই লোকটি হচ্ছে তুমি ।’

পুরো ঘটনাই দেখেছে মেলানি । আগুনের কাছে ফিরে যাচ্ছে মিমি, সাগ্রহে দেখল মেয়েটিকে । শেষে এরিকের দিকে ফিরল । ‘তোমার কথা’র অর্থ বুঝতে পেরেছি এখন,’ আন্তরিক স্বরে বলল ও । ‘হ্যাঁ, যোগ্য ও, অদৃশ্য একটা শক্তি আছে ওর মধ্যে ।’ সামান্য দ্বিধার পর জানতে চাইল, ‘কী মনে হয় তোমার, সত্যি কি বেনকে গুলি করত ও?’

গম্ভীর মুখে নড করল এরিক । ‘যা বলেছে, ঠিক তাই করত ও । আসল কথা হচ্ছে, ডেভিসও সেটা বুঝতে পেরেছিল । ট্রিগারে চেপে বসেছিল মিমির আঙুল, দেখেই বুঝি নেয়নি সে ।’

‘বুঝতে পারছি না,’ ভুরু কুঁচকে বলল মেলানি । ‘হয়েছেটা কী বেনের?’

অ্যারোয়োর কিনারা বরাবর দৃষ্টি চালাল এরিক । ‘হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,’ শুকনো স্বরে সম্ভাবনা বাতলাল ও । ‘এমন দুঃসময়ে বহু লোকই নিজেকে চিনতে শেখে ।’

সাদা ইম্পাতের মত তপ্ত আকাশে ঝলসাচ্ছে সূর্য । চারপাশে লাভা এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে ছুঁলেই হাতে ফোঁসকা পড়ে যাবে । সব ঘোড়াকে পানি খাওয়াল ওরা, তারপর নীচের অ্যারোয়োর অপ্রশস্ত ছায়ায় নিয়ে এল । পুরো সময়টায়, মরুভূমিতে কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না, অ্যাপাচিদের উপস্থিতির কোন নমুনাই নেই—এক ফোঁটা বাতাস নেই, কোয়েলের ডাক নেই, নিঃসীম নীরবতার মধ্যে নুড়িপাথর গড়ানোর সামান্য শব্দও হলো না । তৃষ্ণার্ত আকাশ তেষ্ঠা মিটাচ্ছে

কূপের পানি থেকে, নীচে সন্ত্রস্ত মানুষগুলোও তৃষ্ণা নিবারণ করছে।
একটু একটু করে কমে যাচ্ছে বহু মূল্যবান পানি।

*

পড়ন্ত বিকাল। এক জায়গায় বসে শূন্য মরুভূমিতে চোখ রাখতে রাখতে ক্লান্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছে টিমথি ব্লট। এখন পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি! স্তূপীকৃত পাথর আর ঝোপের আড়াল থেকে মাথা বের করে উঁকি দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। অথও নীরবতার মধ্যে তীক্ষ্ণ শোনাল শব্দটা, তারপর প্রতিধ্বনি তুলে অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেল। সামনের দিকে হুমড়ি খেল তরুণ সৈনিক, পাথরে কয়েক গড়ান খেল তার দেহ, আট ফুট নীচে চ্যাপ্টা একটা পাথরের উপর পড়ল। স্থির পড়ে থাকল।

ছুটে তার কাছে চলে গেল ওরা। প্রথমে মেলানি, তারপর বিগ জুলিয়া আর এরিক। মুখ তুলে তাকাল জুলিয়া। ‘মারাত্মক নয় জখমটা, স্রেফ ছুঁয়ে গেছে বুলেট। সুস্থ হয়ে যাবে ও।’

অ্যারোয়োয় নেমে এল এরিক। ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে মিচেল। চ্যাপ্টা একটা পাথরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে চিডল, একচুলও নড়ছে না। তার পাশে এসে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল এরিক। ‘কী মনে হয় তোমার? ক’জন আছে ওরা?’

শ্রাগ করল টনি চিডল। ‘সম্ভবত বিশজন...তবে বেশিও হতে পারে। যদূর জানি লোকবল যথেষ্ট না হলে হামলা করে না চুরুতি।’

‘খাবার দরকার আমাদের। ভাবছি রাতে চেষ্টা চালাব।’

‘খুন হয়ে যাবে।’

‘উঁহু,’ আঙুল তুলে একটা স্মোক-ট্রির গোড়ার কাছাকাছি আলগা ঝোপ দেখাল এরিক। ‘অ্যারোয়োর তলা দিয়ে যাব আমি, তুমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। ইন্ডিয়ানদের মত নিঃশব্দে চলতে জানি। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দক্ষিণের পাহাড়ে কয়েকটা ভেড়া দেখলাম। তেষ্ঠা মেটাতে এসেছিল ওরা, আমাদের দেখে নিরাশ হয়েছে, আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল অনেকক্ষণ। চেষ্টা করলে হয়তো দু’একটাকে

খুঁজে বের করতে পারব।’

‘গুলির শব্দ শুনতে পাবে অ্যাপাচিরা।’

‘তীর-ধনুক ব্যবহার করব। চেয়ানিদের সঙ্গে থাকার সময় বহুবার তীর-ধনুক ব্যবহার করেছি।’

‘আমিই যাই। তোমার চেয়ে আমার সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।’

‘পারবে তুমি, কিন্তু আমিই যাব। আমাকে না দেখে হয়তো আলাপ-আলোচনা শুরু করবে ওরা। কোথায় গেছি, সেটা-যেন জানতে না পারে কেউ, বুঝেছ?’

খাবার সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কয়েকটা দিন যদি টিকে থাকতে পারে, হয়তো এটাই নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে। এতক্ষণে নিশ্চই সন্দেহ করতে শুরু করেছে ইয়োমার লোকজন বা সৈন্যরা। শেরিফের পাসি ফিরে যায়নি, আরেক দলকে প্রথম দলের খোঁজে পাঠানোর কথাবার্তা চলছে নিশ্চই। সেটাই স্বাভাবিক।

একই সময়ে সৈন্যদের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা সতর্ক করে তুলবে ইয়োমার লোকদের, ধরে নেবে এর জন্য ইন্ডিয়ান হামলাই দায়ী। পূর্ব দিক থেকে কেউ আসছে না, এ-থেকে আসল ঘটনা অনুমান করে নেবে তারা। আরেকটা দল পাঠানোর মত যথেষ্ট সৈন্য নেই ফোর্টে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত করলে সম্ভব হতে পারে।

ইন্ডিয়ানদের যদি আটকে রাখতে পারে, বাঁচার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে ওদের। এখন পর্যন্ত, লড়াইয়ের ফলাফল ওদের পক্ষেই আছে। হার্শ মারা যাচ্ছে—একেবারে চুপ হয়ে গেছে এখন—এছাড়া, সন্তোষজনক বলা চলে পরিস্থিতি। যারা আছে, সবাই একাট্টা থাকলে হয়তো ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অ্যাপাচিদের। অবস্থানটা দারুণ ওদের। পানি কমে গেলেও, যা আছে তাতে এমনকী প্রচণ্ড গরম থাকলেও আরও কয়েকদিন চলে যাবে। তাপমাত্রা একশো ডিগ্রিরও বেশি, কিন্তু খাবার থাকলে টিকে থাকতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

পাহাড়ী ভেড়াগুলো মানুষের ব্যাপারে অসচেতন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ওগুলোর মাংসও খুব সুস্বাদু। বিগহর্ন জাতের, উত্তরাঞ্চলের স্বজাতি থেকে একটু ভিন্ন। বেশ কয়েকবারই রীজের কিনারা থেকে নীচের কূপে নজর রেখেছিল পশুগুলো, দেখেছে এরিক, হয়তো এখনও ওখানেই আছে ওরা।

প্রমাণ সাইজের একটা ভেড়া যদি শিকার করতে পারে, দিব্যি এক সপ্তাহ চলে যাবে। ইন্ডিয়ানদের যদি ঠেকিয়ে রাখতে পারে, ততদিনে হয়তো ইয়োমা থেকে পৌঁছে যাবে রিলিফ পার্টি। এ-ধরনের অভিযানে উত্তরের ট্রেইল ধরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু বেটস ওয়েলে গিয়ে যদি দেখে ওটার পানি শূন্য, দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। পাপাগো ওয়েল্‌স সম্পর্কে জানে ইয়োমার লোকজন, দক্ষিণে এলে ওদের খুঁজে পাবে তারা।

সবকিছু নির্ভর করছে ওদের একাট্টা থাকার উপর। পানি আছে, এখন দরকার খাবার।

জেফ কেলারকে নিজের অনুপস্থিতি জানাতে চায় না এরিক, আশঙ্কা করছে তা হলে গণ্ডগোল বাধিয়ে বসবে সে। হ্যালিগান হয়তো সামলে রাখার চেষ্টা করবে তাকে, কিন্তু সার্জেন্টের চেয়ে ঢের বেপরোয়া সে। দু'জনে মুখোমুখি হলে টিকতে পারবে না সার্জেন্ট।

*

সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পরে যাত্রা করল এরিক ক্রেবেট। পাথুরে চাতালে পাহারায় রয়েছে বেন ডেভিস, ড্যান ঘুমাচ্ছে। কেলারও শুয়ে পড়েছে, কাছাকাছি বিগ জুলিয়া—তবে অতটা কাছে নয় যে সন্দিহান হয়ে উঠবে মহিলা। অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান নিয়েছে অথবা ঘুমাচ্ছে। চিডল ছাড়া কাউকে নিজের উদ্দেশ্য জানায়নি এরিক।

পিস্তল রেখে শুধু ধনুক আর আধ-ডজন তীর এবং বাউই ছুরি সঙ্গে নিয়েছে ও।

উপুড় হয়ে শুয়ে, সত্ত্বর্পণে শরীর মুচড়ে স্মোক-ট্রির নিচু শাখা এড়িয়ে পাথুরে জমিতে চলে এল এরিক। মিনিট কয়েক স্থির পড়ে

থাকল, কান খাড়া। চারপাশে অসংখ্য পাথর-নানা আকার, বিচিত্র রঙ আর বিভিন্ন সাইজের। অসীম সতর্কতার সঙ্গে ক্রল করে এগোল ও, পাথুরে জমি ছাড়িয়ে বালির কিনারে পৌঁছল। এখানেও থেমে কান পাতল। মনোযোগ দিয়ে শুনল শব্দ। বেরোনোর পর আধ-ঘণ্টা পেরিয়েছে, ততক্ষণে ব্যারিকেড থেকে মাত্র শব্দগণ গজ এগিয়েছে। এ-পর্যন্ত কাউকে চোখে পড়েনি। এগোতে যাবে, তখনই নুড়িপাথর গড়ানোর চাপা শব্দ কানে এল।

ঝোপের ছায়া থেকে বেরিয়ে ওঅশ ধরে ব্যারিকেডের দিকে এগোল গাঢ় একটা কাঠামো, দেখতে পেল এরিক, বড়জোর দশ ফুট দূরে আছে লোকটা। নিঃশব্দে এগোল ইন্ডিয়ান, তাকে চলে যেতে দিল এরিক, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগোল নিজের পথে।

আরও এক ঘণ্টা পর প্রথম বিগহর্নটাকে দেখতে পেল ও। দেখার আগেই শব্দ শুনে উপস্থিতি টের পেয়েছে, বাক খাওয়া ব্লাফে ঘাস চিবুচ্ছে ওটা, ওর দৃষ্টিসীমার আড়ালে। তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল এরিক। যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে, সামান্য শব্দ পেলে পগার পার হয়ে যাবে ভেড়াটা। ওটা ছুটে পালালে হয়তো অন্যগুলোও তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে, অন্য একটাকে তখন এত কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই না। সেক্ষেত্রে, সামান্যও নড়া যাবে না, মনে মনে নিজেকে শুধাল এরিক; এবং তাই করল।

ধীরে ধীরে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েকবারই পাথরের সঙ্গে ভেড়াটার খুরের সংঘর্ষের হালকা শব্দ কানে এসেছে। কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বাম দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে ব্লাফটা, ঘাস খেতে খেতে ভেড়াটা যদি ওদিকে সরে যায়, আকাশের বিপরীতে ওটার কাঠামো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

অপেক্ষায় থাকল এরিক। ব্লাফের উপর, দূরে অন্ধকার আকাশে ঝুলে আছে নিঃসঙ্গ একটা তারা। বিগহর্ন ভেড়ার হালকা পায়ের শব্দ কানে এল, তারপর আবারও হলো শব্দটা। সম্ভবত আরেকটা ভেড়া, আরও দূরে। নাকি অন্য কিছু?

স্থির পড়ে থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনল ও। খুব কাছে, দশ ফুট দূরে ওর মতই পড়ে থাকা এক লোকের অস্পষ্ট নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল! দ্বিধা করল এরিক। হঠাৎ নড়ে উঠল ভেড়াটা, পরমুহূর্তে ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার টোয়াঙ শব্দ কানে এল, লক্ষ্যে তীর বিদ্ধ হওয়ার ভেঁতা আওয়াজ হলো এবার, এবং পরপরই ভেড়াটার বিস্ময়সূচক অস্ফুট কাতরানি শুনতে পেল। লাফিয়ে সামনে এগোল ওটা, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, গড়ান খেয়ে চিৎ হলো, বিশাল শিংয়ের সঙ্গে পাথরের সংঘর্ষে ধাতব শব্দ হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগোল এক ইন্ডিয়ান।

শ্বাসরুদ্ধকর একটা মুহূর্তে নিজের কাঠামোকে পরিষ্কার করে তুলল ইন্ডিয়ান, ধনুক ঘুরিয়ে তীর ছুঁড়ল এরিক। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে! সামান্য শব্দ, কিন্তু তাতেই সতর্ক হয়ে গেছে অ্যাপাচিটা, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল এরিকের উপর। সংঘর্ষে ভূপতিত হলো দু'জনেই, তবে ধাক্কাটা এরিকের উপর দিয়ে গেল বেশি। অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ মুহূর্তে পা ভাঁজ করে ফেলেছে ও, জোড়া হাঁটুর উপর এসে পড়ল অ্যাপাচি। তীব্র ঝাঁকি মেরে তাকে ফেলে দিল এরিক, গড়ান খেয়ে সরে এল, ইতোমধ্যে ছুরি বের করে ফেলেছে।

আক্রমণ চালাল অ্যাপাচি। তীক্ষ্ণধার ছুরির বাতাস কাটার শব্দ শুনতে পেল এরিক, ওর কানের পাশ দিয়ে গিয়ে শার্ট কেটে ফেলল। একই মুহূর্তে বাম হাতে ব্যাটার পেটে জবর ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে ও। মারে যথেষ্ট জোর ছিল, টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, তারপর একই সময়ে ঝটিতি খাড়া হলো ওরা।

বুনো উন্মত্ততায় ছুরি চালাল এরিক, টের পেল লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। পরমুহূর্তে আষ্টেপৃষ্ঠে যুঝতে শুরু করল দু'জন। উষ্য, ভেজা ও পিচ্ছিল শরীর জাপটে ধরল এরিক, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। ঝাড়া মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ইন্ডিয়ান, এক পা পিছিয়ে গেল। এরিকও এগোল। নিচু করে ধরা ছুরি ওর হাতে, ধারাল দিকটা

উপরমুখী, ইন্ডিয়ানের পেটে আঘাত হানতে প্রস্তুত ।

ঝাঁকে পড়েছে দু'জনেই, পরস্পরকে ঘিরে চক্কর কাটছে । আচমকা আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করল ইন্ডিয়ান । নিচু হয়ে ছুটে এল সে, তারার আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ছুরিটা, নিজের ভারী ব্লেড দিয়ে সেটা ঠেকাল এরিক, মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো দুটো দেহের, তারপর, এমনকী দুই ব্লেডের সংঘর্ষও হলো । এক পা আগে বাড়ল এরিক, সমস্ত শক্তি প্রয়োগে ঝাঁকি দিয়ে উপরের দিকে চালাল ছুরিটা । পিছলে সরে গেল ইন্ডিয়ানের ছুরি, এরিকেরটা তার শরীরে আমূল ঢুকে গেল ।

অস্ফুট কর্কশ স্বরে খাবি খেল অ্যাপাচি, নিচু কণ্ঠে বলল কী যেন । কণ্ঠটা এত ম্লান যে কিছুই বুঝতে পারল না এরিক । ভোঁতা শব্দে বালির উপর পড়ল রেডস্কিনের দেহ । গলার গড়গড় শব্দ শুনে বুঝল মারা যাচ্ছে লোকটা । পিছিয়ে এসে চারপাশে তাকাল নিজেকে সুস্থির করার ফুরসতে । ধারে-কাছে কোথাও পড়ে আছে মৃত ভেড়াটা, ওটার মাংস নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে ।

ভেড়াটার পেটের সাদা ছোপে তারার আলোর প্রতিফলনে দূর থেকে ওটাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হলো এরিক । কাছে গিয়ে দ্রুত হাতে কাজ শুরু করল ও, অন্ধকারে সমস্যা হচ্ছে না-হাতড়ে কাজ সারছে । চামড়া ছাড়িয়ে যতটা সম্ভব মাংস কেটে চামড়ায় মুড়ে ঘাড়ের উপর চাপাল, হাতে তীর-ধনুক নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ।

মিনিট কয়েক দ্রুত এগোল ও, সচেতন যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে । উত্তেজনা আর টানা চলার মধ্যে থাকায় হাঁপাচ্ছে । দূর থেকে অ্যারোয়োটা চোখে পড়তে থামল ও । মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিল, কান পেতে শুনল আশপাশের শব্দ । অ্যারোয়োয় উঠে এসেছিল এক ইন্ডিয়ান, মনে পড়ল ওর, লোকটা হয়তো রয়ে গেছে এখনও । পিঠের ভারী বোঝা স্থান বদল করল ও, ডান কাঁধ থেকে বাম কাঁধে সরিয়ে নিল, বাম হাতে রয়েছে তীর-ধনুক । ছুরি বেঁধে করে ডান হাতে নিল ও, তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ওঅশের মাটিতে পা রাখল । প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে ।

ওঅশের তলার খাটো জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর গলে ধীর গতিতে এগোল এরিক, চারপাশে সুনসান নীরবতা। মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতল; তারপর এগোল আবার। একবার গাছের একটা শাখা আটকে গেল ভেড়ার চামড়ার সঙ্গে, নিষ্কিণ্ত তীরের মত টোয়াঙ শব্দে মুক্ত হলো শাখাটা।

ঝটিতি কয়েক পা এগিয়ে নিচু হয়ে গেল এরিক, কান খাড়া করে অপেক্ষায় থাকল। হাতের বামে কিছুটা দূরে ক্ষীণ ফিসফিস শব্দ কানে এল, যেন বাকস্কিন-বাকস্কিনে কিংবা বালির সঙ্গে মোকাসিনের হালকা সংঘর্ষ হয়েছে। বিপদ হলো না দেখে দ্রুত পা চালাল ও, কয়েক কদম এগিয়ে থামল আবার।

এরিক মোটামুটি নিশ্চিত যে-পথে রক্ষিত সীমানা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। ঘাড়ের উপর থেকে মাংসের বোঝা মাটির উপর নামিয়ে রাখল ও। দীর্ঘক্ষণ বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফাঁকে চারপাশের সমস্ত শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনল। রাতের শীতলতা সত্ত্বেও ঘামছে দরদর করে। ছুরিটা বাম হাতে চালান করে দিয়ে শার্টের উপর মুছল ডান হাত। এক হাঁটু গেড়ে বসল ও, বিশ্রাম নিচ্ছে।

*

ঘণ্টা খানেক আগে, পাহাড়ী চাতাল থেকে নেমে আগুনের কাছে চলে এসেছে বেন ডেভিস। এ-মুহূর্তে মিচেল রয়েছে পাহারায়, আশপাশে আর কেউ নেই। আগুন-গরম কফি পান করার ফাঁকে যার যার বেডরোলে বিশ্রামরত সঙ্গীদের দেখল সে। এই গ্যাড়াকল থেকে কেউ যদি জীবিত বেরোতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ বলতে হবে তাকে।

এই ফাঁদে নিজেকে জড়াল কীভাবে? আনমনে ভাবছে বেন ডেভিস। থামাই উচিত হয়নি ওদের, বরং ছোট্টার মধ্যে থাকা উচিত ছিল। তা হলে বহু আগেই ইয়োমায় পৌঁছে যেত, ওখান থেকে সান ফ্রান্সিসকো বা বাটারফিল্ডের স্টেজে চড়তে পারত।

সান ফ্রান্সিসকো! আলো ঝলমলে শহরটাকে দূর অস্ত মনে হচ্ছে এখন। সত্যিকার জীবন তো ওখানেই, আর এটা হচ্ছে নরক। বুড়ো জিম রিওস ঠিকই সন্ধি করতে বাধ্য হত। মেলানি ছাড়া আর কেউ নেই তার, মেয়ের জন্যই তো এতকিছু গড়েছে। এখন যা করা উচিত, যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে। মেলানিকে জাগিয়ে দুটো ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে ছুটতে হবে।

চিন্তাটা হঠাৎ করেই এসেছে, বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করল ডেভিস, কিন্তু মাথায় রয়ে গেল ঠিকই। অসুবিধে কী? সফল হওয়ার জন্য এটাই মোক্ষম সময়। বড়জোর দুই কি তিনজন অ্যাপাচি পাহারায় রয়েছে, সম্ভবত ধরেই নিয়েছে যে পালানোর সাহস করবে না সাদারা।

কিন্তু ঘোড়া বের করবে কীভাবে?

সমস্যাটা নিয়ে ভাবল সে। কয়েকটা আইডিয়াই এল মাথায়, কিন্তু একটা ছাড়া বাকিগুলো বাতিল করে দিল। নীচের ড্রতে নামতে হবে, তারপর ঝোপের দেয়ালে ফোকর তৈরি করতে হবে। সম্ভব। ইয়োমায় গিয়ে এদের জন্য সাহায্য পাঠাতে পারবে ওরা। সাহায্য যখন পাপাগো ওয়েল্‌সে পৌঁছবে, ততক্ষণে সান ফ্রান্সিসকোর পথে থাকবে ওরা।

গাঢ় বাদামি কফির দিকে তাকাল ডেভিস, কাপ নেড়ে ঘূর্ণন তৈরি করল পানীয়তে। মাত্র সত্তর ডলার আছে পকেটে, যথেষ্ট নয়। তবে ইয়োমায় গিয়ে যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা গেম-হলে বসতে পারে, কিছু ডলার কামাই করা কঠিন হবে না। তা ছাড়া, 'ঘোড়া দুটো বিক্রি করলেও টাকা পাওয়া যাবে।

মেলানি যেখানে শুয়েছে, সেদিকে তাকাল ডেভিস। ও কি যাবে? যাওয়া উচিত, কীসের আশায় থাকবে এখানে? নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে সবার জন্য। তারচেয়ে দুটো ঘোড়া নিয়ে ইয়োমায় যাওয়া কম ঝুঁকিপূর্ণ। সঙ্গে যদি আরও একজন লোক থাকে...জেফ কেলারের চিন্তা এল মাথায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল সে। উঁহু, কেলারকে নেওয়া যাবে না। ব্যাটা খুব বেশি বিপজ্জনক।

বুটের ব্যাপারটা ভিন্ন...কিংবা ডাফিকেও নেওয়া যাবে না। এরিক ক্রেবেটের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে ডাফি, নাও যেতে পারে সে।

ক্রেবেট...কোন চুলোয় আছে হারামজাদা?

আচমকা উঠে দাঁড়াল বেন। ক্রেবেট নিশ্চই চলে গেছে। গত কয়েক ঘণ্টায় দেখেনি তাকে। দ্রুত একে একে সবার কাঁছে গেল ও; নিশ্চিত হলো। উঁহু, ক্রেবেট ছাড়া সবাই আছে।

সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছে ব্যাটা। চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল বেনের। ওদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রেখে চলে গেছে ক্রেবেট! কী ধরনের মানুষ সে?

নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের হালকা শব্দ শুনে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল বেন, সার্জেন্ট হ্যালিগানকে দেখতে পেল সামনে।

‘ক্রেবেট কেটে পড়েছে, সার্জেন্ট,’ দ্রুত বলল ও। ‘দারুণ দেখিয়েছে, তাই না? একেবারে সময়মত!’

ঝট করে মাথা উঁচু করল সার্জেন্ট। ‘বিশ্বাস করি না!’

‘করো আর নাই করো, খুঁজে পাবে না ওকে। থাকলে তো পাবে। সন্দেহ থাকলে তুমি নিজেই খুঁজে দেখো।’

‘কী যা-তা বলছ! ও কেন...’

খরখরে স্বরে হাসল বেন, হাসিতে সামান্য আমোদও নেই। ‘ঠিকই করেছে ও, আসলে আমাদেরও কেটে পড়া উচিত। বেকুব না হলে এখানে কে পড়ে থাকবে? ইয়োমায় পৌঁছতে পারব আমরা, যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমার তো মনে হয় ক্রেবেট যা বলেছে, অত ইন্ডিয়ান নেই এখানে। মনে সাহস নিয়ে, ভড়কে না গিয়ে যদি ঘোড়া ছোটাই...’

ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত চাহনিতে ওকে নিরীখ করল সার্জেন্ট। ‘মিস্টার, একটা কথা বেমালুম ভুলে গেছ। আমরা লোক চোদ্দজন, কিন্তু ঘোড়া আছে মোটে আটটা।’

কিছু বলতে গিয়েও নিবৃত্ত হলো বেন ডেভিস। ধীরে ধীরে, সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। চোদ্দজন মানুষ এবং আটটা ঘোড়া। ‘ওই আটটার একটা আমার নিজস্ব ঘোড়া,’ শেষে বলল ও।

ছোট নড করল সার্জেন্ট। 'তা হলে তো হলোই,' বলে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, হেঁটে চলে গেল নিজের বেডরোর দিকে।

দশ

ঘুরে দাঁড়াতে ঠিক পিছনে টিমথি ব্লটকে দেখতে পেল বেন ডেভিস। আনুমানিক ত্রিশ হবে ব্লটের বয়স, রোদপোড়া চেহারা। 'এরকম বেকুবি জীবনে আর করেছি কি-না সন্দেহ,' তীব্র অসন্তোষ ঝড়ে পড়ল ব্লটের কণ্ঠে। 'ইচ্ছে না থাকলেও থাকতে হচ্ছে! কিন্তু কেন থাকব? চাইলে অন্যরা থাকতে পারে, আমি থাকছি না! ঘোড়া পেলে ঠিকই নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারব। অন্যরা থাকুক বা না-থাকুক, আমরা চলে যাব।'

'চাইলেও যেতে পারব না আমরা,' মুখে বললেও গলায় জোর থাকল না, বেনের নিজের কানেই শ্রান শোনাল সুরটা। ব্লটের প্রস্তাবের সঙ্গে ওর ভাবনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। মরার ইচ্ছে নেই ওর, কিংবা এখানে থেকে উত্তাপে সিদ্ধ হওয়ার ইচ্ছেও নেই। ক্ষৌরিহীন মুখে, এক কাপড়ে কতদিন থাকা যায়? ভদ্রলোকের জীবন নয় এটা। মেলানিকে নিয়ে চলে যেতে হবে...যত দ্রুত সম্ভব।

ব্লট লোকটার সাহায্য কাজে আসবে। কেলারের মত অতটা বিপজ্জনক নয় সে, সাধারণত অন্যের অনুসারী হয় এসব লোক, নিজ থেকে কিছু করার দুঃসাহস করে না। 'উঁহু,' মৃদু স্বরে বলল বেন ডেভিস। 'ঠিক হবে না কাজটা।'

'মত বীর হওয়ার চেয়ে বরং জীবিত কাপুরুষ হতে রাজি আছি
নরকে

আমি,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল ব্লট।

কাপুরুষ। শব্দটা বজ্রাহতের মত বিমূঢ় ও আড়ষ্ট করে তুলল বেনকে। সঙ্গে সঙ্গে অজুহাত দাঁড় করিয়ে ফেলল সে। উঁহু, ওকে কাপুরুষ বলতে পারবে না কেউ, কারণ প্রথম থেকে এখানে থাকার ইচ্ছে ছিল না ওর, বরং চলার মধ্যে থাকতে চেয়েছিল। তবে পরিস্থিতি বদলে গেছে এখন, এখানে থাকলে যতটা বিপদ পালাতে গেলে তারচেয়ে বেশি বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু এখানে যারা আছে, তাদের সঙ্গে বন্ধন দূরে থাক, কোন আত্মিক সম্পর্কও নেই, সম্পর্ক হোক সেটাও চায় না বেন। যথেষ্ট দেখা হয়েছে, এবার চলে যাওয়ার পালা।

'ব্যাপারটা কী?' হাল ছাড়েনি ব্লট, আরও এগিয়ে এসে বেনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বিতৃষ্ণায় পিছিয়ে যাচ্ছিল বেন, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। 'কেন এখানে পড়ে আছি আমরা? কীসের আশায়, বলতে পারো? আমরা দু'একজন চলে গেলে এমন কিছু যাবে-আসবে না, বরং খাবার বা পানির ঘাটতি মিটে যাবে ওদের।'

ঘুরে দাঁড়াল বেন। 'পরে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'আগে দেখি পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়।'

আগুনের কাছ থেকে সরে এল ও। এই ক'দিনে আগুনটাই প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে সবার কাছে। আগুনের ধারে আসছে ওরা, পাহারায় বা বিশ্রাম নিতে চলে যাচ্ছে আবার, ওদের জীবন বা সত্তার চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃপ্তি ভরে কফি গিলে, যদিও নির্জলা কফি নয় ওটা-কফির সঙ্গে অর্ধেকের বেশি থাকে মেক্সিকো বীনের গুঁড়ো। প্রায়ই আগুনের পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, হাতে কাজ নেই বলে গল্প করে।

আকাশ ধূসর হয়ে এসেছে, প্রকৃতিতে ভোরের আগমনী বার্তা। পাথর বা বোল্ডার কালো দেখাচ্ছে, লাভার লালচে পাথর স্পষ্ট চোখে পড়ছে। শিগগিরই সূর্য উঠবে, সকালের শীতলতা থাকবে না; ঝলমলে দিনের আলোয় উন্মোচিত হয়ে পড়বে সব। আবারও হামলা করবে

অ্যাপাচিরা। আজকের সূর্যাস্ত ক'জনের দেখার সৌভাগ্য হবে না, কে জানে!

এখনও পাত্তাও নেই ক্রেবেটের।

ঘুম ভেঙে যেতে কম্বলের নীচে আড়মোড়া ভাঙল মেলানি, উঠে চুল বিন্যস্ত করল। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওকে দেখল বেন, এত ধকল বা উদ্বেগের পরও সতেজ এবং আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ওকে। একটু হয়তো ক্লান্ত, কিন্তু সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি।

‘ব্যাটা কেটে পড়েছে,’ জানাল বেন। ‘ক্রেবেট ভেগে গেছে।’

‘ভেগে গেছে?’ ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল মেলানি, কথাটার-তাৎপর্য যেন বুঝতে পারেনি। ‘ক্রেবেট? নাহ, কেন ভাগবে ও?’

‘বলছি তো, ব্যাটা চলে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, একটু পরেই দেখবে।’ আচমকা ভিতরে ভিতরে বুনো উল্লাস বোধ করল বেন। ‘এখানে থাকার জন্য এক পায়ে খাড়া ছিল ও, বলছিল জবর লড়াই করবে। কিন্তু নিজের চামড়া বাঁচাতে সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছে, একটা শব্দও খরচ করার প্রয়োজন রোধ করেনি।’

‘বিশ্বাস করি না আমি!’ উঠে দাঁড়াল মেলানি। ‘এ-ধরনের কাজ করবে না ও। এরিক মোটেই কাপুরুষ নয়।’

কাপুরুষ ৭ শব্দটা আবার গুনতে হলো। প্রায় বিদ্বেষ নিয়ে মেলানির দিকে তাকাল বেন ডেভিস। ‘হয়তো বোধোদয় হয়েছিল ওর, কিংবা আমাদের চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান ও। আমাদেরও তাই করা উচিত।’

‘না, পালায়নি ও,’ আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল মেলানি, অদ্ভুত হলেও অনুভব করল কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ও, এবং এটাই সত্যি। ‘আমাদের ছেড়ে যাবে না এরিক, ওর মত মানুষের ধাত নয় এটা।’

বেডরোল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিগ জুলিয়া, কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল চারপাশে। শরীরটা বিশাল হলেও বেশ স্বতঃস্ফূর্ত ওর চলাফেরা। চুল পরিপাটি বা বেশভূষা ঠিক করার ঝামেলায় গেল না সে। সতর্ক চাহনিত মেলানি আর বেন ডেভিসকে দেখল, তারপর দৃষ্টি সরে গেল পাথর এবং বোল্ডারসারির দিকে।

অন্যরা ক্যাম্পে আসছে। চুল ঝেড়ে আঁচড়াল মিমি রজার্স, টেনেটুনে ঠিক করল পরনের পোশাক।

‘ক্রেবেট চলে গেছে,’ আবার বলল বেন।

নিতান্ত বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকে দেখল মিমি, তারপর হেঁটে চলে গেল ওদের কাছ থেকে।

কাহিল চেহারার কফিপটটা তুলে নিল এড মিচেল। ‘হ্যাঁ, চলে গেছিল, সেন্টা সত্যি, এখন ফিরে আসছে ও।’

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল সবাই। অন্যদের আগ্রহ বা উৎকণ্ঠা টের পেতে অসুবিধা হচ্ছে না মিচেলের। ‘অপেক্ষা করো, বেশিক্ষণ লাগবে না, দেখবে সবার জন্য ভেড়ার মাংস নিয়ে ফিরে আসছে ক্রেবেট। ওই মাংসে কয়েকদিন চলে যাবে...যদি একটু হিসাব করে খাই।’

‘ভীড়ের কিনারায় নড়াচড়া দেখা গেল। আলাদা হয়ে গেল ওরা।

রক্তাক্তই বলা যায় এরিকের শরীর। অ্যাপাচিটার রক্ত লেগেছে কাঁধে, ছুরির ঘায়ে কেটে গেছে গলা, ক্ষতটা গভীর নয়, সরু একটা রেখার মত দৃশ্যমান। জখমটা আদৌ টের পায়নি এরিক, কিংবা বলতেও পারবে না ঠিক কখন তৈরি হয়েছে।

মাংস ভরা ভেড়ার চামড়া মাটির উপর ফেলল এরিক। ‘দেখতেই পাচ্ছ, আসলে চলে যাইনি। কেউই যাবে না এখান থেকে। বাঁচার একটাই উপায় আছে আমাদের—এখানে গাঁট হয়ে বসে থাকতে হবে।’

‘হয়তো,’ আচমকা বিস্ফোরিত হলো বেন। ‘তোমার বদলে আমাদেরই চলে যাওয়া উচিত।’

মুখে বিদ্রূপের হাসি, নির্লিপ্ত চাহনিত্তে তাকে দেখল এরিক। ‘বেশ, যেতে চাইছ যখন, আটকাব না আমি। কাউকেই আটকাব না। যখন ইচ্ছে যেতে পারো, কিন্তু একটা কথা সাফ বলে দিচ্ছি, কেউ কোন ঘোড়া পাবে না।’

ঘুরে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল বেন, এরিকের কথাটা শুনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। ‘তারমানে পায়ে হেঁটে যেতে হবে?’ রাগে জ্বলছে

ওর চোখজোড়া, এক পা এগিয়ে গেল এরিকের দিকে। 'নিকুচি করি তোমার! কেন হাঁটব? যে-ঘোড়াটায় চড়ে এসেছি, ওটায় চড়েই ফিরে যাব আমি।'

'যেতে পারবে হয়তো,' ঠাণ্ডা সুরে তাকে বলল এরিক। 'কিন্তু ইয়োমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। সেক্ষেত্রে এখানেই থাকবে ওটা। আবারও বলছি, ঘোড়াগুলো এখন আমাদের সবার সম্পত্তি; কারও একার নয়।'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল বেন ডেভিস, দেহের দু'পাশে চলে গেছে হাত দুটো, পিস্তল ছুঁইছুঁই করছে। ব্যাটা জানে না পিস্তলে কতটা ফাস্ট আমি, সরোষে ভাবছে সে, ক্ষিপ্ততায় সম্ভবত সেরাদের একজন। অনায়াসে খুন করতে পারবে এরিক ক্রেবেটকে। এটাই মোক্ষম সময়। কর্তব্য বুলিয়ে রাখা ঠিক না।

'আমার ঘোড়াটা কেড়ে নেবে নাকি?' উস্কানির সুরে জানতে চাইল বেন।

'আমারটা সহ, সব ঘোড়া এখন যৌথ সম্পত্তি,' এরিকের শান্ত জবাব। 'এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত বলে কারও কিছু থাকবে না-ঘোড়া, খাবার বা ক্যান্টিন-কথাটা পুরুষ এবং মহিলা, সবার জন্য প্রযোজ্য। ঘোড়া যেহেতু কম, যথাসাধ্য ব্যবহার করব আমরা। একটু শক্তিশালী, যারা, তারা হাঁটবে আর দুর্বলরা রাইড করবে; তা ছাড়া, পানি বহন করার জন্য একটা ঘোড়া বরাদ্দ থাকবে সর্বক্ষণ।'

'তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না,' প্রতিবাদ করল মার্ক ডুগান।

'দুঃখিত,' জবাবে বলল এরিক। 'কিন্তু পরিস্থিতির খাতিরে এটাই করণীয় এখন।' ইশারায় মাংস দেখিয়ে প্রসঙ্গ বদলাল ও। 'মাংসটা বরং রান্না করে ফেলাই ভাল, নইলে এই গরমে পচে যাবে।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল এরিক। ক্লান্ত, পর্যুদস্ত বোধ করছে। ছায়া আছে এমন একটা জায়গায় এসে ধপ করে বসে পড়ল। কোনরকমে

বুট জোড়া খুলল পা থেকে, তারপর চিৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

‘কলজে আছে ব্যাটার!’ সমীহের সুরে বিড়বিড় করল রুট।

উত্তর দিল না বেন, ‘অক্ষম রাগে ফুঁসছে ভিতরে ভিতরে। পালানো ছাড়া উপায় নেই, একরকম নিশ্চিত ও, এখনই যদি যাত্রা না করে, তা হলে সময়মত ইয়োমায় পৌঁছতে পারবে না। পায়ে হাঁটবে যারা এবং অন্য মহিলাদের বাদ দিলে, যারা ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পাবে না, অন্যরা ঠিকই পৌঁছতে সক্ষম হবে। বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো।

এই মৃত্যুফাঁদ থেকে মুক্তির পথ একটাই—এখানে বসে না থেকে বরং বেরিয়ে যেতে হবে। কোনরকমে একবার বেরোতে পারলেই হলো, তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। যাওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে টিমথি রুট। সেক্ষেত্রে, সেভাবেই পরিকল্পনা করতে হবে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল বেন ডেভিস। ক্রেবেট যদি আপত্তি করে, প্রয়োজনে তার লাশ ফেলে দেবে। গত কয়েকদিনে ব্যাটার ‘যথেষ্ট হিম্মতস্বি সহ্য করেছে, হঠাৎ উপলব্ধি করল বেন, আর নয়।

তবে সবার আগে মেলানির সঙ্গে কথা বলতে হবে। বেন একরকম নিশ্চিত প্রস্তাবটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে ও। ধনীর দুলালী, এখানে পড়ে থেকে জান খোয়াবে কেন?

*

ধড়মড় করে ঘুম থেকে জাগল এরিক ক্রেবেট। ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ, মুহূর্ত কয়েক বিহ্বল বোধ করল ও, বুঝতে পারছে না ঠিক কোথায় আছে। একটা পাথরের কিনারার সঙ্গে কম্বল ঝুলিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করা হয়েছে, একইসঙ্গে ছায়া বিতরণ এবং বায়ু প্রবাহের দায়িত্ব পালন করছে ওটা। উঠে বসে কান পাতল ও...আগুনে কাঠ পোড়ার মৃদু শব্দ, দূরে নিচু স্বরে কথা বলছে কেউ—স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না—আর...কাছাকাছি নড়াচড়া করছে কেউ।

পিস্তল দুটো পরখ করল ও। ঘুম থেকে উঠে বরাবর দুটো কাজ

করে-চারপাশের শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করে কী ঘটছে এবং অঙ্গ পরখ করে। সহজাত প্রবৃত্তিতে রূপ নিয়েছে অভ্যাসটা। পায়ে বুট গলিয়ে কম্বলের পিছনে ওর আশ্রয়স্থল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল এরিক।

দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়েছে। ঝরঝরে লাগছে শরীরটা।

আঙনের কাছে রয়েছে মেলানি। ‘অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ,’ বলল মেয়েটি। ‘দুপুর এখন।’

‘কোন কিছু ঘটেছে?’

‘মারা গেছে হার্শ।’

‘এই ভাল হয়েছে। অনেক কষ্ট পেয়েছে বেচারি, বেঁচে থাকলে আরও পেত।’

‘গতরাতে বেরিয়েছিলে কেন? ইন্ডিয়ানদের হাতে মারা পড়তে পারতে।’

‘মাংস দরকার ছিল।’

‘কী ঘটেছিল ওখানে?’

‘ভাগ্য ফুরিয়ে যাওয়া এক অ্যাপাচির সঙ্গে দেখা হলো।’

পাথরসারির কাছে চলে গেছে বিগ জুলিয়া, রাতে ওখানেই ঘুমিয়েছে; ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ব্যাগ দুটো। সর্বক্ষণই হাতের নাগালের মধ্যে রাখছে শটগানটা। কফি খাওয়ার ফাঁকে মহিলাকে নিরীখ করল এরিক, স্পষ্ট বুঝতে পারল ঝামেলা আশা করছে জুলিয়া এবং যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি।

ড্যান কোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সাহস আছে ছেলেটার, সহজে ভড়কে যাওয়ার নয়, বরং যথেষ্ট দৃঢ়চেতা। নির্ভরযোগ্য। চরম বিপদে ভরসা রাখা যাবে ড্যানের উপর। সার্জেন্টের উপরও বোধহয় ভরসা করা যায়। আর কেউ? মিমি রজার্স। হয়তো মিচেল এবং চিডলও ওর পক্ষে থাকবে। ডাফি একটু ভিন্ন ধাতের হলেও নিরেট চরিত্রের মানুষ। মেলানি রিওস...

আঙনের পাশে বসে মাংস চিবুচ্ছিল টনি। পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল সে, এরিকের রক্তাক্ত শার্টের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। নির্বিকার মুখ, কিছুই বলল না বা জানতে চাইল না। রক্তাক্ত শার্ট দেখেই বুঝে নিয়েছে, স্পষ্ট বা অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে না ইন্ডিয়ানরা। টনি বুঝতে পারছে রাতে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কোন অ্যাপাটির সামনে পড়ে গিয়েছিল এরিক, বহাল তবীয়তে ফিরে আসা এবং শার্টের রক্ত এরিকের নয়, লড়াইয়ের ফলাফল জানতে এই যথেষ্ট।

‘ঘোড়ার কাছে কে আছে?’ জানতে চাইল এরিক।

‘ডেভিস,’ জবাব দিল টনি।

ব্যাপারটা ভেবে দেখল এরিক, কিন্তু বিপজ্জনক কিছু খুঁজে পেল না। এটা সত্যি যে বেশিরভাগ সময়ে পাথুরে চাতালে কিংবা অ্যারোয়োর কিনারে ঝোপে অবস্থান নেয় ডেভিস, তবে কারও জন্য নির্দিষ্ট কোন পজিশন নেই। পছন্দসই জায়গায় থাকতে পারে যেকোনো কেউ।

‘ও কি একাই আছে?’

‘এক সৈন্য আছে ওর সঙ্গে।’

ছায়ায় বসে মিমি রজার্সের সঙ্গে গল্প করছে ড্যান কোয়ান। শার্ট গায়ে নেই তার, কোমর পর্যন্ত নগ্ন; শার্টটা সেলাই করে দিচ্ছে মিমি। অ্যারোয়োতে ঘোড়াগুলোর কাছাকাছি টম হার্শের জন্য কবর খুঁড়ছে মিচেল আর কেলার। অধৈর্য ভঙ্গিতে পায়চারি করছে টিমথি ব্লট, নিজের ভাবনা নিয়ে আনমনা হয়ে আছে বেন ডেভিস।

উইনচেস্টার তুলে নিয়ে কার্তুজ পরখ করল এরিক, তারপর পাহাড়ী চাতালে উঠে এল, মাঝপথে থেমে কূপের পানির উচ্চতা দেখে নিল। প্রথম যখন এসেছিল, সে-তুলনায় পানি বেশ নেমে গেছে; তবে এখনও যা আছে, যথেষ্ট...যদি না অনেক দিনের জন্য আটকা পড়ে ওরা।

পাহাড়ী চাতালে পাহারায় রয়েছে মার্ক ডুগান। ‘কিছু দেখিনি,’

বিরক্ত স্বরে বলল সে। ‘কিছু নেই। এমন কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি।’

মরুভূমিতে তাপতরঙ্গ নাচছে। উপরে, পেতলরঙা আকাশে অলস চক্কর কাটছে শকুনেরা। কোথাও কিছু নড়ছে না। একটা পাথরের উপর বসে মুখমণ্ডল থেকে ঘাম মুছল এরিক। পরনের কাপড়ে ঘাম আর ধুলোর কটু গন্ধ। বালিতে বা পাথরে প্রতিফলিত সূর্যের আলোর ঔজ্জ্বল্যের বিপরীতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে চোখ, জ্বালা করছে। হাঁটুর উপর উইনচেস্টারটা রেখে নিচু স্বরে খিস্তি করল ও।

‘কী জানো, নিজের মনটাকে আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না, ম্লান সুরে বলল টেরিল ডাফি। ‘কেন যে পশ্চিমে এসেছি, ভাবলে নিজেও মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে যাই। কেন্টাকিতে বড়সড় একটা খামার আছে আমাদের, সুন্দর জায়গা...প্রতি শনিবার রাতে পার্টি বা নাচের আসর বসত ওখানে। বহু মাইল দূর থেকে আসত লোকজন। আর এখন দেখো, মরুভূমিতে আটকা পড়েছি, চাঁদির চুল হারানোর সমূহ সম্ভাবনা। এত বিপদ, প্রতিকূলতা বা অনিশ্চয়তা থাকার পরও কেন পশ্চিমে আসে মানুষ?’

তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করছে এরিক। ঘাম এসে পড়ায় জ্বালা করে উঠল চেখ। ‘আমার কথা বলতে পারি, খারাপ লাগছে না এখানে। তুমিও যদি থাকো কিছুদিন, নেশা ধরে যাবে।’

‘উঁহু, আমার হবে না। এই গ্যাডাকল থেকে যদি বেরিয়ে যেতে পারি, চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কেন্টাকি চলে যাব। খামারে গিয়ে ফসল ফলাব। গ্র্যাস ভ্যালিতে চেনা এক লোক আছে আমার...নামটা সুন্দর না, শুনেছ নাকি? গ্র্যাস ভ্যালি। ভাবলেই শান্ত, ছায়াময় সবুজ এক উপত্যকা আর ঝর্নার ছবি ফুটে ওঠে মনে। আমাদের খামারটা গ্র্যাস ভ্যালির মত সুন্দর নয়, তবে ফিরে গিয়ে ওরকমই বানানোর চেষ্টা করব।’

কাগজের আঠায় জিভ ছুঁয়েছে, তখনই নড়াচড়া চোখে পড়ল

এরিকের। সিগারেট ফেলে ঝাটিতি উইনচেস্টার তুলে নিল হাতে। আচমকা ক্ষীণ নড়াচড়া এবং টেরিল ডাফির দেহের অকস্মাৎ ঝাঁকি-কেবল এই দেখেছে ও। এরিকের দিকে আধ-পাক ঘুরে গেল তরুণ সৈনিকের শরীর, যেন কিছু বলবে, তারপর মন্ত্র গতিতে মুখ খুবড়ে পড়ল, কয়েক গড়ান খেয়ে পাথুরে একটা চাতালে গিয়ে স্থির হলো। এর অনেক আগেই গুলি করেছে এরিক, এমনকী ডাফি ভূপতিত হওয়ার আগেই।

মাটিতে ধুলো চটকাল ওর গুলি, দেখতে পেল এরিক। পরপর দুটো গুলি করল, একটা ঝোপ বরাবর, অন্যটা এক পাথরে-রিকোশেটের গুলি গুপ্ত জায়গায় লক্ষ্যে আঘাত আনবে, এই আশায়।

মুহূর্তের মধ্যে সচকিত ও সতর্ক হয়ে উঠেছে সবাই। ছুটে পাথুরে চাতালে চলে গেছে মিচেল, বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়েছে যেন, এমনভাবে তুলে নিল টেরিল ডাফির দেহ। কিন্তু পশ্চম। অনেক আগেই মারা গেছে টেরিল ডাফি। কেন্টাকিতে গিয়ে খামার করার স্বপ্ন তার অপূর্ণই থেকে গেছে।

দু'জন মারা গেছে। হার্শ এবং ডাফি। আরও ক'জনকে এই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে?

মরুভূমিতে ভূতুড়ে নীরবতা।

হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল কেলার, একটা ঝোপের ফাঁকে উঁকি দিল। ঝোপের ডাল সরাতে যখন হাত বাড়াল সে, এরিক খেয়াল করল হাতটা মৃদু মৃদু কাঁপছে।

টেরিল ডাফির মৃত্যু বিমূঢ় ও শঙ্কিত করে তুলেছে অন্যদের। একটু আগেই বেঁচে ছিল সে-সুদর্শন হাসিখুশি সদ্য যুবক, অথচ আচমকা ঘটে গেল ব্যাপারটা-এক টুকরো সীসা কত অবলীলায় জীবন কেড়ে নিতে পারে!

একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে। ওদের চারপাশে শত্রু কর্ডন তৈরি করেছে অ্যাপাচিরা, অপেক্ষায় আছে, সর্বক্ষণ নজর রাখছে ওদের উপর।

নিরীহ দর্শন বিস্তীর্ণ মরুভূমি বিদেহ, প্রতিহিংসা আর খুনোখুনির ময়দান হয়ে উঠেছে হঠাৎ; এখাকার অটুট নীরবতা আসলে অমঙ্গলের বার্তা, প্রচণ্ড উত্তাপ হচ্ছে নিরন্তর হুমকি। কূপের পানির উচ্চতা নেমে যাচ্ছে, পর্যাপ্ত খাবার নেই, আশপাশে যা ঘাস ছিল, প্রায় শেষের পথে। একেবারে মূল পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলো, এমনকী মেক্সিকট ঝোপ বা বীনও বাদ পড়েনি।

গম্ভীর, আড়ষ্ট এবং শঙ্কিত হয়ে গেছে মানুষগুলোর মুখ। যার যার জায়গায় অপেক্ষায় রয়েছে ওরা, তাপদগ্ন মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে, আশা করছে কোন টার্গেট দেখতে পাবে, আদপে যা চোখে পড়ছে না।

এমনকী সার্জেন্ট হ্যালিগানও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ক্লান্ত, বয়স্ক এবং পরাজিত দেখাচ্ছে তাকে, চওড়া কাঁধ নুয়ে পড়েছে কিছুটা। 'একে একে সবাইকে শেষ করবে ওরা, ক্রেবেট,' তীব্র খিস্তি আউড়ে বলল হ্যালিগান। 'এই ঠেলায় মামলা খতম!'

এগারো

তীক্ষ্ণ চোখে শূন্য মরুভূমি নিরীখ করল এরিক ক্রেবেট। কোথাও সামান্য শব্দ বা নড়াচড়াও নেই। সূর্য এতটাই তাপ ছুঁড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে পুরো আকাশই সূর্য; কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। মেক্সিকটের জীর্ণ শাখাগুলো ঝুলে আছে নিষ্প্রাণ ও স্থবির কঙ্কালের মত, এমনকী চক্কররত শকুনগুলোও যেন পেতলরঙা আকাশে নিশ্চল হয়ে গেছে।

পাথর এতটা গরম হয়ে উঠেছে যে ছুঁলেই ফোঁসকা পড়ে যাবে,

অমঙ্গল লাভার চাঙড় বা বোল্ডার দেখে মনে হচ্ছে বিশালকায় চুল্লী, জ্বলন্ত কয়লার মত উজ্জ্বল। তাপতরঙ্গ ধোঁয়াটে পর্দা তৈরি করেছে। শার্টের আরও একটা বোতাম খুলে দিল এরিক, ব্যাভানা দিয়ে কপাল আর মুখ মুছল। ঘর্মাক্ত হাত থেকে অন্য হাতে রাইফেল স্থানান্তর করল, গুলি করতে পারবে এমন টার্গেটের খোঁজে মরুভূমি তন্নতন্ন করে দেখছে।

ক্রল করে পাথুরে চাতালে উঠে এল ড্যান কোয়ান, এরিকের পাশে বসে ক্যান্টিন থেকে বড়সড় চুমুক দিল, তারপর বাড়িয়ে দিল এরিকের দিকে। গরম পানি বিশ্বাস লাগল মুখে।

‘অসহ্য লাগছিল ওখানে,’ নীচের অ্যারোয়োর দিকে ইশারা করল ড্যান, ঘোড়াগুলো রয়েছে ওখানে। ‘উনুনের মত উত্তপ্ত হয়ে আছে।’

‘উপর থেকে ঘোড়াগুলোকে কাভার করতে পারব। সবাইকে এখানে চলে আসতে বলো।’

পাথরের ফোকর গলে চলে গেল ড্যান, নীচে নেমে উঠে দাঁড়াল, ধীর-পায়ে এগোল ক্যাম্পের দিকে। সঙ্কীর্ণ চাতালের মত একটা জায়গা পেরিয়ে গেল, ওখানেই থাকে মেয়েরা। আগুন জ্বালানোর ঝামেলায় যায়নি কেউ, কফির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না। খাবারের ঘাটতি থাকলেও কেউই বোধহয় ক্ষুধা অনুভব করছে না, পরিস্থিতির ভয়ঙ্করত্ব আর টেরিল ডাফির করুণ মৃত্যু অনীহা তৈরি করেছে মনে।

উপর থেকে অন্যদের উঠে আসতে দেখতে পেল এরিক। ঘোড়ার উপর নজর রাখতে যে নীচেই থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই, সেটা এখান থেকেও সম্ভব। তবে করালটা রক্ষা করা যাবে কি-না, এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহান ও। ওর অবচেতন মন বলছে প্রথম সুযোগে করাল ভেঙে ফেলবে অ্যাপাচিরা-ঘোড়াগুলো দখল করার চেষ্টা করবে। দুটো কারণে ঘোড়া দরকার ওদের-রাইড করবে, কিংবা চাইলে খেতেও পারবে।

তবে করালটা অরক্ষিত হয়ে পড়লেও, একসঙ্গে থাকায় ওদের তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যুহ আরও দৃঢ় এবং সুসংহত হবে। অ্যারোয়োর চেয়ে

বরং পাথুরে চাতাল অপেক্ষাকৃত নিরাপদও।

দৃষ্টিসীমায় কোন নড়াচড়া নেই। ধারে-কাছে অবস্থান নিয়েছে সবাই। অন্যদের আলাপ কানে আসছে। পাথরের ফাঁকে, নিজের জায়গায় নীরবে বসে থাকল এরিক, যে-কোন কিছুর জন্য তৈরি।

দৃশ্যত, করালটা তৈরি করতে দেখেছে অ্যাপাচিরা, কারণ এ-পর্যন্ত ঘোড়াগুলোকে স্ট্যাম্পিড করার চেষ্টা করেনি তারা, কিংবা কোন ঘোড়াকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেনি। তারমানে, ওরা ধরে নিয়েছে আগে-পরে যখনই হোক ঠিকই ঘোড়াগুলোর মালিক হতে পারবে।

কিছুই নড়ছে না। ওঁঅটরহোলের কাছে তিজ্ঞ স্বরে খিস্তি করল কেউ।

এরিকের কাছাকাছি ভনভন করছে একটা মাছি, মুখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল একবার। নেহাত বিরক্তির সঙ্গে হাত ঝেড়ে ওটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল, পরমুহূর্তে সামনের বোল্ডারে পাথরকুচি ছোটাল একটা বুলেট, থ্যানিটের টুকরো এসে আঘাত করল মুখে। গুলির শব্দটা শোনা গেল বেশ পরে।

মাথা নিচু করল ও, দুই বোল্ডারের ফাঁকে মাথা গুঁজে উঁকি দিল সামনে। একটা টার্গেট খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। একটু নীচে কেলারকে দেখতে পেল, জুলিয়ার পাশে বসে ফিসফিস করে বলছে কী যেন। মুখ নিচু মহিলার, তাই কেলারের কথাগুলোর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না। অন্যদের থেকে একটু দূরে আছে দু'জন, ইচ্ছে করেই সরে গেছে কি-না কে জানে!

ভয়ানক গরম পড়ছে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

থ্যানিটের ছায়া পড়েছে, এমন একটা জায়গা পেয়ে গুয়ে পড়ল সার্জেন্ট হ্যালিগান, রাতের পাহারার আগে খানিকটা সময় বিশ্রাম নিতে ইচ্ছুক। পাশাপাশি দুটো পাথরের কাছে অবস্থান নিয়েছে ডেভিস আর ব্লট, মরুভূমিতে চোখ রাখার ফুরসতে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে ভাবছে এরিক। একটা উপায় আছে নিশ্চই! সব সমস্যারই সমাধান থাকে, আসল কাজ হচ্ছে

ওটা খুঁজে পাওয়া। এ-গ্যাডাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও আছে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এরিক। চোখ কুঁচকে মরুভূমিতে যত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই রাখুক না কেন, কিংবা মরিয়া হয়ে যতই ভাবুক, কোন উপায় খুঁজে পেল না।

এতদিনে নিশ্চই টনক নড়েছে সেনাবাহিনীর, সন্দেহ করেছে হারিয়ে গেছে অথবা বিপদে পড়েছে পেট্রল বাহিনী; এটাও জেনে থাকবে যে একই পরিণতি ঘটেছে পাসিবাহিনীর। দুটো সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর একই সময়ে একই জায়গায় উধাও হয়ে যাওয়ার তাৎপর্য যে সেখানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে, না বোঝার মত বোকা এমনকী সাধারণ মানুষও নয়। তা ছাড়া, এই সময়ে মরুভূমিতে সাধারণ অভিযাত্রীদের যাতায়াত কমে যাওয়াও ইন্ডিয়ান হামলার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইতোমধ্যে হয়তো দুটো বাহিনীর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে, সার্চ পার্টি গঠন করে তল্লাশি করার তোড়জোড় শুরু হওয়াও বিচিত্র নয়।

মেয়ের খোঁজে টুকসনে গিয়েছিল জিম রিওস, এতদিনে হয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছে সে, কিংবা আরও পশ্চিমে চলে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও রিওসের মত মানুষ সম্পর্কে জানে এরিক, প্রভাবশালী এই ব্যাঙ্কার যদি আঁচ করতে পারে যে বিপদে পড়েছে তার মেয়ে, তৎক্ষণাৎ পশ্চিমে রওনা দেবে সে। পাপাগো ওয়েল্‌সে আসতে সময় নেবে না তারা। সেক্ষেত্রে, দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে ওদের। পাপাগো ওয়েল্‌সের দিকে আগুয়ান সার্চ পার্টিকে সতর্ক করে দিতে হবে।

স্মোক সিগন্যালের কথা ভাবল এরিক...কিন্তু যথেষ্ট জ্বালানি নেই ওদের। সিগন্যাল দিতে গেলে হয়তো সব জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে, কফি তৈরির জন্য অবশিষ্ট থাকবে না।

উনুনের মত উত্তপ্ত পাথুরে জমিতে দলবল নিয়ে পুড়ছে চুরুতি, কারণটা ব্যাখ্যাতে মনে হলেও স্বস্তি বোধ করার নয়, বরং রীতিমত আশঙ্কাজনক। শুধু অবরোধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সুযোগ পেলেই

নিপুণ নিশানায় গুলিও করছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল জেফ কেলার। 'গোল্লায় যাও তোমরা!' ধৈর্য হারিয়েছে সে। 'এখান থেকে চলে যাব আমি!'

জবাব দিল না কেউ।

উঠে দাঁড়াল ড্যান, পাথুরে ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল, এরিককে রেহাই দেবে। পায়ের কাছে বালিতে থুথু ফেলল বেন ডেভিস। অনেক আগেই গা থেকে কোট খুলে ফেলেছে, পরনের শার্ট শুধু নোংরাই নয়, ছিঁড়েও গেছে কয়েক জায়গায়। ছোট ছোট দাড়ির জঙ্গল জন্মেছে চোয়ালে, চোখে-মুখে ক্লান্তি আর অবসাদ। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বয়স্কই দেখা যাচ্ছে তাকে। নির্লিপ্ত চোখে কেলারকে দেখছে ওরা, কিন্তু কেউই কোন মন্তব্য করল না।

খোলা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী সৈনিক, তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ ঝরে পড়ছে চাহনিতে। 'আজ রাতেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমি। আমার সঙ্গে যাওয়ার সাহস কারও আছে? থাকলে, স্বাগতম!'

তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এরিক। 'আইডিয়াটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো, কেলার,' বলল ও। 'হয়তো আরেকটু দেরি হবে, কিন্তু এখান থেকে সবাই বেরিয়ে যাব আমরা। আপাতত এখানেই টাইট হয়ে বসে থাকতে হবে।'

ঝাটতি ঘুরে দাঁড়াল অবাধ্য সৈনিক। 'তোমার উপদেশ দরকার হলে চাইব আমি। সেধে দিতে বলল কে? আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাব আমি।'

'বেশ, যেতে চাইলে যাও। কিন্তু ঘোড়া নিতে পারবে না।'

'ঘোড়া নিতে পারব না?' উপহাসের দৃষ্টিতে ওকে মাপছে কেলার। 'একটা ঘোড়া যদি নিই আমি, থামাবে নাকি আমাকে?'

ঘুম টুটে গেছে সার্জেন্টের। 'কেলার!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল সে। 'চাপাবাজি বন্ধ রেখে বসে পড়ো!'

সার্জেন্টের দিকে ফিরেও তাকাল না কেলার। স্রেফ অগ্রাহ্য করল

নির্দেশটা, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে এরিকের মুখে। 'তোমাকে একটুও পছন্দ করি না আমি, ক্রেবেট। এমনকী এক মুহূর্তের জন্যও ভাল লাগেনি। সারাক্ষণ শুধু একটা কথাই বলছ: টাইট হয়ে বসে থাকতে হবে। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। এবার গা-ঝাড়া না দিলেই নয়। যা বলেছি, রাতেই চলে যাব আমি। রাইড করেই যাব, তুমি চাও আর না-চাও, এবং ভাবছি তোমার ঘোড়াটাই নেব।'

এক কদম এগিয়ে এল কেলার। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এরিক, মুখ নির্বিকার। অথও মনোযোগে ওকে দেখছে এড মিচেল। উঠে দাঁড়িয়েছে বেন, কৌতূহলী।

'ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করো, কেলার। গরম আমাদের সবাইকে পেয়ে বসেছে।' শান্ত, নিষ্কম্প সুরে বলল এরিক। 'এতক্ষণে হয়তো প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে সার্চ পার্টি। এখানে আসতে বেশি সময় লাগবে না, শিগ্গিরই বিপদ কেটে যাবে।'

'যখন খুশি যাব আমি, কে ঠেকাবে আমাকে?' তড়পে উঠল কেলার। 'ভাবছি যাওয়ার আগে একটা কাজ করব। যাদের চাপা থাকে, পিস্তল দরকার হয় না তাদের। তোমার ওই পিস্তলটা বড় বেমানান, ওটা কেড়ে নিয়ে...'

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না কেলার, তার আগেই ঘুসি চালিয়েছে এরিক। তৈরি ছিল বিশালদেহী সৈনিক, চট করে বাম হাতে ঠেকিয়ে দিল এরিকের ঘুসি। কিন্তু নিজের অজান্তে অরক্ষিত করে ফেলল চিবুক। সুযোগটা নিতে কার্পণ্য করল না এরিক, বাম হাতের পরপরই ধেয়ে গেল ওর ডান হাত, কেলারের চওড়া চোয়ালে ল্যান্ড করল। শব্দ শুনে মনে হলো যেন গাছের গুঁড়িতে আঘাত হেনেছে কুড়ালের বাঁট।

শব্দটা সবাই শুনতে পেল, এবং দেখতে পেল টলে উঠেছে জেফ কেলারের দেহ। চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্ততায় আবার ঘুসি চালান এরিক, দুটোই আঘাত হানল মুখে। দড়াম করে বালির উপর আছড়ে পড়ল বিশালদেহী সৈনিক, স্থির পড়ে থাকল দুই সেকেন্ড, হতবাক। এদিকে

পিছিয়ে গেল এরিক, কেলারকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল। হঠাৎ যেন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো কেলার, এক ঝটকায় নিজেকে খাড়া করল, রাগে কাঁপছে শরীর; বুনো আক্রোশ নিয়ে তেড়ে এল সে, বিশাল শক্তিশালী দুই বাহু ছড়িয়ে দিয়েছে, চট করে দূরত্বটা কমে গেল।

একচুলও নড়ল না এরিক, কাছে আসতে দিল প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কেলার লাফ দিতে চট করে সরে গেল এক পাশে, একইসঙ্গে বাম হাতের জবর ঘুসি চালান বিশালদেহীর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল কেলারের ঠোঁট, রক্ত গড়াতে শুরু করল। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার, সাঁড়াশি বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এরিককে; তবে তুলনায় এরিক অনেক ক্ষিপ্র, চট করে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর রোলিং হিপলকের সাহায্যে ছুঁড়ে ফেলল কেলারকে। শক্ত পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ল সে।

‘শুয়ে থাকো, কেলার,’ বিশালদেহী উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হতে নির্দেশ দিল এরিক। ‘দাঁড়িয়েছ তো পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব তোমাকে!’

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কেলার, ওভাবেই পড়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, শেষে শরীর শিথিল করে দিল। এদিকে পিছিয়ে এসে নিজেকে সুস্থির করল এরিক। ভিতরে ভিতরে দুর্বল বোধ করছে। শরীরটা বিশাল হলেও হাতাহাতি লড়াইয়ে অভিজ্ঞ নয় কেলার, নিরস্ত না হলে বাধ্য হয়ে তাকে পেটাত এরিক, কিন্তু উপভোগ্য হত না ব্যাপারটা। বরং হয়তো প্রয়োজনীয় একজন লোককে সাময়িকভাবে পস্তু করে দিতে হত। এরিক এটাও জানে জেফ কেলার নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ, সহজে নিরস্ত হতে জানে না, ওর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ আজীবন পুষে রাখবে।

কেউ কিছু বলল না। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল কেলার, স্থলিত পায়ে অ্যারোয়ার অন্য প্রান্তে চলে গেল।

‘ওকে মিটিয়ে কী প্রমাণ করলে?’ জানতে চাইল ডুগান।

প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করল এরিক। 'বাঁচতে হলে এখানেই থাকতে হবে আমাদের। এটাই একমাত্র উপায়। মরুভূমিতে খোলা জায়গায় যদি বেরিয়ে যাই, কেউ হাঁটবে কেউ ঘোড়ায় চড়বে, ওই অবস্থায় মিনিট কয়েকের বেশি টিকতে পারব না। মেয়েদের কথাও ভাবতে হবে। আর, দয়া করে আমার কথাটা বিশ্বাস করো, এখান থেকে ইয়োমা পর্যন্ত পথ দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ জায়গা।' ঘুরে মার্ক ডুগানের দিকে ফিরল ও। 'তুমিও জানো এটা।'

'এ-পথে বছবার যাতায়াত করেছি আমি,' বলল সে। 'এবারও পারব।'

'সম্ভবত কোনবারই মেয়েদের নিয়ে ভাবতে হয়নি তোমার, এবং পর্যাপ্ত পানিও ছিল সঙ্গে।'

মন্তব্যটা না-শোনার ভান করল ডুগান, উঠে দূরে সরে গেল। ব্লট আর ডেভিসের পাশে গিয়ে বসল। একটু পর বিগ জুলিয়া যোগ দিল ওদের সঙ্গে। মুহূর্ত খানেক চারজনের দলটাকে দেখল এরিক, তারপর আনমনে কাঁধ উঁচিয়ে অন্যদিকে মনোযোগ দিল।

উপর থেকে ওকে ডাকল ড্যান। 'এরিক। মনে হচ্ছে একটা কিছু নড়ছে মরুভূমিতে!'

ছুটে পাথুরে চাতালে উঠে এল এরিক, কিন্তু মরুভূমিতে কিছুই দেখতে পেল না। একই চিত্র: তাপতরঙ্গ, পাথর, বোল্ডার, ঝোপ; একই...

অ্যারোয়ের লাগোয়া পাথরের আড়াল থেকে ছুটে এল তীরটা, পাথরের সামনেই রয়েছে ঝোপ। ঘন ধোঁয়া উঠছে তীরটা থেকে, উপবৃত্তাকার পথে নেমে আসছে মাটির দিকে।

'চিডল! এড! ঘোড়ার লাগাম হাতে রাখো! আগুন লাগানো তীর ছুঁড়েছে হারামীগুলো!'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। করালের দেয়াল তৈরি করেছে, এমন একটা ঝোপের উপর পড়ল তীরটা। মুহূর্ত কয়েক নীববতার পর মৃদু পটপট শব্দে আগুন ধরে গেল ঝোপে।

সবার আগে সক্রিয় হয়েছে টনি চিডল। পড়ে যাওয়ার আগেই ছুটে আসা তীরটা দেখতে পেয়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে শুরু করল। কয়েক কদম এগিয়ে ডাইভ দিল। দু'হাতে খাবলা মেরে বালি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ঝোপে। ভাগ্য সহায়তা করল তাকে। আগুনের সরু শিখার উপর গিয়ে পড়ল বালি। ততক্ষণে দ্বিতীয় তীর চলে এসেছে, তৃতীয়টা আসতেও দেরি হলো না। দ্বিতীয়টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, ঝোপের পিছনে কোথাও বালির উপর পড়ল; কিন্তু পরেরটা ঝোপে পড়ার পরপরই আগুন ধরে গেল। মিচেল আর ডুগান চলে গেছে সেখানে, মরিয়া চেষ্টায় বালি ছুঁড়ে মারছে আগুনে।

আপাতত রক্ষা হলেও শেষপর্যন্ত করালটাকে বাঁচাতে পারবে না ওরা, দিব্যি বুঝতে পারছে এরিক। ক'টা তীর নেভাবে? একটা, দুটো...বড়জোর এক ডজন। কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাবে অ্যাপাচিরা। নিপুণ নিশানায় তীর পাঠাতে থাকবে। শুকনো ঝোপে পড়া মাত্র দপ করে জ্বলে উঠবে। করাল বলে অবশিষ্ট থাকবে না কিছু।

'সার্জেন্ট!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল ও। 'সব ঘোড়া নিয়ে উপরে চলে এসো! জলদি!' দেখল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়েছে সার্জেন্ট। ড্যান কোয়ানের দিকে ফিরল এরিক। 'আগুনের দিকে মনোযোগ দিয়ো না, ড্যান। এ-সুযোগে হয়তো হামলা করবে শয়তানগুলো!'

বেন ডেভিসেরও একই ধারণা। ছুটে উপরে উঠে এল সে, লাভার দিকে মুখ করে পজিশন নিল, হাতে রাইফেল তৈরি। উত্তরমুখো হয়ে অবস্থান নিয়েছে কেলার, হঠাৎ গর্জে উঠল তার বন্দুক, সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার আগেই সুর মেলাল ড্যানেরটা।

'যাহ্, ফস্কে গেছে!' ত্যক্ত স্বরে বলল তরুণ। 'একবার যদি ঠিকমত নিশানা করে গুলি করার সুযোগ পেতাম!'

জ্বলন্ত ঝোপের দিকে তাকাল এরিক। আরও একটা তীর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে করালের বেড়ায়, ওদের নাগালের বাইরে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো বেড়ায় আগুন ধরে গেল, লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলছে। 'পিছিয়ে এসো!' চিৎকার করে অন্যদের সতর্ক করল ও।

‘পিছিয়ে পাথরের কাছে চলে এসো!’

রুট আর মেলানির সাহায্য নিয়ে ইতোমধ্যে ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে সার্জেন্ট হ্যালিগান। পিছু নিয়ে ছুটে এল অন্যরা, সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিল। জ্বলছে করালের বেড়া, প্রচণ্ড উত্তাপ আর আগুনের ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে ওদের, কিন্তু তারপরও স্থির পড়ে থাকল সবাই—সজাগ, সতর্ক।

নীচের কূপটা বেদখল হয়ে গেছে। করাল না থাকায় কূপের চারপাশের এলাকা কাভার করতে পারবে ইন্ডিয়ানরা, সেক্ষেত্রে ওই কূপ থেকে পানি যোগাড় করার কোন সম্ভাবনাই থাকল না। কিন্তু ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য ওটাই ব্যবহার করছিল ওরা। অবশ্য এমনিতেও বেশি পানি ছিল না, হয়তো আরও একটা দিন চলত। এখন ঘোড়া আর মানুষ, সবার পানির চাহিদা মেটাতে হবে উপরের দুই কূপ থেকে।

আরও আঁটসাঁট হয়ে গেছে ওদের অবস্থান, তবে মজবুত এখনও, কিংবা আচমকা আক্রমণ করেও সহজে সুবিধা করা যাবে না। কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতিটাকে এগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে ধূর্ত অ্যাপাচিরা। জায়গার অভাব, পানি আর খাবারের ঘাটতি...

পুরো আধঘণ্টা ধরে জ্বলল করালের বেড়া, তারপর শিখা নিভে গিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলতে থাকল। উপরে, নিষ্ঠুরতার চরম দেখাচ্ছে সূর্য, পুরো আকাশই ঝলসাচ্ছে যেন। মরুভূমিতে ঝলমল করছে তাপতরঙ্গ। অসীম ধৈর্য নিয়ে এখনও চক্কর কাটছে কয়েকটা শকুন।

নীরব হয়ে আছে সবাই। খাটুনি এবং প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে ক্লান্ত বোধ করছে মিচেল আর চিডল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মার্ক ডুগানের মুখ, এই প্রথম ভাষা যোগাল না তার মুখে। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করে হতাশ হয়ে পড়েছে সবাই, পরিণতি আঁচ করতে পারছে।

বেন ডেভিসের কণ্ঠে সবার মনের ভাবনা প্রকাশ পেল। ‘এবার কী করব আমরা, ক্রেবেট? এখনও কি টাইট হয়ে বসে থাকব?’

‘হ্যাঁ।’

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এরিকের দিকে তাকাল ডুগান, কেলারের চোখে কেবলই ঘৃণা দেখা গেল। কিন্তু মিচেল বলল, ‘হারামজাদা চুরতি আমাদের সঙ্গে ইঁদুর-বেড়াল খেলছে! সে জানে যে গ্যাড়াকলে আটকা পড়েছি, চাইলেও বেরিয়ে যেতে পারব না। রয়ে-সয়ে শিকার ধরবে, এই সুযোগে আনন্দের খোরাক জুটিয়ে নিচ্ছে।’

প্রচণ্ড গরম লাগছে। পাথরের পিছনে ক্ষীণ ছায়া পড়েছে। লাভার চাঙড়ে ঠিকরে আসা রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ঝোপের কারণে যাও-বা ছায়া পাচ্ছিল, করাল পুড়ে যাওয়ায় এতটুকু ছায়া নেই কোথাও। স্থাণুর মত বসে আছে সবাই, পরিস্থিতির পরিবর্তনে বিমূঢ়, কারও মুখে কথা যোগাচ্ছে না।

কারও সাহায্য ছাড়াই কাজ শুরু করল এরিক, পাথর তুলে নিয়ে বসাতে শুরু করল ফাঁকফোকরে, একশো বর্গমিটার পরিধির এই জায়গাটাকে দুর্ভেদ্য করে তুলতে চাইছে। একটু পর ওর সঙ্গে যোগ দিল টনি চিডল আর এড মিচেল। ডেভিসের দিকে তাকাল মেলানি, আশা করছিল সেও হাত লাগাবে এরিকের সঙ্গে, কিন্তু দেখল ব্লট এবং কেলারের সঙ্গে নিচু স্বরে আলাপ করছে সে।

দু’দিন কি বড়জোর তিনদিনের মত পানি আছে ওদের, সেটাও আধাআধিতে নামিয়ে আনতে হবে। খাবার যা আছে, সব মিলিয়ে কোনরকমে তিন বেলা হবে।

কাজ শেষে পাথরের কিনারে এসে যখন বসল এরিক, ড্যান জানতে চাইল: ‘এবার কী করব আমরা?’

শ্রাগ করল এরিক। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ায় বিশাল এক বোল্ডারের ছায়া পড়েছে দুই পাথরের ফাঁকে, সেদিকে সরে গেল ও। ‘একটা কাজই করার আছে এখন-অপেক্ষা। বাজি ধরে বলতে পারি, অপেক্ষা করতে ওদেরও ভাল লাগছে না।’ চিন্তিত দৃষ্টিতে হাতের উল্টো পিঠ নিরীখ করল ও। ‘ভাবছি আজ রাতে পাল্টা হামলা করব কি-না।’

‘আছি তোমার সঙ্গে ।’

‘এখনও সিদ্ধান্ত নেইনি...দেখা যাক,’ দৃষ্টি তুলে ড্যানের দিকে তাকাল ও । ‘কেমন চলছে তোমাদের-মিমির কথা বলছি?’

রক্ত উঠে এল ড্যানের মুখে । ‘খুব ভাল মেয়ে ও ।’

‘হ্যাঁ, ওর মত মেয়ে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে ।’

পাশাপাশি বসে থেকে মরুভূমির উপর নজর রাখল ওরা । সূর্যের উত্তাপের চেয়ে বরং ঔজ্জ্বল্যই অসহ্য মনে হচ্ছে, যদিও দুপুর পেরিয়ে গেছে বেশ আগেই । শেষ বিকেলে দ্বিগুণ উৎসাহে দায়িত্ব পালন করছে সূর্য । ফিল্ডগ্লাস তুলে নিল এরিক, ইয়োমার দিকে দিগন্তের সীমানা নিরীখ করল । তারপর পূর্ব দিগন্ত জরিপ করল ।

কিছু নেই...

গ্লাসের কাছাকাছি পাথরে লাগল একটা বুলেট, পরমুহূর্তে ছুটে এল আরেকটা । তাল মিলিয়ে পাথর আর ঝোপের উপর দিয়ে অর্ধচক্রাকারে ছুটে এল একটা তীর, আগুনের কাছাকাছি পড়ল । তৃতীয় বুলেটটা সরু ফুটো তৈরি করল ড্যান কোয়ানের হ্যাটের ব্রিমে, পাথরের উপর এসে পড়ল আরেকটা তীর ।

রাইফেল হাতে অপেক্ষায় থাকল এরিক । রীজের চূড়ায় বালি ঝরে পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল, একটু নীচের দিকে রেখেছে নিশানা । শূন্যে খাবি খেল একটা হাত, দূর থেকে দেখতে পেল ওরা, ধীরে ধীরে নেমে গেল । বুকে বা মাথায় গুলি খেয়েছে লোকটা । বালি খামচে ধরল ইন্ডিয়ানের দশ আঙুল, একটু পর মুঠি আলাগা হয়ে যেতে খসে পড়ল বালি, হাতটা উধাও হয়ে গেল ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে ।

‘একটা শেষ!’ উত্তেজিত স্বরে বলল ড্যান । ‘দারুণ দেখিয়েছ, এরিক!’

‘বরাত জোরে লাগাতে পেরেছি । মনে হলো ওখানে আছে ব্যাটা, দেরি না করে গুলি করেছি ।’

‘ভাবছি ব্যাটারা না জানি কী পরিকল্পনা করছে ।’

শ্রাগ করল এরিক । ‘আদৌ বলা সম্ভব? তবে, আমার ধারণা,

কিছুটা হলেও অধৈর্য হয়ে পড়েছে চুরুতি । আশায় ছিল পালানোর চেষ্টা করব আমরা, সেভাবেই পরিকল্পনা করেছিল সে...খোলা জায়গায় পেয়ে যাবে আমাদের । কিন্তু উল্টো ওদেরকেই খোলা জায়গায় থাকতে বাধ্য করেছি আমরা । যথেষ্ট পানি নেই ওদের সঙ্গে, খাবারও নিশ্চই ফুরিয়ে আসছে । তা ছাড়া, রাইফেল আর ঘোড়ার লোভে অস্থির হয়ে পড়েছে অ্যাপাচিরা, আমাদের তাড়াতে পারলেই পেয়ে যাবে ওগুলো ।’

নীচে, পাহাড়ী চাতালে উঠে দাঁড়াল বেন ডেভিস ।

‘তা হলে ওই কথাই রইল, আজ রাতে?’ জানতে চাইল ব্লট ।

‘হ্যাঁ,’ ডেভিসের সংক্ষিপ্ত জবাব ।

বারো

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বেন ডেভিস । কোন সম্ভাবনাই নেই এদের, স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সময়ের ব্যাপার মাত্র । এদের সঙ্গে शामिल হওয়ার ইচ্ছে নেই ওর । গত কয়েক রাত ধরে পাথরসারির ফাঁকে সম্ভাব্য একটা পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে ও, এবং শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ ওটাই । পথটা বালিময় হওয়ায় যাওয়ার সময় শব্দ হবে না বললেই চলে ।

ঘোড়ায় স্যাডল পরানোর দায়িত্ব দেওয়া যাবে ব্লটকে, রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিসারে সরে পড়তে পারবে ওরা । এক কি দু’জন পাহারায় থাকবে চাতালের উপর, সতর্কতার সঙ্গে এগোলে কিছুই টের পাবে না তারা, আর ওই সময়ে যদি ওরাই পাহারায়

থাকে, তা হলে তো সোনায়ে সোহাংগা হবে। কয়েক মাইল এগিয়ে, জোর কদমে ছুটিয়ে দেবে ঘোড়া। ইন্ডিয়ান কোন পনিই আর ধরতে পারবে না ওদের। বিশেষ করে ওর থরোব্রেড ঘোড়াটা তৌঁ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথমে উত্তরে এগোবে, তারপর পশ্চিমে মোড় নিয়ে কিছুদূর এগোলে ইয়োমায় পৌঁছে যাবে। নদীর তীরে শহরটার অবস্থান। দীর্ঘ নদীটা খুঁজে না পাওয়ার কোন কারণ নেই, তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে কলোরাডো নদীতে পতিত হয়েছে ওটা, অ্যারিজোনার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।

গাঁট হয়ে বসে থাকার খেলা যত ইচ্ছে খেলতে থাকুক এরিক ক্রেবেট, বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল বেন, তাতে কিছু যায়-আসে না ওর। মরুক শালা এখানে! ইন্ডিয়ানদের নিষ্কিণ্ড তীর বা বুলেটের আঘাতে যদি নাও মরে, না খেয়েই মারা পড়বে সবাই। সাহায্য আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কেউ জানে না ওদের সম্পর্কে, জানেও না কী চরম বিপদে আছে।

ওর সঙ্গী হতে চায় জেফ কেলার, কিন্তু নিজস্ব কিছু আইডিয়া আছে তার...বেশ, শক্ত-সমর্থ কেউ থাকলে উপকারই হবে। টার্গেট হিসাবে দু'জনের চেয়ে তিনজন থাকা শ্রেয়তর; আর কেলার বিশালদেহী মানুষ। বড় শরীর টার্গেট হিসাবেও বড়। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কেলারই যে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানের টার্গেটে পরিণত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই বেনের।

মেলানিকে মাংসের ফালি আঙুনে ঝলসাতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল ও। মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিল মেয়েটি, স্মিত হাসল ওর উদ্দেশে। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে মেলানির মধ্যে, বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করল বেন, কারণ বা উৎসটা ওর বোধগম্য নয়। আগের মত দুর্বিনীত, অস্থির মনে হচ্ছে না রিওস-কন্যাকে, বরং অনেক পরিণত, আত্মবিশ্বাসী এবং অন্তর্মুখী। পরিবর্তনটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না বেনের।

‘তোমার জন্য আর কোন কাজ জুটল না,’ মন্তব্য করল ও।

‘কাউকে তো করতেই হবে, তাই না? মিমি ওর ভাগের চেয়ে ঢের বেশি খাটছে।’

‘শিগ্গিরই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।’

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মেলানি। ‘শুনে খুশি হলাম। প্রায় সবাই ভাবছে এখান থেকে কখনও বেরিয়ে যেতে পারবে না আমরা, তোমার যে উপলব্ধি হয়েছে সেজন্য খুশি আমি।’

‘সবাই হয়তো পারবে না, কিন্তু তুমি নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখ জরিপ করল মেলানি। ‘কথাটার মানে কী, বেন?’

‘প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যেমন, মেলানি, সবসময় তোমার নিরাপত্তা আর যত্ন নিয়ে ভাবছি আমি। তুমি যাতে এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারো, সেটা নিশ্চিত করব।’

কোমল হয়ে এল মেলানির চাহনি। ডেভিসের আঙ্গিনে একটা হাত রাখল। ‘নিশ্চই, বেন, সবসময়ই চেষ্টা করছ তুমি। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।’

‘খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নাও। পরে হয়তো সুযোগ পাবে না।’

চলে গেল বেন ডেভিস। ঘোড়ার কাছে তাকে যেতে দেখল মেলানি। দু’দিন ধরে নিজের থরোব্রেডটার জন্য বাড়তি খাবার সংগ্রহ করছে বেন, দেখেছে মেলানি, হ্যাটের তলা ভরে মেক্সিকট বীন খাইয়েছে।

কফি তৈরি করল ও। একজন একজন করে খেতে এল অন্যরা। পাপাগো ওয়েল্‌সে আসার পর আজই বেনকে প্রথম হাসি-খুশি দেখতে পেল, ব্যাপারটা স্বস্তি এনে দিয়েছে ওর মনে। কিন্তু এরিক ক্রেবেটের দিকে তাকাতে অজানা কারণে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পাথরের আড়াল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ছায়ার দল, অগভীর নিচু জায়গায় জমাট বাঁধল; আঙুলাকতির ক্যাকটাস আর ওকটিয়ার ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে, তবে রাতের

আঁধার নামতে অনেক দেরি। প্রায় প্রত্যেকের মনে তীব্র আশঙ্কা, রক্তপিপাসু অ্যাপাচিরা বেশি দূরে নেই এখন। করালটা না থাকায় ওদের প্রতিরক্ষা ব্যুহে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, একটা পথ উন্মুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়ানদের জন্য, একইসঙ্গে পানির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ থেকে বঞ্চিত করেছে ওদের। অনাগত রাত হবে ওদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ আজকের আগে এতটা কাছে ছিল না অ্যাপাচিরা, যে-কোন মুহূর্তে নাগালের মধ্যে চলে আসতে পারবে তারা।

আজ আর গল্প করছে না কেউ, এমনকী স্বাভাবিক কথাবার্তাও বন্ধ; ঘুমাচ্ছে না কেউ। প্রায় সবাই অস্থির, গম্ভীর, কিন্তু বিপদের জন্য সতর্ক। ভয়ের সঙ্গে বসবাস গত কয়েকদিনেও ছিল, সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়েছে আজ। কাঁপা হাতে অমসৃণ চোয়াল থেকে ঘাম মুছল টিমথি ব্লট। কঠিন পাত্র হিসাবে নিজেকে জাহির করতে অভ্যস্ত মার্ক ডুগান আগের ছায়া মাত্র, সামান্য শব্দে চমকে উঠছে; মেজাজ তেতে আছে তার, প্রায় বিস্ফোরনুখ। এমনকী মিচেলও চাপটা অনুভব করছে। এক জায়গায় স্থির নেই সে, এদিক-ওদিক পায়চারি করছে, তবে সারাক্ষণই নজর রাখছে মরুভূমিতে, গুলি করার জন্য একটা টার্গেট দেখতে অধীর হয়ে পড়েছে। একমাত্র টনি চিডলের মধ্যে কোন ভাবান্তর বা পরিবর্তন নেই, তবে খানিকটা সতর্ক সে। শান্ত নির্লিপ্ত চোখজোড়া খানিক বড়সড় দেখাচ্ছে।

চোখাচোখি এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা, ভুলেও কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না, প্রত্যেকের মনে আশঙ্কা-মৃত্যু খুবই কাছে! কালকের সূর্যোদয় ক'জনের দেখার সৌভাগ্য হবে না, কে জানে! পুড়ে যাওয়া করালটা একটা পরিবর্তনের সাক্ষী এবং হুমকি-ওদের মনে করিয়ে দিচ্ছে চাইলে যে-কোন সময়ে ওটা পুড়িয়ে দিতে পারত অ্যাপাচিরা, আজকের আগে করেনি যখন, সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল নিশ্চই। এবার সেই মোক্ষম সময় এসে গেছে!

স্বস্তি বোধ করছে বেন ডেভিস। স্বস্তির কারণ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হওয়া। সাফল্য নিয়ে সামান্য দ্বিধা বা সন্দেহও নেই

ওর মনে। হ্যাঁ, ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, কিন্তু নেহাত দুর্ভাগা না হলে বহাল তব্বিয়তে ইয়োমায় পৌঁছতে সক্ষম হবে ও। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই হতচ্ছাড়া এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্য। মেলানিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, চাই কি ইয়োমায় হয়ে যেতে পারে বিয়েটা।

তবে, চিন্তাটা হঠাৎ উঁকি দিল মাথায়, এখনই অ্যারিজোনা ত্যাগ করা ঠিক নাও হতে পারে। জিম রিওস যদি ওদের অনুসরণ করে এসে থাকে, হয়তো ইন্ডিয়ানদের তোপের মুখে গিয়ে পড়েছে, কে জানে মরে গিয়েও থাকতে পারে! সেক্ষেত্রে, বিশাল ওই সাম্রাজ্যের মালিক বনে গেছে মেলানি। তাই, ইয়োমায় গিয়ে দেরি না করে বিয়ে করে ফেলতে হবে।

বরাবরই সহজ পরিকল্পনা করতে অভ্যস্ত ডেভিস। পরিকল্পনা যত জটিল হয়, ঝুঁকি তত বেশি থাকে, সাফল্যের সম্ভাবনাও কমে যায়। ঘোড়াগুলো নাগালের মধ্যে রয়েছে, এবং বোল্ডার সারির ফাঁকে বেরিয়ে যাওয়ার মত একটা পথ রয়েছে। চারটা ঘোড়া বোল্ডারের ওপাশে নিয়ে যাবে—রুট আর কেলার সাহায্য করবে। ওপাশের অন্ধকারের মধ্যে স্যাডলে চড়বে, প্রথমে হেঁটে এগোবে কিছুদূর, তারপর তুমুল বেগে ছুটবে। ওদের অনুপস্থিতি টের পেতে হয়তো কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। পাহারা না থাকার চিন্তাটা বাতিল করে দিল ডেভিস। বড়জোর কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এমনিতে জেগে যাবে কেউ। তা ছাড়া, কেউ পাহারায় না থাকলে ওদের কী? দুনিয়ায় যার যার সুবিধামত কাজ করে সবাই, অন্যের স্বার্থ দেখতে গেলে নিজের উপকার হয় না।

আগুনের অবশিষ্ট জ্বলন্ত কয়লার পাশে বসে সিগারেট ধরাল এরিক ক্রেবেট। মনে মনে নিকট ভবিষ্যৎ ভাবছে—অনুমান করার চেষ্টা করল কী ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে। সত্যি কথা হচ্ছে, প্রতিরক্ষার বিবেচনায় যে-কোন সময়ের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে ওরা; যেহেতু পরস্পরের খুব কাছে আছে সবাই। তবে সমস্যার কথা হচ্ছে, ঘোড়ার খাবার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে, পানির

পরিমাণও কম; বারোজনের জন্য রয়েছে আটটা ঘোড়া; বেরিয়ে গেলে, সামনে মরুভূমির যা অবস্থা, এরিক জানে অন্তত একটা ঘোড়ার পিঠে পানি বহন করতে হবে। অন্যথায় মানুষ এবং পশু, সবাই মারা পড়বে।

অ্যাপাচিদের পাল্টা আক্রমণ করার চিন্তাটা আবারও উঁকি দিল মাথায়। এখানে কোণঠাসা হওয়ার পর থেকে আইডিয়াটা মাথায় রয়ে গেছে, খুব জুৎসই মনে না হলেও একেবারে বাতিলও করে দিতে পারেনি। হামলার সময়টাই মুখ্য ব্যাপার, খুবই সতর্কতার সঙ্গে বেছে নিতে হবে। এখনই সুবর্ণ সময়, একরকম নিশ্চিত ও। প্রথম দিকে উদ্দিগ্ন এবং সতর্ক ছিল অ্যাপাচিরা, কিন্তু নিজেদের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে এখন। রুটিনমাসিক কাজ করে যাবে, ঘুণাক্ষরেও আশা করবে না উল্টো সাদারাই হামলা করে বসবে ওদের উপর।

দলটা বড় হলে অনেক শব্দ হবে, নিজেদের অবস্থান লুকিয়ে রাখতে পারবে না। উত্তম হবে যদি এরিক একাই যায়, কিন্তু একা সুবিধা করতে পারবে না। সম্ভাবনা খুবই কম। সেক্ষেত্রে বড়জোর তিন কি চারজন, শেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ও। লোক বাছাই করতে গিয়ে প্রথমেই এসে পড়ল টনি চিডলের নাম। এ-ধরনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবার মধ্যে সে-ই সেরা। তা ছাড়া, চাইলেও বাদ দেওয়া যাবে না তাকে। বললেই যেতে রাজি হয়ে যাবে ড্যান, এবং অন্যদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে। বেন ডেভিসের কথা মনে এলেও বাতিল করে দিল এরিক। ডেভিস সাহসী তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অশ্বারোহী সৈনিক ছিল সে, বালিতে ত্রল করে এগোনোর ক্ষেত্রে বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় পড়ে থেকে অপেক্ষার ক্ষেত্রে আস্থা রাখা যাবে না তার উপর।

হ্যালিগানকে রেখে যেতে হবে, কারণ ওদের কিছু হয়ে গেলে এদিকের পরিস্থিতি সামাল দেবে সার্জেন্ট। কেলার বা ব্লটকে সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর, কারণ এদের কাউকে বিশ্বাস করে না ও। সেক্ষেত্রে, বাকি থাকল কেবল ডুগান আর মিচেল। দু'জনের একজনকে নিতে হবে।

*

সূর্যাস্তের পর ভূতুড়ে পরিবেশ নেমে এল মরুভূমিতে, চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার। ঝিরঝিরে বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে বালি, তাড়িয়ে নিয়ে গেল তপ্ত বাতাস। বাতাসে মৃদু নড়ছে গাছের পাতা, তবে ধুলো উড়ানোর মত যথেষ্ট জোরাল নয়। দূরের এক বালিয়াড়ির আড়ালে ডেকে উঠল একটা কোয়েল। পশ্চিমে পাহাড়সারিতে গাঢ় হয়ে এসেছে ছায়া, কিন্তু শেষ মুহূর্তের আলোয় ফ্যাকাসে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে পুবের গুটিকয়েক শৃঙ্গ।

আগুনে জ্বালানি যোগ করে আলোর পরিধি বড় করে তুলল দুগান। মরুভূমিতে নজর রাখতে ব্যস্ত টনি চিডলের পাশে এসে দাঁড়াল এরিক, গোড়ালির উপর বসে নিচু স্বরে বলল, 'এখন থেকে তিন বা চার ঘণ্টা পর কয়েকজন বেরিয়ে যাব আমরা, পাল্টা হামলা করব অ্যাপাচিদের।'

'আমি যাব। আর...এটাই উপযুক্ত সময়।'

নিচু স্বরে পিমা ইন্ডিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করল এরিক, নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল, চিডলের প্রতিক্রিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গি জানতে অধীর হয়ে পড়েছে। আজন্ম লড়াকু মানুষ সে, অ্যাপাচিদের সম্পর্কে ওদের যে-কারও চেয়ে বেশি জানে; এরিকের পরিকল্পনায় কোন খুঁত বের করতে পারলে, শুধু সে-ই পারবে, কিংবা বলতে পারবে সাফল্যের কতটা সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিবাদ করল না টনি, বরং পরিকল্পনাটা সংশোধন করল। রুট একই থাকল, তবে সম্ভাব্য অ্যাপাচি পাহারাদারের অবস্থান সম্পর্কে নিজের মতামত জানাল।

সম্ভ্রষ্ট মনে ড্যানকে খুঁজতে গেল এরিক।

মিমির সঙ্গে কথা বলছে সে। ওকে দেখে এগিয়ে এল ড্যান, সংক্ষেপে তাকে উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা জানাল এরিক। লম্বা একটা কাঠি দিয়ে নেড়েচেড়ে আগুন উস্কে দিল, জ্বলন্ত কাঠি তুলে স্ফটিকের আগুন থেকে সিগারেট ধরাল ও, সিগারেট মুখ থেকে না সরিয়েই বলল, 'তুমি,

টনি এবং আমি যাচ্ছি। আর একজন হলেই চলবে। বেশি দরকার নেই আমার।’

‘ওদের ক্যাম্প হামলা করবে?’

‘এবং সম্ভব হলে ওদের দু’একটা ঘোড়া নিয়ে আসব। চাই কি তিন-চারটাও পেয়ে যেতে পারি।’

‘মস্ত কঠিন কাজ।’

‘আসল উদ্দেশ্য ওদের উৎসাহ কমিয়ে দেওয়া। ওরা ভাবছে শেষ হয়ে গেছি আমরা।’

‘বেশ...তৈরি আছি আমি। ডাকলেই চলে যাব।’

‘এগারোটায়?’

দিনের শেষ আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আক্রান্ত হলো ওরা। আঙুনে চড়ানো কফির পাত্র শূন্যে উঠে গেল প্রথম গুলিতে, আরেক গুলিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল জ্বলন্ত কয়লা। মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্যান, আন্দাজের উপর একটা ঝোপে গুলি করল। অন্যরাও বসে নেই, ছুটে গিয়ে অবস্থান নিল, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিয়েছে গুলি করার জন্য। মিনিট কয়েক দু’পক্ষে টানা গুলি বিনিময় হলো। তীব্র স্বরে চেষ্টা করে উঠল একটা ঘোড়া, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পাথুরে মাটিতে; সৌভাগ্যক্রমে স্রেফ কাঁধে আঁচড় কেটে চলে গেছে বুলেট। গড়িয়ে পাথরের পিছনে আশ্রয় নিল মিচেল, তলা দিয়ে পেরিয়ে গেল, ওপাশে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে থেমে গেল গোলাগুলি।

ফুটো হয়ে গেছে কফির পাত্র। একটা ঘোড়া সামান্য আহত, আর কানের শীর্ষভাগ পুড়ে গেছে ড্যানের; কিন্তু আক্রমণটা তীব্র নাড়া দিয়েছে ওদের তটস্থ নাভে। এত কাছে ছিল ইন্ডিয়ানরা, অথচ ওদের ক্ষয়ক্ষতি সামান্যই, ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

‘হয়তো আমাদের জীবিত ধরতে চায় ওরা,’ বলল মিচেল।

সন্তর্পণে মাথা তুলে মিচেলের দিকে উঁকি দিল ডুগান। ‘বেকুবার

মত বললে! কেন আমাদের জীবিত চাইবে ওরা?’

‘আমাদের সঙ্গে মেয়েরা আছে,’ গম্ভীর স্বরে বলল মিচেল। ‘জীবিত বন্দির সামনে মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করবে, অ্যাপাচিদের কাছে লোভনীয় সুযোগ এটা।’

আড়ষ্ট হয়ে গেল মার্ক ডুগানের মুখ, বরাবরের গাম্ভীর্য বা কাঠিন্য হারিয়ে গেছে অভিব্যক্তি থেকে, আগের মত আত্মবিশ্বাসও নেই। এড মিচেলের উপর থেকে এরিকের দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। ‘জীবনেও গুনি নি এমন কাজ করেছে ওরা,’ বিড়বিড় করে বলল সে। ‘অসম্ভব!’

মুখে বললেও সুরটা শুনে বোঝা গেল কথাটা বিশ্বাস করেছে ডুগান। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রতিটি লোকই জানে বন্দির সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করে অ্যাপাচিরা, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে যে এমন ঘটতে পারে, এই প্রথম সম্ভাবনাটা বিচার করছে ডুগান। দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল তার, খাবলা মেরে বালি তুলে নিল, পেশি টিলে হয়ে যেতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে বুঝবুঝ করে খসে পড়ল সব বালি। কেউ কিছু বলল না। ড্যানের কানের ক্ষতের গুশ্রা করাচ্ছে মিমি; রাইফেলের মেকানিজম পরখ করছে মিচেল।

আগুনটা নিঃপ্রভ হয়ে এসেছে।

ঘোড়ার কাঁধের ক্ষতে গ্রিজ ঘষছে চিডল। কয়েক মিনিট কেটে গেল, কেউ কোন মন্তব্য করল না। সান ফ্রান্সিসকোর কথা ভাবছে বেন ডেভিস...এখান থেকে যদি বেরোতে পারে, জীবনেও আর ফিরে আসবে না। নিকুচি করি পশ্চিমের! জিম রিওস যদি মারা গিয়ে থাকে এবং র্যাঞ্চ বা তার সমস্ত সম্পত্তি যদি ওদের হয়ে যাওয়ার কথা; সব বেচে দিয়ে পুরে চলে যাবে ওরা। ভদ্রলোকের বাস করার উপযুক্ত স্থান নয় এটা।

দুটো তারা উঁকি দিল আকাশে। স্থবির হয়ে গেছে বাতাস। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা কয়োট। জ্বলন্ত কয়লার ম্লান আভা এসে পড়েছে মিচেলের বয়স্ক মুখে, রাইফেলের ব্যারেল লেগে ঝিকিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। মাটিতে পা দাবাল একটা ঘোড়া, হেঁষাধনি

করল। পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে দে আর টেন্টিং টুনাইট অন দ্য ওল্ড ক্যাম্প গ্রাউন্ড গাইতে শুরু করল সার্জেন্ট হ্যালিগান। গানটার করণ সুর বিষণ্ণ করে তুলল পরিবেশ। আগুনে কাঠ যোগ করল মেলানি, অল্পক্ষণ পরেই উস্কে উঠল আগুন।

আগুনের শিখা নাচানাচি করছে ওদের মুখে; গানটা যখন শেষ হলো, অখণ্ড নীরবতা নেমে এল ছোট্ট ক্যাম্পে।

তেরো

মাঝরাতের ঘণ্টা দুয়েক বাকি, ঘোড়ায় যখন স্যাডল পরানো শেষ করল টিমথি ব্লট, ক্যাম্পের সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। খুবই সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছে সে, কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি। পাথুরে চাতালে পাহারার দায়িত্বে রয়েছে বেন ডেভিস, আর জেফ কেলার ক্যাম্পের ধারে-কাছে কোথাও আছে।

এরিক ক্রেবেটের দুটো ছাড়াও অন্যদের কয়েকটা ক্যান্টিন পানিতে ভরে একটা ঘোড়ার স্যাডলের সঙ্গে জুত করে বেঁধে নিয়েছে। নিজের রাইফেল তুলে নিয়ে ক্রেবেটের ডান ঘোড়ার কাছে চলে এল ব্লট, ঠিক করেছে এটায় চড়বে ও। দেখতে তেজী, শক্তিশালী মনে হয় ঘোড়াটাকে, এ-মুহূর্তে তেজী ঘোড়াই দরকার ওর...কিন্তু ডানটার স্বভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। জানে না মিসৌরি মিউলের মত চালাক ওটা, শয়তানের মত মেজাজী।

কাজ শেষে চাতালে বেনের কাছে চলে এল ব্লট। 'কী অবস্থা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

‘মোক্ষম সময়। কিছুই নড়ছে না, কবরের মত নিস্তব্ধ।’

শিউরে উঠল ব্লট, ঠাণ্ডা বাতাসের কারণেও হতে পারে। ‘তা হলে আর দেরি কীসের?’

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করল বেন। পাহারার দায়িত্ব ছেড়ে যেতে অনীহা বোধ করছে। একসময় সৈনিক ছিল সে, লুকআউটে একজন সেন্ত্রির অনুপস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে। যার উপর অন্যদের জীবনের দায়িত্ব থাকে, কোনক্রমেই ঘুমানো উচিত নয় তার, কিংবা পোস্টও ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করছে না ও, রাতটাও নিরুপদ্রবে কেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

‘কেলার কোথায়?’

‘আশপাশে কোথাও আছে।’

‘বেশ,’ মনস্থির করল বেন। ‘মিস্ রিওসকে নিয়ে আসছি আমি।’

চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ব্লট। কিছু বলল না সে, তবে মেলানি রিওসকে সঙ্গে নেওয়ার ধারণা পছন্দ করতে পারছে না। সঙ্গে মেয়ে থাকা মানে বাড়তি দায়িত্ব, বাড়তি ঝামেলা, এবং বরাবরই এ-ব্যাপারটা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত সে। ‘ওকে নেওয়ার কী দরকার? দেখো, কর্নেল, আমার তো মনে হয়...’

‘আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে ও,’ ব্লটের মুখের কথা কেড়ে নিল বেন, গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ, কণ্ঠস্বর সোজাসাপটা। ‘এখনি নীচে চলে যাও।’

মনে মনে খিস্তি করতে করতে নীচের পথ ধরল টিমথি ব্লট। ‘ব্যাটা নিজেকে আমার কমান্ডিং অফিসার ভাবছে!’ তীব্র অসন্তোষে গাল বকল সে। ‘আগে তো বেরিয়ে যাই, তারপর দেখাব কেঁ কাকে নির্দেশ দেয়!’

*

প্রস্তুত জেফ কেলার...প্রায়। শুধু ছোট্ট একটা কাজ বাকি। একটা জিনিস চাই তার, সেটা না হলেই নয়—বিগ জুলিয়ার স্যাডল ব্যাগ দুটো। ক্যাম্পের একেবারে কিনারে চলে গেছে সে, পাথর আর বোল্ডারের ফাঁকে খোঁজাখুঁজি করছে। এরিক ক্রেবেটের মতই সেও ব্যাগ লুকিয়ে রাখতে দেখেছে জুলিয়াকে, তবে জায়গাটা স্পট করতে

পারেনি। অনুমানের উপর নির্ভর করে খুঁজছে। আরও একটা ব্যাপার, ব্যাগ দুটোয় কী আছে বা কোথেকে এসেছে, সেটাও জানা আছে কেলারের।

গত কয়েক বছর ধরে এই সোনার ব্যাপারে ভাবছে সে, কত স্বপ্ন দেখেছে! ফোর্ট ইয়োমায় এক বন্দির কাছ থেকে শুনেছিল, মুক্তি পাওয়ার বিনিময়ে গোপন তথ্য প্রকাশ করেছিল বন্দি। কেলারের সঙ্গে চুক্তি হলো, তাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে, বিনিময়ে সোনার সন্ধান জানিয়ে দেবে সে। সত্যি সত্যি জেল থেকে বেরিয়ে গেল বন্দি, কিন্তু দু'শো গজ যাওয়ার আগেই পিঠে গুলি খেয়ে মারা পড়ে। বলা বাহুল্য, গুলিটা জেফ কেলার নিজেই করেছিল।

সোনার উৎস, কুইটোবাকের খনিটা সীমান্ত থেকে খানিকটা দক্ষিণে। এক আমেরিকান এবং চার-পাঁচজন স্পেনিশ পিয়ন থাকে পাহারায়। চালু এক বা দু'জন লোক হলে সোনা লুট করা কোন ব্যাপার নয়, ঠিক এরকম পরিকল্পনাই করছিল কেলার। ঝুঁকি নিতে হয়নি তাকে, বিগ জুলিয়া আগেই লুট করে ফেলেছে সেই সোনা, এবং ভাগ্যের ফেরে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। যেভাবেই হোক, এই সোনা এখন চাই ওর।

ঘুমন্ত মেলানির উপর ঝুঁকে পড়ল বেন ডেভিস। কাঁধ স্পর্শ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল মেলানি। 'মেলানি,' ফিসফিস করল বেন। 'জলদি তৈরি হয়ে নাও। এখনই চলে যাব আমরা।'

চট করে উঠে বসল মেলানি। 'চলে যাব? কোথায়?' ঘুমন্ত কাঠামোগুলোর উপর নজর চালাল ও। 'এরিক যাচ্ছে তোমার সঙ্গে?'

'এরিক?' বিহ্বল বোধ করল বেন।

ব্লটের সঙ্গে পরিকল্পনা করার সময় দু'একটা কথাবার্তা কানে এসেছে মেলানির, ও নিশ্চিত সেই পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে যাচ্ছে সে।

'এরিক যাবে কেন?' এবার ত্যক্ত শোনাল বেনের কণ্ঠ। 'এসবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর! জলদি, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে

রাজি নই আমি। যত দ্রুত সম্ভব ইয়োমায় পৌঁছতে চাই!

‘বেন! তুমি নিশ্চই এদেরকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছ না?’ তারপরই ওর মনে পড়ল এ-মুহূর্তে পাহারায় থাকার কথা তার। ‘আরে, তোমার না পাহারায় থাকার কথা?’

‘তুমি কি তর্ক করেই যাবে?’ রেগে যাচ্ছে বেন। ‘চাইলে এখানে থাকতে পারে ক্রেবেট, যাকে ইচ্ছে ওর সঙ্গী করুক! আমি থাকছি না। মেলানি, একটা কথা শুনে নাও, এদের একজনও বাঁচতে পারবে না, একে একে সবাই খুন হয়ে যাবে। এখানে থাকলে আমরাও মরব। চলে এসো, ঘোড়ায় স্যাডল পরানো হয়ে গেছে।’

কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেলানি। ইয়োমার কথা মনে পড়ল ওর-শহর, বাড়ি, লোকজন...নিরাপত্তা। তারপর যা বলল ও, নিজেও জানে না কী বলেছে, ভাবেওনি কথাটা বলতে সক্ষম হবে। ‘উঁহুঁ, আমি যাচ্ছি না, বেন। এখানেই থাকব।’

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেন, রাগে কাঁপছে শরীর। এমন বোকামি করে কোন মানুষ? ‘মেলানি,’ সঠিকেরে বলল ও। ‘বুঝতে পারছ না তুমি। সবাইকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করছে ক্রেবেট, অথচ সফল হওয়ার সামান্য সম্ভাবনাও নেই। ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা, সে নিজেও জানে এটা। কিন্তু ওর মত বোকামি করব কেন আমরা? পরিস্থিতি অনুকূল, এখনই বেরিয়ে গেলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ইয়োমায় পৌঁছে যাব।’

ইতস্তত করছে মেলানি। নিশুপ সারা ক্যাম্প। এরিককে দেখতে পাচ্ছে না, তবে নিশ্চই ধারে-কাছে আছে সে। হয়তো যে-কোন মুহূর্তে জেগে যাবে। চুপিসারে যদি বেরিয়ে যেতে পারে ওরা...হয়তো ইয়োমায় পৌঁছতে সক্ষমও হবে। বিপদের ভয় থাকবে না, মৃত্যুর আশঙ্কা চলে যাবে...আরামদায়ক পরিবেশে স্বস্তি বোধ করবে, এই অভিজ্ঞতাকে মনে হবে দুঃস্বপ্ন; বিয়েটা সেরে পুবে চলে যেতে পারবে-ঝলমলে শহর, পার্টির আনন্দ, বিকালে চায়ের ফাঁকে অলস আলাপ করার আনন্দ...

এই তো চেয়েছে ও, নাকি? এই লোকগুলোর সঙ্গে কী সম্পর্ক ওর? এদের সঙ্গে না আছে কোন বন্ধন, না তৈরি হয়েছে হৃদয়ের টান। ও চলে গেলে কিছু যাবে-আসবে এদের? এরিক ক্রেবেট এক ভবঘুরে কাউন্সিল-কিংবা তারচেয়েও খারাপ, ঠিক ওর বাবার মত-নিষ্ঠুর, উদ্ধত, বেপরোয়া, স্বেচ্ছাচারী। হৃদয় বলে কিছু থাকে না, এদের। অন্যরাও কি এরচেয়ে শ্রেয়তর? রাস্তায় হাঁটার সময় এ-ধরনের মানুষকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় ও; কথা বলা দূরে থাক, বড়জোর হয়তো শুভেচ্ছার উত্তরে সামান্য মাথা ঝাঁকায়। অন্য সময়ে, ভিন্ন কোন পরিস্থিতি হলে এদের কাউকেই চেনা হত না ওর।

‘জলদি করতে হবে, সোনা,’ ক্রোমল স্বরে তাগাদা দিল বেন ডেভিস। ‘সবকিছু তৈরি। কেলার আর ব্লট যাবে আমাদের সঙ্গে।’

এক পা এগিয়েও থমকে দাঁড়াল মেলানি। ‘তুমি যাও, বেন। এখানেই থাকব আমি।’

এবার সত্যি সত্যি খেপে গেল বেন। ‘মেলানি! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো তো, কেন এখানে থাকবে? এদের সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার? এদের প্রতি কোন দায় আছে আমাদের? নেই। বরং চলে গিয়ে ওদের জন্য বরাদ্দের চেয়ে বেশি খাবার আর পানি রেখে যাচ্ছি আমরা, এতে হয়তো প্রাণ রক্ষা হয়ে যেতে পারে ওদের।’

‘এখানেই থাকব আমি, বেন। ওরা না ওঠা পর্যন্ত কাউকে পাহারায় থাকতে হবে। তুমি বরং চলে যাও।’

‘তোমাকে ছাড়া যাব?’

মুখ তুলে তাকাল মেলানি। ‘হ্যাঁ, আমাকে ছাড়াই যাবে।’

‘কিন্তু আমাদের বিয়ের কী হবে? এন্গেজমেন্ট হয়েছে কি এভাবে সম্পর্কটা শেষ হওয়ার জন্য? মাত্র কয়েক মাইল দূরে ইয়োমা, পৌছার সঙ্গে সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেলব।’

‘দুঃখিত, বেন। বিয়ের ব্যাপারটা এ-মুহূর্তে তুচ্ছ ও সস্তা মনে হচ্ছে আমার কাছে। এতগুলো মানুষ আটকা পড়েছে, খুন হয়ে যেতে পারে যে-কেউ, এসময়ে বিয়ের মত তুচ্ছ বিষয়ে ভেবে নিজেকে ছোট

করতে রাজি নই আমি। তুমি বরং চলে যাও, ইয়োমায় পৌঁছে সাহায্য পাঠিয়ে দিয়ো আমাদের জন্য। যদি বেঁচে থাকি, ইয়োমায় পৌঁছে না হয় ভাবব তোমার প্রস্তাবটা।’

অবিশ্বাস নিয়ে মেলানির দিকে তাকিয়ে থাকল বেন, বুঝতে পারছে না রাগ সামলাবে নাকি আবারও বোঝানোর চেষ্টা করবে মেয়েটিকে। মেলানিকে ছাড়া ইয়োমায় পৌঁছে কী হবে? ফুটো পয়সারও দাম নেই। জুয়ার হলে ফিরে যেতে হবে ওকে, ঘৃণ্য সেই জীবনে গা ডুবাতে হবে। অথচ নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও দেয়নি মেলানি। কী যেন বলেছে? সাহায্য পাঠিয়ে দিয়ো আমাদের জন্য। হ্যাঁ, সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে পারবে ও, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই হয়তো বাঁচাতে পারবে এদের।

‘মেলানি, বড় ভুল করছ তুমি। আমার সঙ্গে যাওয়া উচিত। তর্ক করার সময় নেই। ইয়োমায় পৌঁছে আর্মিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। কথা দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে ফিরে আসব, কিন্তু এমন মহা বিপদের মধ্যে তোমাকে ফেলে যেতে পারি না আমি। নিরাপদ জায়গায় তোমাকে পৌঁছে দিতে পারলে যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। আমার কাছে তোমার নিরাপত্তাই বড় ব্যাপার।’

‘না, বেন, গেলে সবাই যাব, নইলে যাব না আমি,’ মৃদু স্বরে শেষ কথা বলে দিল মেলানি।

*

মাত্র ত্রিশ গজ দূরে আছে জেফ কেলার, অনুমান অনুযায়ী উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেছে। পাথুরে ফাটলে রয়েছে ব্যাগ দুটো। ফোকর দিয়ে ভিতরে হাত গলিয়ে দিল সে, সত্যি সত্যি স্যাডল ব্যাগের ঠাণ্ডা চামড়ার স্পর্শ পেল। ধক করে উঠল কলজে, একটা স্পন্দন মিস্ করল ওর হৃৎপিণ্ড। এত ভারী! তারমানে ঠিকই আন্দাজ করেছিল—সোনাই রয়েছে ব্যাগে! স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ বড় বাকস্কিন ব্যাগ দুটো, ভারী কিছু বয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ব্যাগ দুটো বের করতে খানিকটা কসরত করতে হলো, তবে শেষপর্যন্ত দুই হাতে দুই ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

আলোর বৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়াল জেফ কেলার। এক পা এগিয়েও জমে গেল, পিছনে শটগানের দুই ব্যারেল কক্ করার জোড়া শব্দ শুনতে পেয়েছে...

শটগান এখানে একজনেরই আছে—বিগ জুলিয়ার।

‘ব্যাগ দুটো নামিয়ে রাখো, কেলার,’ মহিলার হিমশীতল কণ্ঠ শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কেলারের। ‘নইলে দুই টুকরো করে ফেলব তোমাকে!’

অসহায় বোধ করছে কেলার, দুই হাতে দুই ব্যাগ, চাইলেও অ্যাকশনে যেতে পারছে না। জুলিয়া যে গুলি করবে, এ-ব্যাপারে মনে সামান্য সন্দেহও নেই ওর; কিংবা এও ধুঝতে পারছে যে এর আগেও অবলীলায় মানুষ খুন করেছে মহিলা। সম্ভবত এই সোনার জন্য। ‘আরে, এত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে,’ চেষ্টাকৃত কোমল স্বরে বলল সে, অদ্ভুত শোনাল কণ্ঠ। ‘দেখো, আমরা দু’জনেই...’

‘ফেলে দাও ব্যাগ দুটো, মিস্টার!’

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ তামিল করল কেলার। ঘোড়ার লাগাম হাতে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টিমথি ব্লট। কথাবার্তা শুনে ওদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে ডেভিস আর মেলানি। দু’জনের পিছনে, আলোর বৃত্তের উল্টোদিকে, ছায়ার মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে আছে এরিক ক্রেবেট।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল জেফ কেলার। শটগানের নল স্থির হয়ে আছে ওর বেল্ট বরাবর, দৃশ্যটা পেটে অস্বস্তি ধরিয়ে দিল। একটা পিস্তলের মুখে দাঁড়ালে হয়তো ঝুঁকি নেওয়া যায়, হিসাব গড়বড় করে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু ডাবল-ব্যারেল শটগানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে টাফ লোকও অসহায়।

‘আধাআধি ভাগ করব, বিনিময়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব আমি,’ প্রস্তাব করল কেলার।

‘ওকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছ না তুমি,’ ওপাশ থেকে ভেসে এল এরিকের কণ্ঠ।

যথেষ্ট অপেক্ষা করেছে ব্লট। লোভের কাছে পরাস্ত হয়েছে কেলার, আর অযথা মেয়েটার পিছনে সময় নষ্ট করছে বেন ডেভিস; চুপিসারে কেটে পড়ার সুযোগটা হাত ফস্কে গেছে। তবে ওর জন্য পথ খোলা আছে এখনও! কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না ওর দিকে, দেখেই এক লাফে স্যাডলে চেপে বসল সে, নির্দয়ভাবে স্পার দাবাল। লাফ মেরে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, লাফিয়ে টপকে গেল একটা পাথর, ওপার্শে বালির উপর পড়েই ছুটতে শুরু করল। মুহূর্তে অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

সবাই জেগে গেছে। আর কিছু করার নেই বলে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

‘আমার ঘোড়ায় চড়েছে তো,’ শেষে স্মিত হেসে বলল এরিক। ‘বেশিদূর যেতে পারবে না।’

‘তাতে কী? ঘোড়া তো ঘোড়াই!’ মিচেলের মন্তব্য।

‘ডান ঘোড়াটাকে চিনি আমি। হঠাৎ ওর পিঠে চেপে বসায় চমকে গেছে বটে, তবে শিগ্গিরই সামলে নেবে। কী ঘটেছে বোঝার পর ঘটবে আসল ঘটনা।’

তুমুল বেগে ছুটছে ডান ঘোড়াটা। বুক ধড়ফড় করছে ব্লটের। মুক্ত হয়ে গেছে সে! নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে! আর মাত্র কয়েকটা মিনিট, তারপরই...

পিঠে অচেনা রাইডারের অস্তিত্ব টের পাওয়া মাত্র গতি কমিয়ে ফেলল ডান। চার পা প্রায় একত্র করে ফেলল, জড়িয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে। স্যাডলে টলে উঠল টিমথি ব্লটের দেহ, সামলে নিতে দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে ঘোড়ার পিঠ, শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো ব্লট। উড়ে গিয়ে বালির উপর পড়ল সে, ছুটে গেল ঘোড়াটা, অল্পের জন্য মাথায় লাগেনি খুরের আঘাত। মুহূর্তে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডান ঘোড়াটা।

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে, বাট করে খাড়া হলো সে, চোঁচিয়ে গাল দেবে ঘোড়াকে, এসময় নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলো। শব্দ করা মানে অ্যাপাচিদের জানিয়ে দেওয়া! পিস্তলটাই ওর শেষ সম্বল,

ঘোড়াটা বেহাত হয়ে গেছে, এমনকী একটা ক্যান্টিনও নেই। চারপাশে আছে শুধু ইন্ডিয়ানরা।

মুহূর্ত খানেক স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে। ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে। চিন্তাটা মাথায় উঁকি দিলেও বাতিল করে দিল। উঁহুঁ, বহু কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া ঠিক হবে না। যে যাই বলুক, রুটের ধারণা ধারে-কাছেই রয়েছে পানি, এবং প্রয়োজনে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাবে। অ্যাপাচিরা যদি মরুভূমিতে টিকে থাকতে পারে, সেও পারবে। পাশ ফিরে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটা ধরল টিমথি রুট।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনেছে বলে সন্দেহ হলো ওর। থেমে কান পাতল, কিন্তু কোন আওয়াজই কানে এল না। মিনিট খানেক অপেক্ষার পর আবার হাঁটতে শুরু করল, এবং আবারও শুনতে পেল শব্দটা! হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে গেল, তারপর দৌড়াতে শুরু করল।

ছুটছে তো ছুটছেই, থামার সাহস করতে পারছে না। পাছে ওকে ধরে ফেলে ইন্ডিয়ানরা। ক্লান্তিতে পা চলছে না, একসময় মুখ খুবড়ে পড়ে গেল। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল রুট, হাত-পা থেকে রক্ত ঝরছে, কিন্তু ভয় আর শঙ্কা শক্তি যোগাল ওকে। ছুটে গিয়ে শোলা ঝোপের উপর পড়ল, অন্ধকারে দেখতে পায়নি। অসংখ্য কাঁটা বিদ্ধ হলো শরীরে, যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে গুণ্ডিয়ে উঠল ও। এত অসহায় অবস্থা যে চিৎকারও করতে পারছে না। অসহ্য ব্যথা অগ্রাহ্য করে আবার ছুটতে শুরু করল...

ভোরের আলো যখন ফুটতে শুরু করেছে, তখন ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে টিমথি রুট। খাঁ খাঁ মরুভূমিতে রয়ে গেছে তখনও, গন্তব্যের দেখা নেই। এক ঘণ্টা পর মনে হলো একই জায়গায় রয়েছে, সূর্য এখন উত্তাপ ঢালছে রক্ষ মরুভূমির বুকে। থেমে শরীরে বেঁধা কাঁটা তোলার প্রয়াস পেল সে, হাতেরগুলো দিয়ে শুরু করল-দাঁত দিয়ে তুলতে চাইছে। একটা তুলতে সক্ষম হলো, দ্বিতীয়টা কামড়ে ধরেছে, এসময় ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল সামনের দিকে।

মুহূর্ত খানেক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, মনে শঙ্কা আর ভয়ের

দ্বৈরথ চলছে, তারপর ধীরে ধীরে ডানে-বামে দৃষ্টি প্রসারিত করল। এক কদম পিছিয়ে এল ও, দরদর করে ঘামছে, ঘুরে দাঁড়াল, কাঁটাটা এখনও কামড়ে ধরে আছে। ওকে ঘিরে ফেলেছে অ্যাপাচিরা। পালানোর কোন পথ নেই।

ঠিক মাঝ দুপুরে টিমথি ব্লটের আর্তনাদ শুনতে পেল অন্যরা।

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল বেন ডেভিস, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।
'কী ওটা?'

দীর্ঘ একটা মিনিট কেটে গেল, কেউ কিছু বলল না, শেষে জবাব দিল এরিক: 'ব্লটের চিৎকার ওটা...ইয়োমায় আর পৌছানো হলো না বেচারার।'

*

দুপুরের একটু পর ফিরে এল ডান ঘোড়াটা। হালকা তালে ছুটে এল, স্টিরাপ দুটো লুটাচ্ছে। এরিক ওটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ঝট করে মাথা তুলল ঘোড়াটা, চোখজোড়া ঘুরপাক খাচ্ছে। মৃদু স্বরে কথা বলে ওটাকে শান্ত করল এরিক, ব্রিডল ধরে নিয়ে এল পানির কাছে। স্যাডল খুলে ওটাকে পিকেট করল, ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিল, একইসঙ্গে বিশ্রামও পাবে। ঘোড়ার নাগালের বাইরে আছে, এমন মেক্সিট বীন তুলে এনে রাখল ওটার সামনে। গত এক ঘণ্টা ধরে টিমথি ব্লটের চিৎকার শুনতে পেয়েছে ওরা, কিন্তু ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

দীর্ঘক্ষণ কেউই কিছু বলছে না। শেষে এরিকের পাশে এসে দাঁড়াল কেলার। 'ব্লটকে কী করছে ওরা, বলতে পারবে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল সে, কণ্ঠে ভয় চাপা থাকল না; আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, ঘাম ঝরছে ভুরু থেকে। 'ব্লটের গলা শুনে মনে হচ্ছে একটা পশু চিৎকার করছে!'

'আহত পশুর চিৎকারের মত,' গম্ভীর স্বরে বলল এরিক। 'তবে এখন আর নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না ওর। অ্যাপাচিরা ওকে নিয়ে কী করছে জানি না, হয়তো একটু একটু করে ওর চামড়া ছিলছে, কিংবা শোলার কাঁটা বিঁধাচ্ছে ওর দেহে, তারপর কাঁটায় আগুন ধরিয়ে

দিচ্ছে। অত্যাচার করার ব্যাপারে অভিনব সব আইডিয়া গিজগিজ করে অ্যাপাচিদের মাথায়।

বিশাল হাতের পাঞ্জা দিয়ে মুখ মুছল কেলার। 'কী মনে হয় তোমার...কোন সম্ভাবনা আছে আমাদের, ক্রেবেট?'

'এখনও বেঁচে আছি, তাই না? আছি যখন, একটা সম্ভাবনা তো আছেই।'

ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে হামলার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছে, কিন্তু এরিক জানে যে সুযোগ পেলে তাই করা উচিত, সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো এতেই পাশার দান উল্টে দিতে সক্ষম হবে ওরা। তবে একজন লোক কম আছে এখন।

স্যাডল ব্যাগ দুটোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার্ক ডুগান। 'ওগুলোয় কী আছে?' জানতে চাইল সে।

'নিজের চরকায় তেল দাও!' খেঁকিয়ে উঠল বিগ জুলিয়া।

'আমি বলছি,' শয়তানি হাসি ফুটল কেলারের মুখে। 'শুনবে, কী আছে ব্যাগে? সোনা। খাঁটি সোনা। ষাট-সত্তর হাজার ডলার হবে দাম। আরেকটা কথা জেনে নাও, চুরি করা সোনা এগুলো।'

'চুরি করা?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা ওগুলো আসলে কুইটোবাক খনি থেকে এসেছে। টুকসনে এ-সম্পর্কে যত গাঁজাখুরি গল্পই চালু থাকুক, বাস্তবে সোনা ছিল কুইটোবাকে। বন্ধু সহ ওগুলো চুরি করেছে বিগ জুলিয়া, সম্ভবত বুড়ো অ্যাডামকে খুনও করেছে।'

'ম্যা'ম,' হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মার্ক ডুগান। 'আইনের লোক আমি। সোনাগুলো আমার হাতে তুলে দাও।'

ঘাম আর বালি জমে বিচিত্র আঁকিবুকি তৈরি হয়েছে জুলিয়ার মুখে। পরনের কাপড় এলোমেলো, ধূলিমলিন, একটা স্টকিং নীচে নেমে গেছে; কিন্তু মহিলার হাতের শটগানটার ভয়ঙ্করত্ব সম্পর্কে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। 'বেশ, সাহস থাকলে এসে নিয়ে যাও,' বিগ জুলিয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

জিভ চালিয়ে ঠোট ভিজিয়ে নিল ডুগান। লোভী চাহনিতে দেখল ব্যাগ দুটো, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ওগুলো নেওয়ার আগ্রহ দেখা গেল না তার মধ্যে।

‘এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, অপেক্ষা করো,’ পরামর্শ দিল জেফ কেলার। ‘এই গ্যাডাকল থেকে যেই মুক্তি পাবে, নিঃসন্দেহে বড়লোক হয়ে যাবে সে।’

‘যথেষ্ট হয়েছে!’ নাক গলাল এরিক। ‘নিজেদের মধ্যে শুধু খুনোখুনিই বাকি আছে। কেলার, এ-নিয়ে আর একটা কথা বলেছ কি ব্লটের মতই মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেব তোমাকে।’

হাতে শটগান, বিগ জুলিয়ার চোখে যুগপৎ চ্যালেঞ্জ এবং ঔদ্ধত্য। কিন্তু মহিলাকে রীতিমত অগ্রাহ্য করল এরিক। মহা বিপদে আছে ওরা এখন। টিমথি ব্লটের ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিচ্ছে অ্যাপাচিরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা হলো নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে সে, কিন্তু সহ্যের সীমা তারও আছে; ব্লটের মৃত্যুর পরপরই ওদের দিকে মনোযোগ দেবে ইন্ডিয়ানরা।

এরিকের সামনে এসে দাঁড়াল সার্জেন্ট। ফ্যাকাসে এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে। ‘দুঃখিত, এরিক। ব্লটের পক্ষ থেকে আমিই দুঃখ প্রকাশ করছি। আসলে সত্যিকার সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা কোন কালেই ছিল না ওদের, খেয়ালের বশে চলে এসেছে, আমাদেরও লোক দরকার বলে বাছ-বিচার না করে নিয়ে নিয়েছিলাম। কেলারের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার...পূর্বে ঝামেলায় ছিল ও, পশ্চিমে এসে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে স্রেফ নিজেকে রক্ষা করার জন্য।’

এগিয়ে এল ডুগান। ‘ক্রেবেট, ওই মহিলাকে সমস্ত সোনা আমার হাতে সোপর্দ করতে বলো। এখানে আমিই আইনের একমাত্র লোক।’

ঝটিতি তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এরিক। ডুগান, তুমি আসলে ব্যবসায়ী। জরুরি প্রয়োজনে পাসির সদস্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল তোমাকে, তারমানে এই নয় যে আইনের নিয়মিত লোক তুমি। যাই হোক, ক্ষণিকের ডেপুটি হয়তো ছিলে, কিন্তু এখানে তাও

নও, স্রেফ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য লড়ছ। জুলিয়া কীভাবে সোনা পেল বা ওগুলো নিয়ে কী করবে, তাতে একটুও মাথা-ব্যথা নেই আমার। আমার চিন্তা কেবল একটাই, কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব আমরা।’

‘হ্যাঁ, এখান থেকে যখন বেরিয়ে যাবে তুমি,’ স্পষ্ট বিদ্বেষের সুরে বলল ডুগান। ‘তোমার অতীত যাচাই করার ব্যবস্থা করব, ক্রেবেট। সম্ভবত আইনের উল্টো পথে তোমার যাতায়াত।’

‘চাপাটা বন্ধ রাখো! নিজের জায়গায় গিয়ে রাইফেল হাতে নাও। ব্লটের মত অসহ্য কষ্টে মরতে না চাইলে নজর রাখো, যে-কোন সময়ে হামলা করতে পারে ইন্ডিয়ানরা।’

চোদ্দ

উত্তপ্ত বাতাস ধুলো উড়িয়ে নিয়ে এল খোলা জায়গায়, কূপের উপর মিহি আস্তরের মত ভাসমান একটা চাদর তৈরি করল কিছুক্ষণের জন্য, শেষে ধীরে ধীরে থিতিয়ে এল। পানির উচ্চতা প্রায় তলানিতে নেমে গেছে, সামান্য অবশিষ্ট আছে। সূর্য মাথার উপর, গনগনে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে উনুনের মত উত্তপ্ত মরুভূমির বুকে। পাথুরে চাতাল থেকে মরুভূমিতে দৃষ্টি চালান এড মিচেল, বালিতে প্রতিফলিত সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। নিজেকে ক্লান্ত এবং পর্যুদস্ত মনে হচ্ছে ওর, জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করল বয়স হয়েছে। কঠিন জীবনে অভ্যস্ত ছিল বরাবর, উদয়াস্ত পরিশ্রম করত, সামান্য খাবার আর পানি হলেও দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারত দিনের পর দিন, ক্লান্তি বলে কিছু জানা ছিল

না। শঙ্কা বা উদ্বেগ শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। কিন্তু এখন জানে সে। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে।

উইনচেস্টার পরখ করল এরিক ক্রেবেট। ক্যাম্পের ওপাশে বসে থাকা মেলানির দিকে তাকাল। সকাল থেকে একেবারে চুপ হয়ে গেছে মেয়েটা। অবশিষ্ট খাবার যা ছিল, নীরবে বিলিয়ে দিয়েছে সবাইকে। একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। ড্যানের পাশে বসে আছে মিমি, মৃদু স্বরে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। একটু দূরে একা বসে আছে বেন ডেভিস।

গতরাতের ঘটনা সবার জানা হয়ে যাওয়ার পরও ডেভিসকে কিছু বলেনি এরিক। লোকটাকে শুরু থেকে অপছন্দ ওর, কিন্তু তারপরও ভেবেছিল সবার সঙ্গে থাকবে সে, একাট্টা হয়ে লড়বে যোগ্য পুরুষের মত; প্রত্যাশাটা অতিরিক্ত ছিল। তবে এও ঠিক ডেভিস কাপুরুষ নয়, বড়জোর স্বার্থপর। সময়ে সময়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এ-ধরনের মানুষ, অভিজ্ঞতা থেকে জানে এরিক।

লোভে পেয়ে বসেছে ডুগানকে। নিজেদের প্রতিরক্ষার চেয়ে, বরং বিগ জুলিয়ার সোনা সম্পর্কে বেশি ভাবছে। লোকটার উপর আস্থা রাখা যাবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল এরিক।

ওর জন্য কফি নিয়ে এল মেলানি। ‘প্রায় শেষের পথে,’ মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি। ‘অবশ্য এর অর্ধেকের বেশিই মেক্সিকট বীন মেশানো। কিন্তু এই আছে আমাদের।’

কাপটা নেওয়ার সময় আন্তরিক হাসল এরিক। নীরব বিস্ময় আর সমীহ নিয়ে ওকে দেখল মেলানি। ক্লান্তি বলে কিছু নেই এই লোকটির! ‘তুমি শুধু আমাদের কথাই ভাবছ,’ অকপট স্বরে বলল ও। ‘সার্জেন্ট ছাড়া শুধু তুমিই সবার মঙ্গলের চিন্তা করছ।’

‘কারণ এখান থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে চাই আমি।’

‘উঁহু, এরচেয়েও বড় কারণ আছে। শুধু নিজের জন্য এত কিছু করে না মানুষ।’

‘একটা কথা বলি, ম্যা’ম,’ সামান্য দ্বিধার পর কথাটা বলেই ফেলল

সার্জেন্ট হ্যালিগান। 'যাই ঘটুক, ওর সঙ্গে লেগে থেকো। কেউ যদি তোমার যত্ন নিতে পারে, তো সেই লোক হচ্ছে ও।'

'হয়তো এখনও আমাকে বীয়ারের ফেনাই ভাবো তুমি,' সার্জেন্ট চলে যাওয়ার পর মৃদু স্বরে বলল মেলানি। 'দেখতে সুন্দর, কিন্তু কোন কাজে আসে না। এই দেশে টিকে থাকতে কী ধরনের মানুষ হতে হয়, শেষপর্যন্ত তোমার কথাটার মানে বুঝতে শুরু করেছি।'

'তোমার বাবা একটা ছেলেকে খুন করেছিল,' সিগারেট রোল করার ফাঁকে বলল এরিক। 'ঘটনাটা জানি আমি। ছেলেটার নাম ছিল রিও, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে ও ছিল বন্দুকবাজ, ভাড়াটে খুনী। তোমার বাবাকে খুন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল ওকে।'

সরাসরি এরিকের চোখে চোখ রাখল মেলানি, নিরীখ করল। 'আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসব বলছ না তো?'

'হয়তো কয়েক ঘণ্টা পরই মারা যাব সবাই, এই পরিস্থিতিতে যে-লোক মিথ্যে বলে, সে বোকারও অধম। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মিচেল বা ডুগানকে জিজ্ঞেস করো। সীমান্তের আশপাশে সবাই জানে ঘটনাটা। রিও আসলে এল পাসো থেকে এসেছিল, ঝগড়াটে ঝামেলাবাজ। বন্ধুরা তোমার বাবাকে পরামর্শ দিল একজন বন্দুকবাজ ভাড়া করতে, সে-ই মুখোমুখি হবে রিওর, কিন্তু হেসে কথাটা উড়িয়ে দিল জিম রিওস। নিজের লড়াই আজীবন নিজে করে এসেছে সে, স্বভাবটা বুড়ো বয়সে বদলানোর মত দুর্বল হয়ে যায়নি সে।'

'বোকার মত ঘটনাটার ভুল ব্যাখ্যা বিশ্বাস করেছি আমি।'

'বোকামি কে না করে? রিওকে দেখলে বহু লোকই এমন ভুল করবে। মুখে হাসি থাকলেই ভাল ছেলে হয় না। নিজের চোখে রিওকে দেখেছি আমি। হাসিখুশি, আমোদপ্রিয়। ঘোড়ার পিঠে দুর্দান্ত, হাঁটার ভঙ্গিও আকৃষ্ট করার মত; কিন্তু মনটা র্যাটলারের চেয়েও নীচ আর বিষাক্ত ওর।'

নীরব থাকল মেলানি। ‘এরিক, বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমি। বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই।’

‘খুবই খুশি হবে তোমার বাবা।’

‘তুমি কি নিয়ে যাবে আমাকে?’

চার চোখ একত্রিত হলো, মেলানির চোখে কী যেন খুঁজল এরিক। ‘যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি,’ প্রতিশ্রুতি দিল ও। ‘তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।’

নুড়িপাথরে একটা বুটের সংঘর্ষের শব্দ হলো। ‘আমাকে ফেলেই পালাবে, মেলানি?’ একটু দূরে, ওদের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছে বেন ডেভিস। ‘উঁহু, মেলানি, পার পাবে না। ক্রেবেটও তোমাকে নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না।’

মরুভূমি কত পরিবর্তনের জন্ম দেয়, সে-মুহূর্তে আবারও উপলব্ধি করল মেলানি, মিথ্যে ও অহমিকার বেসাতি ধসে পড়ে; এখানে দাঁড়াতে হলে দরকার নির্জলা সাহস আর দুর্জয় মনোবল।

‘এ-ব্যাপারে পরে কথা বলব আমরা,’ মৃদু স্বরে বলল এরিক। ‘যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছে, আর নয়।’

খরখরে স্বরে হেসে উঠল বেন। ‘ঝামেলা থেকে দূরে থাকার বুদ্ধিটা তোমার ভালই, ক্রেবেট। কিন্তু ক’বার এড়াবে? কেলার, ডুগান আর জুলিয়ার সঙ্গে খুব চোটপাট দেখিয়েছ। যথেষ্ট হয়েছে। বারবার একই কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমার। কাল রাতে চলে যেতে চেয়েছিলাম, জেনেও কিছু বলোনি আমাকে। কেন? ওদের মত আমাকেও শাসাতে এলে না যে? ভয় পাচ্ছ?’

‘ভয় পাব কেন?’

‘গুলি করে উড়ন্ত কাক মেরেছি আমি, ক্রেবেট,’ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে গেছে বেন ডেভিসের ঠোঁটের কোণ। ‘মাত্র এক গুলিতে।’

‘কাকটার কাছে কি পিস্তল ছিল?’ শান্ত স্বরে জানতে চাইল এরিক, দেখল ডেভিসের হাসিটা ম্লান হয়ে গেছে। ‘কাকের মত হাওয়ায় উড়ব না আমি, ডেভিস, এবং একটা পিস্তলও থাকবে আমার হাতে।’

কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে সার্জেন্ট হ্যালিগান, আড়চোখে তাকাল এরিকের দিকে। 'দু'জনের মাঝখানে আছ তুমি, ডেভিস, সহজ একটা টার্গেট। বেতাল কিছু করেছ তো ফুটো হয়ে যাবে।'

নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলো বেন ডেভিস।

দারুণ গরম পড়ছে। ধুলো উড়ছে মরুভূমিতে। পাথুরে চাতালে উঠে এল এরিক, স্থির বসে থেকে নজর রাখল, নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করছে। উদ্বেগ ওকেও পেয়ে বসেছে, তটস্থ নাভে চাপ পড়ছে। পিস্তলে নিজের উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী বেন ডেভিস...এমনকী খ্যাতিপাগল আনাড়ি তরুণদের চেয়েও। ডেভিস ধরেই নিয়েছে এরিককে শোডাউনে হারিয়ে দিতে পারবে, সম্ভবত দুনিয়ার কোন বন্দুকবাজকেই নিজের সমকক্ষ মনে করে না সে।

খুবই বিপজ্জনক লোক সে। এরকম পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ে বহু কঠিন মনের মানুষ, চাপ সহিতে পারে না; অল্পতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বেপরোয়া পদক্ষেপ শুধু তার নিজেরই নয়, অন্যদেরও অমঙ্গল ডেকে আনে।

এমন নির্জন জায়গায়, যেখানে দেখার নেই কেউ, যে-কোন কিছু ঘটতে পারে। জেফ কেলারের মন্তব্যটা শুনেছে এরিক-যে-ই বেঁচে থাকবে, বড়লোক হয়ে যাবে। বেন ডেভিসও শুনেছে। নিশ্চই নিজস্ব কোন পরিকল্পনা রয়েছে তার, মেলানি রিওসের চেয়ে বোধহয় সোনাই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

ডুগান, কেলার এবং ডেভিস...তিনজনই শত্রু বনে গেছে। সেজন্য পরিস্থিতি, নাকি ও নিজেই দায়ী, বুঝতে পারছে না এরিক। মিচেল বা চিডল কোন পক্ষ নেবে, বলা যাচ্ছে না।

পাথুরে চাতালের কিনারে এসে অবস্থান নিল সবাই। দিনটা বড় দীর্ঘ মনে হবে ওদের, খাবার নিঃশেষ হয়ে গেছে। সামান্য পানি অবশিষ্ট আছে। মরুভূমিতে, একটু আগে মৃত্যুর কাছে হার স্বীকার করেছে টিমথি ব্লট, কিন্তু সৈনিকের করুণ আত্ননাদ এখনও কানে লেগে আছে ওদের।

দিগন্তে ঘুরে বেড়াল এরিকের দৃষ্টি, তাপতরঙ্গ আর উড়ন্ত ধুলো ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। আছে শুধু বালি, নীল আকাশ এবং চিরুনির খাঁজের মত সুউচ্চ রীজের সারি-তাপদন্ধ দিগন্তের পটভূমিতে হাড় বিরঝিরে শাখাপ্রশাখা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবক'টা ঘোড়া। চাতাল থেকে नीচে নেমে গেল এড মিচেল, অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, চিত্তিত দৃষ্টিতে সামনের বোল্ডার আর পাথরসারি দেখছে, যেন বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে।

কোলে দুই স্যাডল ব্যাগ নিয়ে বসে আছে বিগ জুলিয়া। উত্তাপ, সন্দেহ এবং আশঙ্কায় পর্যুদস্ত। ভয়ে ভয়ে আছে কেউ হয়তো মূল্যবান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে ওকে। ভুলেও ওর দিকে তাকাচ্ছে না জেফ কেলার। এই ক'দিনে ওজন হারিয়েছে বিশালদেহী সৈনিক, আগের চেয়ে শীর্ণ দেখাচ্ছে। ঘাটতি পুষিয়ে নিয়েছে नीচতা আর শঠতার মাধ্যমে।

কেবল টনি চিডলের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে আছে; জিভ দিয়ে কাগজ ভিজাল সে, সিগারেট রোল করা সম্পূর্ণ করল। মাঝে মধ্যে মিচেলের দিকে তাকাচ্ছে।

চাতালে সবার উঁচুতে রয়েছে হ্যালিগান, গুলি করতে পারবে এমন টার্গেট খুঁজে পেতে উদ্ধীবি। হঠাৎ তাকে রাইফেল তুলতে দেখতে পেল এরিক, ভঙ্গিটায় যুগপৎ নিখাদ সতর্কতা এবং দক্ষতা রয়েছে; দুই পাথরের চেরা দিয়ে স্বচ্ছন্দে মাজল সামনে বাড়াল সে, বাঁট ঠেকাল গালের সঙ্গে।

গুলির শব্দ শুনে এরিকের মনে হলো সার্জেন্টই গুলি করেছে; কিন্তু আধপাক ঘুরে গেল তার দেহ, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল। মুখ খুবড়ে পড়ে গেল সে, পাথর থেকে কূপের কিনারে গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াল সে, এলোমেলো দুই কদম ফেলল, তারপর আবার মুখ খুবড়ে পড়ল বালিতে।

দৌড়ে তার কাছে চলে গেল এরিক, ঠেলে চিৎ করল দেহটা।

সার্জেন্টের চোখে নিঃশ্রাণ দৃষ্টি।

‘আরও একজন কমে গেল, ক্রেবেট,’ মুখিয়ে উঠল ডেভিস।
‘পরিণতির দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলে।’

‘তুমিও এর রাইরে নও।’

সার্জেন্টের রাইফেল তুলে নিয়ে অ্যামুনিশনের খোঁজে থমাস হ্যালিগানের পকেট চেক করল এরিক।

‘এরিক!’ হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চৈচাল ড্যান কোয়ান। ‘আসছে ব্যাটারী!’

দ্রুত পজিশন নিল ওরা। কিন্তু শূন্য মরুভূমি চোখে পড়ল সামনে। আঙুল তুলে একটা মেস্কিট ঝোপ দেখাল ড্যান। মৃদু নড়ে উঠল ঝোপটা, দেখল এরিক। উঁহুঁ, বাতাসে নড়েনি। রাইফেল সামনে এনে পরপর তিনটা গুলি পাঠিয়ে দিল ও। দ্রুত, পাশাপাশি নির্দিষ্ট দূরত্বে।

গুলি করেছে চিডল, আবারও করল। উল্টোদিকে, কূপের ঠিক উপরের পাথরের আড়াল থেকে গুলি করল ডেভিস আর ডুগান। মিচেলের গুলির পরপরই ক্ষণিকের নীরবতা নেমে এল। আচমকা উঠে দাঁড়াল বুড়ো স্কিনার, ঝোপে গুলি করে খালি করে ফেলল পয়েন্ট সেভেন-থ্রি উইনচেস্টার। দ্রুত, একটানা সতেরোটা গুলি করল সে, সম্ভাব্য কাভারের প্রতিটি জায়গা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তারপর দ্রুত জায়গা বদল করল সে, আড়ালে গিয়ে রিলোড করল।

লাফিয়ে পাথরের উপর উঠে এল সে, বালিয়াড়ির কিনারায় গুলি করল। দৌড়ে জায়গা বদল করেছে আর একের পর এক গুলি করেছে। কোন জায়গাই বাদ রাখল না, ঝোপ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কিংবা পাথরে ঠিকরে গিয়ে গুপ্ত জায়গায় হানা দিল বুলেট।

‘এড!’ মুহূর্মুহু গুলির শব্দ ছাপিয়ে উঠল এরিকের চিৎকার। ‘মাথা নিচু করো, ম্যান! বসে পড়ো!’

কিন্তু কে শোনে কার কথা! পাথরের উপর সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে মিচেল। গুলি করল আবারও, যেন নতুন কোন টার্গেট দেখতে পেয়েছে ও, পাশ ফিরল হঠাৎ, সেগুয়েরো ক্যাকটাসের গোড়ায় পরের

গুলি করল। উল্টোদিকে পঞ্চাশ গজ দূরে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। গুলির ধাক্কায় ঝাঁকি খেল এড মিচেলের দেহ, আধ-পাক ঘুরে মুখ খুবড়ে পড়ল পাথরের উপর।

দৌড়ে তার কাছে চলে গেল এরিক। কেঁপে উঠল মিচেলের চোখ। 'উপায় ছিল না, এরিক, কাউকে তো বেপরোয়া হতেই হত,' কর্কশ স্বরে বলল সে। 'আর সইতে পারছিলাম না। টনির দিকে খেয়াল রেখো, ইন্ডিয়ান হলেও মানুষটা ভাল ও।'

'এড!' প্রায় ফরিয়াদ জানাল এরিক। 'ধৈর্য ধরো!'

মাথা নাড়ল মিচেল। 'দুঃখিত, বয়। পিছন দিকে খেয়াল রেখো...নিজের পিঠের দিকে।'

দৃষ্টি তুলতে মেলানিকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল এরিক। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও।

'কী বলল ও?' জানতে চাইল মেলানি।

নিজের প্রাণের বিনিময়ে ইন্ডিয়ান হামলাটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে মিচেল। ঠিকই বলেছে সে, উপায় ছিল না, অ্যাপাচিদের সম্মিলিত আক্রমণ রুখে দিতে এমন বেপরোয়া দুঃসাহসেরই প্রয়োজন ছিল। মিচেলের মৃত্যু যেন নিরুৎসাহিত করে তুলেছে রেডস্কিনদের, নীচে মরুভূমিতে নিস্তরুতা নেমে এসেছে। কোথাও কিছু নড়ছে না, সামান্য শব্দও নেই। শুধু সূর্য আগের মতই আছে। গরম, প্রচণ্ড গরম পড়ছে।

'ব্যাটারদের বোধহয় উচিত শিক্ষা দিতে পেরেছে এড,' বলল ড্যান কোয়ান।

'সম্ভবত। বুদ্ধি করেই গুলি ছুঁড়েছে ও। সম্ভাব্য যত কাভার ছিল, একটাও বাদ দেয়নি। প্রতিটা ঝোপ ছিন্নভিন্ন করেছে। তবে কতটা সফল হয়েছে, কখনোই জানতে পারব না আমরা।'

'কী মনে হয়, বেরিয়ে যেতে পারব আমরা?'

মাথা ঝাঁকাল এরিক। 'কারণ জানি না, আমার মনে হচ্ছে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারব আমরা, সবাই না হলেও অন্তত কয়েকজন। কিন্তু অ্যাপাচিদের ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। কারও চোখে পড়ার

আগেই মৃতদের সরিয়ে নিয়ে যায় ওরা। তুমি যদি কাউকে খুন করতেও পারো, কখনোই জানতে পারবে না, যদি না সবাইকে খুন করতে পারো।’

‘ছয়জন, ছয়জন ভালমানুষ মরে গেল!’

এরিকের পাশে এসে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল মেলানি। পাশ ফিরে ওর দিকে তাকাল এরিক, জানতে চাইল: ‘আয়না আছে তোমার কাছে?’

‘আয়না?’ চোখ বড়বড় হয়ে গেল মেলানির। ‘বলতে চাইছ নিজের চেহারা দেখা উচিত আমার? জানি আমাকে দেখতে খুব বাজে লাগছে এখন...’

‘উঁহু, চেহারা দেখতে বলছি না। একটা আয়না চাই আমার, যত বড় হবে তত ভাল।’

‘একটা আছে আমার কাছে, কিন্তু...’

‘নিয়ে এসো। ওটা আনার পর পালাক্রমে কাজ করবে তুমি আর মিমি। আয়নায় সূর্যের আলো ফেলে ওই শৃঙ্গটার উপর ফ্ল্যাশ করবে...’ ইশারায় উত্তর-পূর্বের নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্গ দেখিয়ে দিল এরিক। ‘আর এই বরাবর পাঠাতে হবে...’ উত্তর-পশ্চিমে আরও একটা শৃঙ্গ দেখাল ও। ‘দুই পাহাড়ের মাঝখানের জায়গা কাভার করবে। এখনই শুরু করো, এক ঘণ্টা পরপর একে অন্যকে বিশ্রাম দেবে। যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকবে, ততক্ষণ কাজটা করতে হবে তোমাদের। বুঝেছ?’

‘সঙ্কেত পাঠাতে বলছ? আলোর সঙ্কেত পাঠাব আমরা?’

‘হ্যাঁ, আশা করি কারও চোখে পড়বে,’ আঙুল দিয়ে হ্যাটের ব্রিম পিছনে ঠেলে দিল এরিক। ‘এতদিনে ইয়োমা থেকে সশস্ত্র একটা দলের চলে আসার কথা। হয়তো তোমার বাবা, বা আর্মি, কিংবা সাধারণ মানুষ এবং সৈনিকদের মিলিত দল। যাই হোক, আলোর সঙ্কেত চোখে পড়লে এখানে চলে আসবে।’

‘অবশ্য এত দক্ষিণে আমাদের আশা করবে না ওরা। আয়নায় আলোর প্রতিফলনও কাছ থেকে চোখে পড়বে না, ধরে নিচ্ছি দূরে

কোথাও আছে ওরা, সেক্ষেত্রে নিশ্চই দেখতে পাবে। এ-ধরনের সঙ্কেত বহু মাইল দূর থেকে চোখে পড়ে, পাথুরে সিলিঙে সূর্যের আলোও অনেকদূর থেকে দেখা যায়। দেখতে পাক বা না-পাক, চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। আর আশায় থাকতে হবে।’

‘আমার আয়নাটা খুবই ছোট,’ জানাল মেলানি। ‘স্যাডল ব্যাগের বিশেষ একটা পকেটে থাকে ওটা। বাবা পকেটটা তৈরি করে দিয়েছিল। আয়নাটাও। ইস্পাতের তৈরি ওটা, ছয়-বাই-আট ইঞ্চি।’

‘দারুণ! এরচেয়ে ভাল কিছু আশাও করিনি আমি।’

‘এরিক,’ হঠাৎ এরিকের বাহু চেপে ধরল মেলানি। ‘আগে কেন সঙ্কেত পাঠাইনি আমরা? হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।’

‘হয়তো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যায়নি। এদিকে ঝামেলা হয়েছে, এটা বুঝতে কয়েকদিন লেগে যাওয়ার কথা। পাসি বা সৈন্যরা ফিরে যায়নি জেনেও প্রথমে পাত্তা দেবে না ওরা, কারণ মরুভূমিতে দেরি হওয়ার বহু কারণ রয়েছে, তবে কয়েকদিন কেটে গেলে উদ্ভিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।’

‘একটা কিছু ঘটেছে এবং কিছু করা উচিত, সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে। কেউ কেউ সবসময়ই অদৃষ্টে বিশ্বাসী, মনে করে নিরাপদে ফিরে আসবে সবাই, কিন্তু এখন ওরা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে খারাপ কিছু ঘটেছে এতগুলো মানুষের ভাগ্যে। যাত্রার প্রস্তুতি এবং এখানে আসার জন্য দু’দিন হিসাব করলে...এতক্ষণে কাছাকাছি চলে আসার কথা ওদের। আমার মনে হয় সঙ্কেত দেওয়ার জন্য সময়টা ঠিকই আছে।’

‘বেশ।’

মেলানি চলে যেতে তন্নতন্ন করে মরুভূমি জরিপ করল এরিক ক্রেবেট। কাছ থেকে দূরে প্রসারিত করল দৃষ্টি, তারপর খুঁটিনাটি প্রতিটি জায়গা দেখল সময় নিয়ে; দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল চোখজোড়া। এত কষ্টকর কাজ, নিজে না করলে বোঝা যায় না। শেষে ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে পাহাড়সারি নিরীখ করল। কিন্তু সব মিলিয়ে আধ-

ঘণ্টাও পেরোয়নি, তার আগেই ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হলো।

সেদিন কয়েকবারই বিক্ষিপ্তভাবে তীর ছুঁড়ল অ্যাপাচিরা, দু'বার গুলি করল, কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারল না ওদের।

*

মাঝ দুপুরে এরিকের কাছে এল কেলার, ডেভিস আর ডুগান। লুকআউট থেকে পিছিয়ে এসে ছায়া আছে এমন একটা জায়গায় বসেছে এরিক, ক্লান্ত পা জোড়াকে খানিকটা বিশ্রাম দিচ্ছে। এক চুমুক পানি পান করেছে। ডেভিসের নেতৃত্বে ওর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

‘ফ্রেবেট, আমরা এখান থেকে চলে যেতে চাই। ঘোড়া নিয়ে ছুটব ইয়োমার দিকে। এখন যথেষ্ট ঘোড়া আছে আমাদের, এবার আর বাধা দিতে পারবে না। আমার তো মনে হয় নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারব, অন্তত কয়েকজন তো পৌঁছবে।’

‘দুঃখিত।’

‘দেখো, ফ্রেবেট,’ রক্ষ হয়ে গেল বেন ডেভিসের কণ্ঠ। ‘যথেষ্ট দুর্ভোগ সয়েছি। এখানে যদি থাকি, একজন একজন করে খুন হয়ে যাব। তারচেয়ে কি লড়াই করা মরা উচিত নয়?’

‘ডেভিস, উত্তরের ওই পথে যাবে বলে ঠিক করেছ তোমরা,’ শান্ত স্বরে বলল এরিক। ‘ওটার আরেক নাম জানো? ক্যামিনো ডেল ডায়াবলো-ইংরেজিতে যদি শুনতে চাও, তা হলে ভাষান্তর করে দিচ্ছি-শয়তানের মহাসড়ক। ওখানে মাত্র এক জায়গায় পানি আছে, অ্যাটলাস টিনাজায়, ট্রেইলের পাশে রীজের মধ্যে পাথুরে গর্তে জমা পানি। শত শত লোক মারা গেছে ওই ট্রেইলে, এদের কয়েকজন ওই পানির মাত্র কয়েক গজ দূরে ছিল, অথচ অবস্থান জানত না। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো জায়গাটা খুঁজে পাবে, কিন্তু দেখবে সবুজ শ্যাওলা পড়ে আছে, কিংবা হয়তো নির্জলা পানিই পাবে। বছরের এই সময়ে পানি থাকে না ওখানে। তো, পানি না পেলে কী করবে?’

‘যেভাবে হোক পৌঁছব আমরা।’

‘তা ছাড়া,’ যোগ করল এরিক। ‘এখনও একটা ঘোড়া কম আছে

আমাদের। আটটা ঘোড়ার বিপরীতে মানুষ আছি নয়জন।’

রাইফেল ঘুরাল কেলার। ‘সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি এখনই!’
টনি চিডলের পিঠে নিশানা করল সে, মরুভূমির উপর নজর রাখছে
পিমা ইন্ডিয়ান।

‘রাইফেলটা ফেলে দাও, কেলার,’ পিছন থেকে নির্দেশ দিল ড্যান
কোয়ান, পাথরের আড়ালে রয়েছে সে। ‘একটু দেরি করেছ কি তুমি
নিজেই শকুনের খাবার হয়ে যাবে, মি. কিলার!’

খিস্তি করতে করতে অস্ত্র ফেলে দিল কেলার।

পিস্তল ছুঁইছুঁই করছে বেন ডেভিসের হাত। ‘সবসময়ই কি অন্যরা
তোমার গোলাগুলির কাজটা চালিয়ে যায়, ক্রেবেট? যতদূর মনে পড়ছে
শেষবার একটা মেয়ে দায়িত্বটা নিয়েছিল।’

‘কেলারের ব্যবস্থা করতে পারবে ড্যান, জানি আমি,’ মৃদু স্বরে
বলল এরিক, ঠোঁটে স্মিত হাসি। ‘তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।’

আড়ষ্ট হয়ে গেছে বেন ডেভিসের মুখ, সামান্য বিস্ফারিত হলো
চোখজোড়া। পিস্তলের বাঁট ছুঁয়েছে তার হাত, যে-কোন সময়ে বিদ্যুৎ
খেলে যাবে হাতে, মুঠিতে উঠে আসবে ভয়ঙ্করদর্শন কোল্টটা।

অপেক্ষায় থাকল এরিক, স্মিত হাসিটা মুখে ধরে রেখেছে এখনও,
এমনকী হাসিটা চোখও স্পর্শ করেছে।

হঠাৎ হাত সরিয়ে নিল ডেভিস, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে
তাকে দেখল এরিক। কাপুরুষ নয় সে, জানে ও, কিংবা ভয় পেয়েও
পিছিয়ে যায়নি। পিছনে ড্যান কোয়ানের অবস্থানই তাকে নিরস্ত
করেছে। ডেভিস ভেবেছে সে এরিককে গুলি করলে, সঙ্গে সঙ্গে
তাকেও গুলি করবে ড্যান।

পাথুরে চাতাল থেকে কিছুই চোখে পড়ছে না। একের পর এক
গুলি ছুটে আসছে অ্যাপাচিদের দিক থেকে, মাঝে মধ্যে ভূতের মত
উঁকি দিচ্ছে শয়তানগুলো। দু’বার গুলি করল ডুগান, কিন্তু লাগাতে
পারল না। ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে অ্যাপাচিরা। তবে একটা
চোখ সবসময় জুলিয়ার দিকে রেখেছে সে। মহিলার ধারে-কাছেও

যায়নি কেউ, কিংবা কথাও বলেনি। জুলিয়ার ভারী শরীরটা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু চোখজোড়া সতর্ক, সচেতন সর্বক্ষণ। যখনই কেউ নড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে শটগানের নল ঘুরে যাচ্ছে।

শেষ বিকেলের আলোয় পুরো ক্যাম্পে চক্কর দিল এরিক, সবার অবস্থান পরখ করল। এখনও যদি দশ-বারোজন ইন্ডিয়ান থেকে থাকে, রাতে আক্রমণ করলে প্রথম দফায় শেষ হয়ে যাবে ওরা; যদিও সেজন্য মাশুলও দিতে হবে তাদের। চুরুতির কথা মনে পড়ল ওর...এমনকী অ্যাপাচিরাও পাগলাটে বলে লোকটাকে, বলে চুরুতির কৌশল খুব নৃশংস কিন্তু কার্যকরী। সেক্ষেত্রে, নেতার অনুপস্থিতিতে বিমূঢ় হয়ে পড়বে অ্যাপাচিরা। কালো মোটা ভুরু এই যোদ্ধার মুখটা স্মরণ করল ও, মনে পড়ল তার অসংখ্য খুনের ঘটনা।

বেশ কয়েকজন ইন্ডিয়ান মারা গেছে, সংখ্যাটা ওদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি নিশ্চই। সকালে নিজেদের সম্ভাবনা বিচার করছিল এরিক, মোটামুটি সন্তোষ বোধ করেছে। ওরা প্রত্যেকেই অস্ত্রে দক্ষ, নিশানা গড়পড়তার চেয়ে ভাল। টার্গেট ঠিকমত দেখতে না পেলেও ইন্ডিয়ানদের অস্ত্রের স্কুলিঙ্গ দেখে গুলি করেছে, কয়েকবারই বোধহয় লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হয়েছে।

রাত নামল। বাতাস বেড়ে গেছে। উত্তাপ চলে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল মরুভূমির পরিবেশ। তীব্র বেগে বইছে বাতাস, বালি উড়ছে সেইসঙ্গে, কেড়ে নিচ্ছে দেহের উষ্ণতা। ছোট্ট একটা আগুন জ্বালিয়ে পালাক্রমে শরীর গরম করতে থাকল ওরা।

কূপের কাছে গিয়ে পান পান করল এরিক। ঘুরে জুলিয়ার দিকে ফিরল, তারপর আবার ঝুঁকে পড়ে কাপটা ভরে নিল, সিঁধে হয়ে এগোল মহিলার দিকে। নিচু স্বরে কী যেন বলল কেউ, ঝট করে মুখ তুলে চারপাশে তাকাল বেন ডেভিস।

এগিয়ে গেল এরিক, শটগান ঘুরিয়ে ওকে কাভার করল বিগ জুলিয়া।

‘দূরে থাকো।’

গত কয়েক ঘণ্টায় এই প্রথম কিছু বলল মহিলা। না থেমে এগিয়ে গেল এরিক, কাপটা ধরে রেখেছে সামনে। 'পানি খাওয়া দরকার তোমার, জুলিয়া,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'তোমার জন্য পানি নিয়ে এসেছি।'

'ফিরে যাও!' এবার আতঙ্ক প্রকাশ পেল জুলিয়ার কণ্ঠে।

কিন্তু থামল না এরিক, কাছে গিয়ে কাপটা ধরিয়ে দিল মহিলার হাতে। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল জুলিয়া, শটগানের ট্রিগারে আঙুল রেখে বাম হাতে কাপ তুলে চুমুক দিল। তৃষ্ণার্ত চাতকের মত পানি পান করল, তারপর কাপটা ফিরিয়ে দিল এরিককে, মুহূর্তের জন্যও এরিকের চোখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে এল এরিক। শটগানের মুখে পিঠ পেতে দিয়েছে, কিন্তু সামান্য শঙ্কাও নেই ওর মনে।

'ও যদি গুলি করত!' অস্ফুট স্বরে শঙ্কা প্রকাশ করল মেলানি।

'উহুঁ, করত না।'

'মি. ক্রেবেট,' মিমির কণ্ঠ। পাথুরে চাতালে উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, হাতে এড মিচেলের রাইফেল। 'মি. ক্রেবেট, মনে হচ্ছে একটা আগুন দেখেছি!'

পনেরো

চাতালে উঠে এল এরিক। একই জায়গায় ভিড় করেছে সবাই, কেবল বিগ জুলিয়া বাদে, দৃষ্টি উত্তর-পূর্বের মরুভূমির দিকে।

শেষ বিকেলের আলোয় গাঢ় নীল রঙ পেয়েছে পাহাড়সারি, তবে

মরুভূমির লাগোয়া এলাকায় ছায়ার কারণে খানিকটা কালচে দেখাচ্ছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমি, শেষ বিকেলের ফ্যাকাসে আকাশ, নিঃসঙ্গ গুটিকয়েক তারা, অর্ধচন্দ্রাকৃতির সেগুয়েরো ঝোপ... শুধু এসবই চোখে পড়ল। শোলা ক্যাকটাসের যেন নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, অপেক্ষাকৃত জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে ওগুলোকে।

কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল আগুনটা। কয়েক মাইল দূরে, পাহাড়ের এক পাশে। আগুন যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

‘এত বড় করে আগুন জ্বালাল কে?’ স্বগতোক্তি সুরে জানতে চাইল ড্যান কোয়ান।

‘যত বড় ভাবছ, তত বড় নয়,’ বলল এরিক। ‘নির্মেঘ রাতে উঁচু জায়গা থেকে কয়েক মাইল দূরের আলোও দেখা যায়। আগুনটার দূরত্ব হয়তো দশ মাইল, কিংবা পনেরো মাইলও হতে পারে।’

‘সাদা মানুষের জ্বালানো আগুন,’ মন্তব্য করল চিডল। ‘এত বড় আগুন জ্বালায় না ইন্ডিয়ানরা।’

‘তাতে আমাদের কী যায়-আসে?’ ত্যক্ত স্বরে বলল ডুগান।

‘কয়েক মাইল দূর থেকে চোখে পড়ে, এমন আগুন যদি ওরা তৈরি করতে পারে, তা হলে আমরাও এমন একটা তৈরি করতে পারব, যাতে চোখে পড়ে ওদের। সমস্যার কথা হচ্ছে আগুনটা জ্বালাতে হবে পাথরের উপর, নইলে দেখতে পাবে না ওরা।’

‘পাথরের কাছাকাছি যাওয়া মানে ইন্ডিয়ানদের গুলিতে ফুটো হওয়া!’ তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করল ডুগান।

‘চাইলে দেখা না দিয়েও, নীচ থেকে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারব আমরা,’ বাতলে দিল এরিক। ‘দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকেই আগুনে কাঠি ঠেলে দেওয়া যাবে। চ্যাপ্টা ওই পাথরটার উপর আগুন ধরাব।’ সচরাচর যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে মরুভূমির দিকে নজর রাখে ওরা, ওই জায়গার ঠিক পিছনে পাথরটার অবস্থান। ‘চিন্তা কোরো না, আমি নিজেই তৈরি করব আগুনটা। সবাই মিলে এবার হাত লাগাও, যতটা

পারো কাঠ যোগাড় করে নিয়ে এসো।’

ক্যাম্পে কয়েকটা কাঠি আগে থেকে ছিল, ওগুলো তুলে নিয়ে চ্যাপ্টা পাথরের কাছে চলে এল এরিক। চারপাশে পাথরের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে উঁচু, এরিকের কাঁধ সমান উঁচুতে। দ্রুত কাজে নেমে পড়ল ও, সবক’টা কাঠি সাজিয়ে রাখল পাথরের উপর, তার উপর রাখল শুকনো লতাপাতা; শার্টের হাতা থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে যোগ করেছে পাতার সঙ্গে, পাশেই রাখল ছোট ছোট কাঠি। আগুন জ্বালাতে তেমন বেগ পেতে হলো না। ততক্ষণে জ্বালানি কাঠ নিয়ে চলে এসেছে অন্যরা। ঝুঁকে পড়ে পাথরের কাছে চলে এল এরিক, সতর্কতার সঙ্গে কাঠি যোগ করল আগুনে, যাতে মরুভূমি থেকে ওকে চোখে না পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ বড়সড় হয়ে জ্বলতে শুরু করল আগুন। লেলিহান শিখা উঠে যাচ্ছে কয়েক ফুট, চ্যাপ্টা পাথরের বুকে প্রায় কয়েক ফুট পরিধির জায়গা জুড়ে জ্বলছে। শিখাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, কে কতটা উঁচু আর উজ্জ্বল হতে পারে। ক্রমাগত কাঠ জুগিয়ে চলল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তত দশ ফুট উঁচু শিখা জ্বলতে শুরু করল। ঝোপের নীচে পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা, কাঠি আর কাঠ আনতে চলে গেল কেউ কেউ। বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটা করছে সবাই।

হঠাৎ বিচ্ছিন্ন একটা গুলি ছুটে এসে আঘাত করল আগুনের কাছাকাছি পাথরে, বিইঙ শব্দে রিকোশেট ছুটল অন্যদিকে। শব্দটা কলজে কাঁপানো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একযোগে গুলি শুরু করল অ্যাপাচিরা, বুঝে ফেলেছে আগুনের কাছাকাছি রয়েছে ওরা, দেখতে না পেলেও পাথরে গুলি ছুঁড়ে রিকোশেটের মাধ্যমে লক্ষ্যভেদ করতে চাইছে।

পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক, তবে পাথুরে চাতালের আড়াল থাকায় কারও বিপদ হলো না। অপেক্ষায় আছে ওরা। গোলাগুলির ঝড় থামতে উঠে দাঁড়াল, নীচে নেমে গেল আরও কাঠ আনতে। অ্যারোয়োয় টু

মেরে এক মানুষের বাহুর চেয়েও চওড়া এক ফালি কাঠ খুঁজে পেল ড্যান কোয়ান।

বর্গলদাবা করে বিগ জুলিয়াকে কাঠ নিয়ে আসতে দেখে রীতিমত বিমূঢ় বোধ করল এরিক। পাথরের কাছে এসে ওগুলো নামিয়ে রাখল মহিলা, তারপর ফিরে গেল আরও আনতে। একটা শব্দও উচ্চারণ করল না, কিংবা একবার তাকালও না কারও দিকে। কাঠ নিয়ে ফিরে আসার সময় হঠাৎ মেলানির দিকে ফিরল জুলিয়া, বলল: 'মেলানি, এবার বোধহয় আমাদের ধরতে আসবে ওরা।'

অস্বাভাবিক কোমল কণ্ঠ, অনুভূজিত, নিঃসঙ্কেচ। চোখে প্রশ্ন নিয়ে এরিক ক্রেবেটের দিকে তাকাল মেলানি, বুঝতে পারছে না আসলেই সত্যি বলেছে কি-না জুলিয়া।

ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে ওরা। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেও আগুনটাকে জিইয়ে রাখতে সক্ষম হলো। রাইফেল নিয়ে পাথুরে চাতালে চলে এসেছে এরিক, শত্রুদের উদ্দেশে পাল্টা গুলি করছে আন্দাজের উপর। বন্দুকের গানফ্যাশ দেখেছে, এমন আশ্রয় বা ঝোপের উদ্দেশে গুলি করছে। একবার লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হলো ও, আর্তনাদটা সবাই শুনতে পেল, তারপর ক্ষণিকের জন্য একেবারে শান্ত হয়ে গেল সব।

লকলক করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা, নীল আকাশের পটভূমিতে লালচে-সোনালি রঙ ধারণ করেছে। আশপাশে কয়েক ফুট পর্যন্ত সব জায়গা দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে উঠেছে। গোলাগুলি চলছে সমানে।

দূরে, পাহাড়ী আলোর ঔজ্জ্বল্য কমে এসেছে। সত্যি কি বন্ধুভাবাপন্ন কেউ জ্বালিয়েছে ওটা? এতদূর থেকে ওটাকে ওদের কাছে মনে হচ্ছে এমন একটা সঙ্কেত, যেটা বাড়ি, নিরাপত্তা, বন্ধু বা মুক্তির উপায় নির্দেশ করছে। তবে মনে যাই হোক, বাস্তবের সঙ্গে এর আকাশ-পাতাল ফারাক। ওদের আগুনটা দেখেছে তারা? কিংবা দেখলেও কি গুরুত্ব দেবে কেউ?

গুলির শব্দ আর গানফ্ল্যাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে আগের চেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে অ্যাপাচিরা। ছোট্ট জায়গাটাকে ঘিরে অবস্থান নিয়েছে এরিকরা, পাল্টা গুলি করছে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা টার্গেটকে নিশানা করে।

‘চালিয়ে যাও,’ চিডলকে বলল এরিক। ‘আগুন দেখতে না পেলেও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাবে ওরা। বাতাস একেবারে পরিষ্কার।’

তারপরও এটাকে দুরাশাই বলা চলে। সকালের মধ্যে ওদের ঘেরাও করে ফেলবে ইন্ডিয়ানরা। ভোরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে ওরা, আগুনটা নিশ্চই নিভে যাবে তখন। প্রতিটি লোক থাকবে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত; অথচ পুরো একটা দিন পড়ে থাকবে সামনে। সারাটা দিন কি অ্যাপাচিদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওরা?

যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এরিকের মনে। চূড়ান্ত ব্যাপারটা কালই ঘটবে।

‘কেউ আমাদের সঙ্কেত দেখতে পাবে বলে ভড়কে যাবে ওরা,’ বলল এরিক। ‘কারও না কারও চোখে পড়বে নিশ্চই। ঝুঁকিটা নেবে না ওরা, কাল সকালে চূড়ান্ত হামলা করবে, যাতে কেউ এখানে পৌঁছানোর আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে পারে।’

হঠাৎ চেষ্টা উঠল বিগ জুলিয়া। কর্কশ, চাপা চিৎকারটা শুনে চমকে উঠল সবাই। দ্রুত জুলিয়ার দিকে ফিরল ওরা, দেখল সতর্ক পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে জেফ কেলার। ভারী স্যাডল ব্যাগ দুটো দখল করে ফেলেছে সে। ডান হাতে বিশাল একটা কোল্ট শোভা পাচ্ছে, সবক’টা দাঁত বের করে হাসছে সে।

‘আগুনটা যেখানেই থাকুক,’ বলল বিশালদেহী সৈনিক। ‘এর মানে হচ্ছে আগুনের পাশে লোকজনও আছে। আর যেখানে লোক আছে, সেখানেই যেতে চাই আমি। সাহায্য পাব তা হলে।’

‘সব সোনা ফিরিয়ে দাও ওকে,’ নির্দেশ দিল এরিক। আচমকা বরফশীতল হয়ে গেছে ওর কণ্ঠ, চাহনি কঠিন। ‘পিস্তল ফেলে দাও, কেলার। তারপর চাইলে চলে যেতে পারবে তুমি।’

‘গোল্লায় যাও তুমি!’ সখেদে খেঁকিয়ে উঠল সে। পায়ে পায়ে ঘোড়ার কাছে চলে যাচ্ছে সে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপানো রয়েছে। ‘চাইলে থাকতে পারো তুমি, ক্রেবেট, কিন্তু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে রাজি নই আমি।’

এরিকের উপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি সে, হাসিও ম্লান হয়নি; কোন্টের নল স্থির হয়ে আছে এরিকের পেট বরাবর। পিছিয়ে যেতে যেতে সবার উপর নজর রাখছে কেলার, হস্তগত হওয়া সোনা আর একটা ঘোড়া দখল করার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া এ-মুহূর্তে কিছুই নেই তার মনে।

স্থিরদৃষ্টিতে তাকে দেখছে এরিক, নিশ্চিত জানে একটা সুযোগ আসবেই। কিন্তু কেলার অতি সতর্ক মানুষ। লাথি মেরে জুলিয়ার শটগানটা দূরে ঠেলে দিয়েছে। এরিকের মত অন্যরাও জানে বিনা দ্বিধায় যে-কাউকে খুন করবে কেলার, কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেবে না নিজের পথে

অন্যদের উপর দৃষ্টি রেখেই স্টিরাপে পা রাখল সে, শরীরে মোচড় তুলে উঠে পড়ল স্যাডলে। এদের যে-কেউ বিপজ্জনক শত্রু হয়ে উঠতে পারে, মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায়নি কেলার, সবার উপর চোখ রেখেছে, কাউকে কোন সুযোগ দিচ্ছে না; কিন্তু নিজের মাথাটা যে নিচু রাখতে হবে, অতি সতর্কতার কারণে বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে।

ঘোড়াটা প্রথম লাফ দিয়েছে, এসময় পাথরের আড়াল থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, এবং বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল জেফ কেলারের দেহ। দৌড়ের মধ্যে পাথরসারি ছাড়িয়ে বালির কাছে চলে গেল ঘোড়াটা, তখনই স্যাডল থেকে হুড়মুড় করে পড়ে গেল বিশালদেহী সৈনিকের মৃতদেহ, তবে পুরোপুরি খসে পড়ল না, স্টিরাপে একটা পা আটকে রয়েছে।

কেলারকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ঘোড়াটা, কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পর ভারী শরীরের চাপে একপাশে হেলে পড়ল স্যাডলটা, ছেঁচড়ে নেমে এল। থেমে গেল ঘোড়াটা। স্টিরাপে এখনও এক পা

আটকে আছে কেলারের।

দৌড়ে পাথরের কাছে চলে গেল ডুগান। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ সবাই? সোনাগুলো হাতছাড়া করা যাবে না!'

'চুলোয় যাক সোনা!' ত্যক্ত স্বরে বলল এরিক। 'ওই ঘোড়াটা দরকার আমাদের।'

পাথরের ফাঁক গলে ছুটে চলেছে মার্ক ডুগান। পিছন থেকে চিৎকার করে তাকে থামানোর প্রয়াস পেল এরিক। 'ফিরে এসো, ডুগান! নইলে তোমাকেও নিকেশ করে ফেলবে ওরা!'

কে শোনে কার কথা! হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে মার্ক ডুগানের। মুহূর্তের জন্য সামান্য দ্বিধা করল সে, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল খোলা জায়গায়, ঢাল পেরিয়ে এক দৌড়ে চলে গেল দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াটার কাছে। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ঘোড়াটা, কিন্তু হাঁটু গেড়ে ওটার পাশে বসে পড়ল ডুগান, দ্রুত হাতে স্যাডল ব্যাগের বাঁধন খুলতে শুরু করল।

এদিকে বসে থাকেনি এরিকরা। রাইফেল হাতে ডুগানকে কাভার করছে এরিক, ডেভিস আর ড্যান। উল্টোদিক থেকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে টনি চিডল, মিচেলের রাইফেল হাতে ওর পাশে অবস্থান নিয়েছে মিমি রজার্স।

উন্মত্ত হয়ে গেছে ডুগান। ঝাঁকি দিয়ে স্যাডল ব্যাগের বাঁধন মুক্ত করল, তারপর ফিরে আসার চেষ্টা না করে এক টানে পেটি টিলে করে উন্মত্ত করে ফেলল ঘোড়ার পিঠ। এবার এক লাফে স্যাডলহীন ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসল সে। নির্দয়ভাবে বুট দিয়ে আঘাত করল ওটার পাজরে, চমকে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা।

'আস্তু বেকুব!' রাগে কেঁপে উঠল এরিকের কণ্ঠ। 'পালানোর চেষ্টায় আছে ও!'

সন্ত্রস্ত খরগোশের মত ছুটছে ঘোড়াটা। নিচু স্বরে খিস্তি করল বেন ডেভিস। 'উচিত কাজই করেছে! ঠিকই পালিয়ে যেতে পারবে ও! বেকুব আসলে আমরাই, এখানে বসে থেকে অপেক্ষায় আছি ঈশ্বরের

কৃপায় হয়তো মুক্তি পেয়ে যাব!’

খোলা মরুভূমি ধরে তুফান বেগে ছুটছে ঘোড়াটা, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, এসময় গুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা। একটা-দুটো নয়, অসংখ্য রাইফেলের গর্জনে কেঁপে উঠল এলাকার নিস্তরঙ্গ বাতাস। যেন অদৃশ্য কোন দৈত্য হ্যাঁচকা টান দিয়েছে পিছন থেকে, মুহূর্তে স্যাডলচ্যুত হলো ডুগান। বালির উপর পড়ে ছিটকে সরে গেল কয়েক গজ, তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা। পরমুহূর্তে এক লাফে খাড়া হলো ডুগান, ঘুরেই ছুটতে শুরু করল ওদের দিকে, যেন বোধোদয় হয়েছে; পিছনে আধ-চক্র ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা, ফিরে তাকাল অদ্ভুত সওয়ারীর দিকে।

মরিয়া চেষ্টায় দৌড়াচ্ছে ডুগান। ওদের কাছ থেকে বেশ দূরে রয়েছে সে, ফিরে আসতে পারবে না বুঝতে পেরে কৃপের পাদদেশে পাথরের চক্রের উদ্দেশে ছুটছে।

‘সম্ভবত পৌঁছে যাবে ও!’ বলল ড্যান।

‘পারবে না,’ মাথা নাড়ল এরিক। ‘সামান্য সম্ভাবনাও নেই ওর। ওকে নিয়ে খেলছে অ্যাপাচিরা, মওকা পেয়ে মজা লুটছে। কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তবে গুলি করবে।’ বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেলানি। ‘এটাই ঘটবে, দেখো,’ যোগ করল এরিক। ‘কোন চান্সই নেই ডুগানের।’

এদিকে ছুটে চলেছে ডুগান, ক্লান্তি ভুলে গেছে যেন। ঢালের গোড়ায় পৌঁছে গেছে প্রায়, আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, নরম বালির উপর গড়ান খেল দেহটা। পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াল সে, টলমল পায়ে এগোল দুই কদম, দৃষ্টি নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। বুলেটে ফুটো হয়ে গেছে একটা স্যাডল ব্যাগ। সোনা নয়, বালি আর ছোট ছোট নুড়িপাথর গড়িয়ে পড়ছে ফুটো দিয়ে!

বরফের মত জমে গেছে যেন, স্থির দাঁড়িয়ে আছে ডুগান। বেকুব বনে গেছে। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পাথুরে চাতালের দিকে তাকাল।

অবিশ্বাসে উন্মত্ত হয়ে গেছে ডুগান, অন্য স্যাডল ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। ভিতরের সবকিছু উজাড় করে দিল বালির উপর, কিন্তু লাভার ছোট ছোট চাঙড়, বালি আর নুড়িপাথর ছাড়া কিছু বেরোল না। এক রত্তি সোনাও নেই! হঠাৎ নিজের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হলো সে—এই প্রথম—খোলা জায়গায় রয়েছে; ঝট করে সিধে হলো, চকিত দৃষ্টি হানল চারপাশে। আশপাশে কেউ নেই, নিরাপদ আড়াল থেকে অন্তত ষাট গজ দূরে রয়েছে।

মূল্যহীন ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ডুগান। এখন আর অতটা জোর নেই, দৌড়াচ্ছেও টলমল পায়ে। পাথুরে চাতাল থেকে এরিকরা দেখতে পেল মরিয়্যা চেপ্টার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মার্ক ডুগানের মুখে, ক্লান্তির চেয়ে হতাশাই বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। ঢালের উদ্দেশ্যে ছুটল সে, মনে হলো পৌঁছতে সক্ষম হবে, তখনই খুব দ্রুত তিনটা গুলির শব্দ হলো। হঠাৎ যেন পিছন থেকে খামচে ধরেছে কেউ, আচমকা স্থির হয়ে গেল ডুগানের দেহ, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, আধ-পাক ঘুরে যাওয়ার পর সটান হেলে পড়ল পিছনে। গড়িয়ে ঢালের নীচে চলে গেল লাশটা।

‘বোকা! তোমরা সবাই আস্ত বোকা!’ আঙুল তুলে দেখাল বিগ জুলিয়া, হিস্টরিয়াগ্রস্তের মত শোনাচ্ছে কণ্ঠ। ‘দেখো! ভাল করে দেখে নাও!’ দৌড়ে পাথরসারির কাছে চলে গেল ও, ক্যানভাসের টুকরো সরিয়ে দিল এক টানে। ‘আমাকে কী মনে করেছে, এতই বোকা? সময়মত সোনা সরিয়ে ফেলেছি, বালি আর পাথরের জন্য অহেতুক জীবন বিলিয়ে দিল ওরা!’ কর্কশ স্বরে হাসতে থাকল মহিলা, হাসিটা পুরুষদের অউহাসির মতই শোনাতে ওদের কানে।

হতচকিত চোখে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে মেলানি। কজি চেপে ধরে ওর মনোযোগ অন্য দিকে ফেরাল এরিক, বলল ‘মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। একেবারে পাগল হয়ে গেছে!’

সহসা মুহূর্মুহ গর্জে উঠল টনি চিডলের বন্দুক, লক্ষ্যে গুলি বেঁধার ভোঁতা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল পিমা

ইন্ডিয়ান, তারপর আরও একবার গুলি করল, আগের চেয়ে একটু নিচুতে। ওর লক্ষ্য, উদ্দিষ্ট ঝোপটা সামান্য নড়ে উঠল, যেন হাত দিয়ে সরিয়েছে কেউ, শেষে একেবারে স্থির হয়ে গেল।

কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। নিচু দিয়ে বইছে বাতাস, ব্যস, এই হচ্ছে প্রকৃতির সাড়া।

‘এরিক,’ ফিসফিস করল মেলানি। ‘মনে হলো দূরে...বহু দূরে ধুলোর ঝড় দেখতে পেয়েছি!’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওরা। বুঝতে পারছে না। কয়েকটা ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ন্ত বালি দেখতে পাচ্ছে, নাকি ছোট বায়ুপ্রপাত? মরুভূমিতে এমন বালি-ঝড় সবসময়ই চোখে পড়ে। তাপতরঙ্গের কারসাজি নয়তো? নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা, একসময় ক্লান্তিতে ব্যথা বোধ হলো চোখে, কিন্তু আর কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি।

হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হলো আবার। বালি চটকাচ্ছে গুলি, কিংবা পাথরে লেগে ছিটকে যাচ্ছে। দ্রুত জায়গা বদল করছে এরিক, কোথাও থাকছে না বেশিক্ষণ, নড়াচড়া চোখে পড়লে বা সম্ভাব্য কাঁভার দেখামাত্র গুলি করছে। যেন ছায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, কিন্তু জানে যে ওদের প্রতিরক্ষার ছোট ব্যুহ যদি ভেদ করতে সক্ষম হয় অ্যাপাচিরা, নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সবাই। আচমকা সবাই মিলে যদি ছুটে আসে, হয়তো পতন হবে ওদের। জ্বলন্ত আগুনটা কারও দৃষ্টিগোচর হলে সাহায্য পাবে, এই আশাও চিরতরে নিভে যাবে তা হলে।

গোলাগুলির তীব্রতা কমে এসেছে, আগের চেয়ে সতর্কতার সঙ্গে গুলি করছে অ্যাপাচিরা। মাত্র দু’একটা রাইফেলের গর্জন শোনা যাচ্ছে এখন, একটু পর ওগুলোও নীরব হয়ে গেল। কোন তীর ছুটে এল না। হঠাৎ করেই নিজেদের চারপাশে অস্বস্তিকর নীরবতা আবিষ্কার করল এরিকরা।

আশাহতের দৃষ্টিতে মরুভূমির দিকে তাকাল বেন ডেভিস, মনটা তেতো হয়ে আছে। শন্য মরুভূমি। কোথাও কিছু নেই। ঠিক ওর মনের

মতই। সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙে গেছে। এই কদিন আগেও অ্যারিজোনার সবচেয়ে সুন্দরী, কাজিতা ও ধনী মেয়েটির স্বামী হওয়ার সুযোগ ছিল ওর, কিন্তু কখন যে ফস্কে গেছে সুযোগটা! ওর কথা ভুলেই গেছে মেলানি। এর পিছনে আছে একজনই—এরিক ক্রেবেট।

অন্ধকার, অনিশ্চয়তায় ভরা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য। পশ্চিমের সবচেয়ে ঘৃণ্য পেশায় ফিরে যেতে হবে—জুয়ার আড্ডার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাটাতে হবে টাকা কামানোর ধাক্কা, ঘামের দুর্গন্ধে ভরা নোংরা কিন্তু বেপরোয়া কিছু মানুষের পকেট খালি করার ফিকির করতে হবে সর্বক্ষণ; এত বিপজ্জনক জীবন যে যে-কোন দিন হয়তো ওর চেয়ে সেয়ানা কারও সামনে পড়ে যাবে, পিস্তলটা হয়তো সেদিন অত দ্রুত উঠে আসবে না হোলস্টার থেকে। সেদিন শেষ হয়ে যাবে বেন ডেভিসের সমস্ত জারিজুরি! জীবনে কখনও এই একটা জিনিসে অবহেলা করেনি সে—বরাবর চোখের পলকে পিস্তল ড্র করেছে। এ-মুহূর্তে এটাই ওর একমাত্র অবলম্বন কিংবা অবশিষ্ট সম্পদ।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল সে। মাত্র কয়েকজনই বেঁচে আছে এখন। পিছনে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে সত্তর হাজার ডলারের সোনা, ওগুলো পেলে সান ফ্রান্সিসকোয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারবে যে-কেউ। পছন্দমাত্রিক ব্যবসায় খাটাতে পারবে। সত্তর হাজার থেকে সত্তর বিলিয়নের মালিক হওয়াও বিচিত্র নয়, যদি সঠিক জায়গায় খাটানো যায়।

মরুভূমিতে কোথাও কিছু নড়ছে না।

ক্রেবেট। এই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া! ক্রেবেট বাগড়া না দিলে মেলানিকে নিয়ে অনেক আগেই ইয়োমায় পৌঁছে যেত। আপদটাকে বিদায় করতে পারলে পরিস্থিতি হয়তো বদলে যেতেও পারে। না বদলাক, কিছু উন্নতি যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মেলানিকে বোঝানো কঠিন হবে না, ক্রেবেট না থাকলে ওর কর্তৃত্ব মেনে নেবে মেয়েটা। মিমি রজার্স বা ড্যান কোয়ান কোন ব্যাপারই নয়। ওদেরকে নরকে

সামাল দিতে সমস্যা হবে না। টনি চিডল আছে অবশ্য, তবে হলুদ চামড়ার এই ব্যাটাকে এ-পর্যন্ত কেউই তেমন আমল দেয়নি; আর আছে জুলিয়া-এতক্ষণে বন্ধ পাগল বনে না গেলেও বনতে দেরিও নেই।

লেনদেন শেষ হয়নি এখনও, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরও দু'একজন যদি মারা পড়ে, এমন কিছু হেরফের হবে না।

গতরাতে দূরের এক পাহাড়ে আগুন দেখেছিল ওরা। হয়তো সত্যি কেউ ছিল ওখানে। ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে; তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত বেন ডেভিস-শুরুতে যা ছিল, এ-মুহূর্তে এরচেয়ে অনেক কম ইন্ডিয়ান আছে চারপাশে। একটু আগে প্রচণ্ড গোলাগুলির সময় একজন খুন হয়েছে ওর হাতে, নিশ্চিত বেন, অন্যরাও ছাড় দেয়নি। গত এক ঘণ্টায় অ্যাপাচিদের পক্ষ থেকে খুব কমই গুলি ছুটে এসেছে।

আশপাশে অপরিষ্কার আড়ালের কারণে প্রায় সমস্ত এলাকাই ওদের দৃষ্টিসীমায় ছিল, এমন কোন জায়গা ছিল না যেটা ওদের চোখে পড়ছে না; তা ছাড়া, গত কয়েকদিনে যথেষ্ট গোলাগুলি হয়েছে। বিপদের সম্ভাবনা এখন অনেক কেটে গেছে।

জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন চট করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যুদ্ধের পর দ্বিধা করেনি বেন ডেভিস, সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্র ঝটপট খামার বিক্রি করে পশ্চিমের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। মেলানি রিওসকে দেখে এরকম দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল; সান ফ্রান্সিসকোয় না গিয়ে মেলানির সঙ্গী হয়েছে। এখন ঠিক ওরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে: নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার প্রেরণা হিসাবে রয়েছে সত্তর হাজার ডলারের সোনা এবং কাজিফতা এক নারী। সম্ভবত যে-কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। তবে একটু চালাকি করলে হয়তো দুটোই পেতে পারে। কাজ উদ্ধারের জন্য হাতিয়ার হিসাবে রয়েছে প্রিয় সিক্স-শূটারটা।

পিস্তল তুলে ট্রিগার টিপে দিলেই হয়! প্রলোভনটা উপেক্ষা করা

দুঃসাহ্য মনে হলো বেনের কাছে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন হবে ব্যাপারটা। কিন্তু খুন আগেও করেছে সে। যুদ্ধের সময় যারা মারা গেছে, কিংবা এখানে যে-সব ইন্ডিয়ান ওদের হাতে মারা গেছে, সবই তো খুন। ধরা যাক; ও ছাড়া অন্য কেউ যদি বেঁচে না থাকে? অস্বাভাবিকতা নেই এতে, কারণ ওরা সবাই মারা পড়তে পারে, এমনকী ও-ও এর বাইরে নয়। মাত্র একজন বা দু'জন যদি শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকে, আসলে কী ঘটেছে কারও পক্ষে নিশ্চিত বলা সম্ভব?

ফাঁকা দৃষ্টিতে বালির দিকে তাকাল বেন। অতীত অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। ইচ্ছে করেই বাবার স্মৃতি ভুলে থাকে ও। বুড়োর মুখটা স্পষ্ট মনে পড়ল। এখন যে-কাজটা করতে যাচ্ছে বেন, বুড়ো যদি ছেলের এই ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলত ওকে। তবে এমন পরিস্থিতিতেও কখনও পড়েনি বুড়ো। সবকিছু এখন নির্ভর করছে হাতের পিস্তল আর ওর উপর।

কোথাও কোন সাড়া নেই। নড়াচড়া, এমনকী বালিঝড়ও নেই। হলদেটে বর্ণ ধারণ করেছে আকাশ, জীবনে কখনও এমন দেখেনি বেন, মনে হচ্ছে গড়পড়তার চেয়ে অনেক উঁচু, বিশাল এবং শূন্য আজকের আকাশ। হলুদ বিশাল এক গোলক যেন।

‘বালিঝড় আসছে!’ পিছনে এরিক ক্রেবেটের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। ‘মারাত্মক বিপদ হতে পারে।’

বালিঝড়...এমন ঝড়ে সমস্ত ট্র্যাক, ট্রেইল, এমনকী মানুষও চাপা পড়ে। মরুভূমির একটা অংশের পুনর্জন্ম হয় যেন, ঝড়ের আগের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, পুরো বালির নীচে চাপা পড়ে যায়।

সময় আছে। অপেক্ষা করতেই মনস্থ করল বেন ডেভিস।

ষোলো

ঝলসাচ্ছে সকালের সূর্য...চোখ টাটিয়ে দেওয়ার মত উজ্জ্বল রোদ; চোখের জন্য ক্লান্তিকর এই উজ্জ্বলের ঘন শেষ হবে না। কিন্তু বাতাসের টানে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে বালি, এমনকী পাহাড়ের কাঠামোও ঢাকা পড়ে গেছে এখন। অচিরেই সূর্যকে ঢেকে ফেলল, কিন্তু স্বাভাবিক উত্তাপ রয়ে গেছে। ভারী চাদরের মত ঘিরে থাকল জায়গাটাকে, উপরে হলদেটে আভা জুড়ে আছে সমগ্র আকাশ। চারপাশে নিঃসীম নীরবতা।

একটা পাখিও উড়ছে না...মাটিতে আনাগোনা নেই কোন গিরগিটির...দূরের আড়ালে নিশ্চুপ হয়ে গেছে কোয়েলগুলো। কেবল একটা জিনিসই আছে এখন—নিস্তব্ধতা। অটুট নীরবতা।

মরুভূমিতে চলন্ত মানুষের জন্য বালিঝড় সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু...উড়ন্ত বালি ঢেকে ফেলে আকাশ আর মাটি, দিগন্ত হারিয়ে যায় দৃষ্টিসীমা থেকে, ট্রেইল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; ছোট, আবদ্ধ এক পৃথিবীতে আটকা পড়ে হতভাগ্য মানুষ—বড়জোর কয়েক বর্গফুট এলাকা চোখে পড়ে। বিপদ বা আতঙ্ক কী জিনিস, বালিঝড়ে পড়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুমান করা মুশকিল; উত্তাপ তো রয়েছেই, দুর্ভোগের ষোলোকলা পূর্ণ হয় উড়ন্ত বালির আঘাতে, বেশিরভাগ সময় যা সহ্যের অতীত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে স্রেফ অসহায় বোধ করবে অনভিজ্ঞ যে-কোন লোক।

ছোট ছোট প্রাণী, এমনকী ক্ষুদ্র পোকারাও চলে যায় নিরাপদ

আশ্রয়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ঘোড়া। উড়ন্ত শ্বাসরোধী বালির আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু আসলে উত্তাপ, বাতাস বা বালি নয়, বরং আতঙ্কই ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। শ্বাসকষ্ট, লাগাতার কাশি, অতিরিক্ত নিঃশ্বাস...সেই সঙ্গে রয়েছে সীমাহীন উদ্বেগ, স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে হিতাহিত জ্ঞান হারানোর আশঙ্কা।

মানুষের অনুভূতি আসলে বড় ভঙ্গুর, স্পর্শকাতর জিনিস; কখনও কখনও বিশ্বাসভাজন হতে পারে, কিন্তু বরাবরই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে রয়েছে দিগন্ত, সীমানা, পরিমাপ আর নিয়ম-কানুনের সম্পর্ক। এগুলোর হিসাব-নিকাশ থেকে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা নেয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। বালিঝড়ের সময় দিগন্ত হারিয়ে যায়, তাই নিয়ম-কানুনের প্রশ্ন এখানে অবাস্তব। কাছে বা দূরের কোন ব্যাপার থাকে না, উঁচু-নিচু কিংবা ঠাণ্ডা-গরম সম্পর্কেও ধারণা করা যায় না, বাতাসের গর্জন আর তীব্র ধাক্কা-শুধু এই অনুভব করা যায়, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টন উড়ন্ত বালির হুল ফোটানো যন্ত্রণা। কেউ কেউ বালির সাগরের নীচে চাপা পড়ে যায়, আক্ষরিক অর্থে সাগর বলা যায়—কারণ চলমান বালির এই সাগরের উপরিভাগ থাকে কয়েক মাইল উপরে; কেউ বা গলায় বালি আটকে কাশতে কাশতে মারা পড়ে, কিংবা চার হাত-পায়ে মাটিতে ক্রল করার সময় বালি গিলে ফেলে। বালি, বাতাস বা শ্বাস নিতে লাগাতার চেষ্টাও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এমন একটা ঝড়ই আসছে এখন।

এ-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই এরিক ক্রেবেটের মনে। জানে কী ঘটতে পারে। উড়তে শুরু করেছে ধুলো, আয়নিত বাতাসের স্পর্শে বিদ্যুৎ তৈরি হলো ওর চুলে, মুহূর্তের জন্য খাড়া হয়ে গেল কয়েকটা চুল, স্পষ্ট টের পেল এরিক। আকাশের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টি এড়ায়নি ওর, বুঝে নিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে ভয়ঙ্কর বালিঝড়। টেনে-হিঁচড়ে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এল ওরা, জান বাঁচাতে ছুটতে চাইছে ওগুলো, সামলে রাখতে গলদক্ষম হতে হলো ওদের।

অবলা প্রাণীগুলো জানে না পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই কোথাও।

বিস্ফারিত, শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেলানি। 'কী এটা, এরিক? কী ঘটছে, বলো তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বালিঝড় আসছে,' দ্রুত বলল এরিক। 'ড্যান, ডেভিস...সব ক্যান্টিন জলদি ভরে ফেলো। ঝটপট! চিডল, ঘোড়াগুলোকে নীচে নিয়ে যাও। একসঙ্গে রেখো সবগুলোকে।'

'ইন্ডিয়ানরা যদি আক্রমণ করে?' মনে করিয়ে দিল মিমি।

'ওদের নিয়ে না ভাবলেও চলবে। প্রাণ বাঁচাতে আমাদের মতই ব্যস্ত থাকবে ওরা। জলদি!'

দ্রুত কাজ শুরু করল ওরা, আতঙ্ক প্রেরণা যোগাচ্ছে। মরুভূমির এই অদ্ভুত, সুবিশাল শূন্যতা টের পাচ্ছে, বিশাল একটা বাটির তলায় আটকা পড়া ক্ষুদ্র পোকাকার মত মনে হচ্ছে নিজেদের। শুধু এরিক আর টনি চিডলের অভিজ্ঞতা রয়েছে বালিঝড় সম্পর্কে, অন্যরা হয়তো শোনেওনি কখনও। আলাগা বালির মরুভূমিতে বালিঝড় যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, জানে ওরা।

চারপাশে বালিয়াড়ি। ঝড়ের হাওয়ায় উড়াল দেওয়ার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে টনকে টন উত্তপ্ত বালি। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে অ্যারোয়োর তলায় চলে এল এরিক, চিডল সাহায্য করছে ওকে। ঘোর লাগা মানুষের মত কাজ করছে অন্যরা, ক্যান্টিন ভরছে একটা একটা করে। ব্যতিক্রম শুধু জুলিয়া, ঠায় বসে আছে সে...দুনিয়ার কোন কিছুতে যেন কিছু যায়-আসে না ওর। একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন অন্যরা সবাই নীচে চলে গেছে, বিগ জুলিয়ার কাছে চলে গেল এরিক। 'চলো, জুলিয়া, নীচে আশ্রয় নেব আমরা।'

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল জুলিয়া, চাহনিত শূন্য দৃষ্টি। 'না, এখন নয়।'

ইতস্তত করল এরিক, শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ ক্যান্টিনটা নিয়ে কূপের কাছে চলে এল। পানি ভরার পর, পাথুরে চাতালে এল। আগুন নিভে গেছে। আধ-পোড়া কয়েক টুকরো কাঠ পড়ে আছে, ওগুলো তুলে

নিয়ে অ্যারোয়োয় নেমে এল ও ।

পাথরসারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেন ডেভিস, চকিত দৃষ্টি চালাল চারপাশে । বিগ জুলিয়া ছাড়া আশপাশে আর কেউ নেই, স্থির দৃষ্টিতে হলদেটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা; দুনিয়ার কোন কিছুতে আগ্রহ বা মনোযোগ আছে বলে মনে হয় না । হাঁটু গেড়ে বসে দ্রুত কাজ শুরু করল ডেভিস, পরনের শার্টের নীচের অংশ খলের মত বানিয়ে দ্রুত হাতে আজলা ভরে সোনা ঢোকাতে শুরু করল, তারপর ওগুলো এনে রাখল স্যাডল ব্যাগে । মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ, নির্বিঘ্নে সেরে ফেলল সে । জুলিয়া ফিরেও তাকায়নি কিংবা দেখেও মনে হয়নি ওর তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন । স্যাডল ব্যাগ দুটো নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল ও । পাথরসারির কাছে ছোট্ট একটা গুহা আছে, এ ক'দিন এটাকে আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করেছে ওরা, ওটার খোলা মুখের কাছে ব্যাগ দুটো নামিয়ে রাখল ডেভিস ।

একেবারে সঙ্কীর্ণ গুহাটা, কয়েক ফুট হবে বড়জোর, একপাশে কোন দেয়াল নেই, মেস্কিট ঝোপ আড়াল তৈরি করেছে খোলা মুখে । ঝোপের পিছনে ঘোড়াগুলোকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে ওরা, যাতে চাইলেও লাফালাফি করতে না পারে ওগুলো ।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল এরিক, পায়ের উপর খাড়া হলো, কান খাড়া । দূরে, সঙ্কীর্ণ একটা শব্দ, ক্রমে জোরাল হচ্ছে; যেন বহু দূরে প্রচণ্ড গর্জন করছে বিশাল কোন ম্যামথ । 'আসছে ওটা,' দ্রুত বলল ও । 'পাথরের কাছে চলে যাও সবাই ।'

উপরে অ্যারোয়োর পথের দিকে এগোল ও । পিছন থেকে ছুটে আসছে মেলানি । 'এরিক, যেয়ো না!'

গায়ের জোরে চেষ্টা করল এরিক, বাতাসের গর্জনে প্রায় চাপা পড়ে গেল ওর কণ্ঠ । 'জুলিয়া!'

কোন উত্তর এল না ।

দৌড়ে উপরে উঠে এল এরিক, পিছু পিছু মেলানিও এসেছে । উপরে উঠে চারপাশে তাকাল, কেউ নেই । জুলিয়ার পাত্তাও নেই!

দ্রুত পাথুরে চাতালের দিকে এগোল এরিক, উঠে এল চ্যাপ্টা পাথরের উপর। চারপাশে তাকাতে দেখতে পেল জুলিয়াকে, হাত তুলে দেখাল মেলানিকে।

নিখাদ আতঙ্ক নিয়ে তাকাল মেলানি। অন্তত দু'শো গজ দূরে, নাক বরাবর দক্ষিণে এগোচ্ছে জুলিয়া, এক মনে হেঁটে যাচ্ছে। ভারী শরীর আর চওড়া কাঁধ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু ভঙ্গিটায় নিজস্ব মর্যাদাবোধ রয়েছে; মস্তুর গতিতে, অথচ টানা হেঁটে চলেছে, সামান্য দ্বিধাও নেই। সামনে ধুলো ঝড়, আরও সামনে পিনাকেট আর উপসাগরের বিস্তীর্ণ নিঃসঙ্গতা।

গলা ফাটিয়ে চাঁচাল এরিক, কিন্তু নিজেও জানে শুনতে পারে না জুলিয়া; হয়তো শুনতে পেলেও ফিরে তাকাত না। বাতাসের জোর আরও বেড়ে গেছে, কানের কাছে যেন গর্জাচ্ছে কোন হিংস্র পশু।

'এরিক!' মিনতি করে পড়ল মেলানির কণ্ঠে। 'যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে ওকে! বেচারী নির্ঘাত মারা পড়বে! এভাবে ওকে চলে যেতে দিতে পারি না আমরা!'

'সম্ভব নয়!' মেলানি যাতে শুনতে পায়, চিৎকার করতে হলো এরিককে। 'দেরি হয়ে গেছে।' আঙুল তুলে খোলা মরুভূমির দিকে নির্দেশ করল ও। মাইল খানেক কিংবা বড়জোর দুই মাইল দূরে, উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে ছুটে আসছে বালিঝড়, প্রায় হাজার ফুট উঁচু; আগে আগে আসছে লতা-পাতা-গড়ান খাচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে কিংবা আছাড় খাচ্ছে বাতাসে-অদ্ভুত একটা দৃশ্য! সঙ্গে রয়েছে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস।

মেলানির কজি চেপে ধরে পাথরসারির দিকে ছুটতে শুরু করল এরিক। বড়সড় একটা পাথরের কাছে এসে ক্ষণিকের জন্য থামল ও, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল, খোলা জায়গায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে বালি ঢুকে যাবে বলে এতক্ষণ শ্বাস নেয়নি। 'দুঃখ করো না! আসলে এ ছাড়া কিছুই করার ছিল না ওর। বেঁচে থাকার জন্য একটা অবলম্বন লাগে, কী বাকি ছিল ওর জন্য?' মেলানির কানের পাশে চিৎকার করল

এরিক। ‘খুনের জন্য না হলেও অন্তত লুটের অভিযোগে গ্রেফতার হত
ও, এরচেয়ে কি এটাই কি ভাল হয়নি?’

মেলানিকে নিয়ে আশ্রয়ের দিকে এগোল ও।

অ্যারোয়োর ঢালের নীচে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বসে পড়ল
ওরা, তখনই আঘাত করল তীব্র বাতাস আর বালিঝড়।

*

ড্যান কোয়ানের বাহুবন্ধনে রয়েছে মিমি। কোটটা গায়ে ওর, মাথা আর
মুখ ঢেকে রেখেছে কম্বলে। নির্বিকার মুখে দু’জনকে দেখল বেন
ডেভিস, সামান্য বিকারও দেখা গেল না মুখে। হ্যাটটা প্রায় মুখের
উপর নামিয়ে আনল সে, ফ্রক কোটের কলার তুলে দিল, তারপর
একটা কম্বল টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল। ঘোড়ার কাছাকাছি কম্বল
জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে টনি চিডল, শুধু চোখ দুটো দেখা
যাচ্ছে। একই কম্বলের নীচে এরিকের সঙ্গে মেলানিকে জড়াজড়ি করে
বসতে দেখে টনি বা অন্য কাউকে বিস্মিত মনে হলো না। নিবিড়
আলিঙ্গনে মেলানিকে আবদ্ধ করল এরিক, মেয়েটির শরীরের উষ্ণতা
আর কোমলতা অনুভব করছে। হঠাৎ ওর মনে হলো ওদের জন্য যেন
এটাই স্বাভাবিক, এবং শুধু এখনই নয়—আজীবনই পরস্পরের নির্ভরতা
খুঁজবে দু’জন।

ঝড় চলছে। উদ্দাম, মাতাল বাতাসের সঙ্গে বইছে লক্ষ লক্ষ টন
বালি। শুধু বাতাসের তীব্র ধাক্কা, শৌ শৌ গর্জন শোনা যাচ্ছে; কানে
তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। এমনকী নিজেদের
কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছে না ওরা। মাতাল বাতাসে শুধু বালিই নয়,
বড়সড় নুড়িপাথরও গড়াচ্ছে, ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে, পাথরে পাথরে
সংঘর্ষের শব্দ ভীতিকর শোনাচ্ছে কানে। চোখে আর কানে জমে গেল
বালির পুরু স্তর, গলার গভীরে ঢুকে শ্বাসরোধ করছে। বাতাস ক্রমে
ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে সবাই; তুষারপাতের
সময়ও এত তীব্র ঠাণ্ডা পড়ে না। প্রতিবার নিঃশ্বাসের সময় খাবি খাচ্ছে
ওরা, একইসঙ্গে গলায় বালি যাতে ঢুকতে না পারে সেই চেষ্টা করছে।

বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ওরা। দুবস্ত মানুষের মত পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকল। শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত এবং অসহায়। ঝড়ের তীব্রতা এত বেড়ে গেছে যে, পায়ের নীচে রীতিমত কাঁপছে মাটি, কিন্তু তারপরও কেউ কাউকে ছাড়ল না ওরা। অনেক, অনেকক্ষণ পরে, ঠিক কখন কেউ নিশ্চিত বলতে পারবে না, যখন মন, স্নায়ু এবং শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর কোন ধকল সামাল দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, নিজেদের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

*

হঠাৎ সজাগ হলো এরিক ক্রেবেট, ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত শীতল হয়ে গেছে, কাছাকাছি ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ কানে এল ওর। কম্বল সরিয়ে তাকাল ও, আবিষ্কার করল বালির পুরু স্তরের ভিতর প্রায় অর্ধেকটা চাপা পড়ে গেছে ওরা। বালির পাহাড় সরিয়ে আড়ষ্ট দেহে উঠে দাঁড়াল। প্রথমেই হাত-পা ঝেড়ে আড়মোড়া ভাঙল, দেখল একটু দূরে ঘোড়ার পিঠে স্যাঁদল পরাচ্ছে টনি চিডল।

আধ-পোড়া কাঠ যেখানে রেখেছিল, জায়গাটায় এসে হাত চালিয়ে বালি খুঁড়তে শুরু করল এরিক। 'কোথাও যাচ্ছে?' পিমা ইন্ডিয়ানের উদ্দেশে জানতে চাইল।

'চলে যাওয়াই উচিত মনে করছি,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'সাদা মানুষদের আসতে দেরি নেই।' ঘোড়ার লাগামটা পেঁচিয়ে হাতে নিল পিমা ইন্ডিয়ান। 'এরা হয়তো ইয়োমা থেকে আসছে।'

'বেশ, টনি,' পকেট থেকে এক মুঠো ঘাস বের করল এরিক; গতরাতে এক ফাঁকে তুলে নিয়ে রেখে দিয়েছিল নিজের পকেটে। কাঠের নীচে ঘাস রেখে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর চেষ্টা করল, আড়ষ্ট হাতে অসুবিধা হচ্ছে, তবে শেষপর্যন্ত সফল হলো। প্রথমে ঘাসে আগুন জ্বলল, তারপর কাঠে ছড়িয়ে পড়ল।

সহসা টনি চিডলের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো ও। 'সাদা মানুষ আসছে?'

নড করল সে। 'অনেক দূরে আছে অবশ্য, এখানে পৌছতে বিশ-ত্রিশ মিনিট লাগবে। পাথরের উপর থেকে দেখেছি ওদের।'

থেমে গেল পিমা ইন্ডিয়ান, দেখে মনে হলো মনে মনে জুৎসই শব্দ হাতড়াচ্ছে; শেষে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জড়সড় হয়ে পড়ে থাকা বেন ডেভিসের কাঠামোর দিকে। 'সোনাগুলো উধাও হয়ে গেছে,' মৃদু স্বরে জানাল সে।

'সম্ভবত বালির নীচে চাপা পড়েছে।'

'উঁহঁ।'

তথ্যটা মনে মনে বিবেচনা করল এরিক। একেবারে নিখর পড়ে আছে ডেভিস। পড়ে থাকলেও শুনতে পাচ্ছে নিশ্চই? 'কিছু যায়-আসে না আমার,' শেষে বলল ও। 'তুমি চাও নাকি ওগুলো?'

বরাবরের মতই নির্বিকার দেখাল ইন্ডিয়ানকে। 'উঁহঁ। একটা ঘোড়া, বন্দুক এবং প্রায় বারো ডলার আছে আমার। চাইলেই মদ খেয়ে মাতাল হতে পারব। সোনার মালিক হলে কেবলই ছোট্ট মধ্য থাকতে হয়। কিন্তু সারাক্ষণ কি ছোট্ট যায়? একসময় অন্য কেউ তাকে ঠিকই ধরে ফেলবে।' স্যাডলে চাপল সে, ক্ষণিকের দ্বিধার পর বলল: 'তুমি খুব ভালমানুষ, ক্রেবেট।'

অ্যারোয়োর ঢাল ধরে উঠে গেল সে, একটু পর হারিয়ে গেল অবয়বটা। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল এরিক, শেষে হাঁটু গেড়ে বসে আগুন নেড়েচেড়ে দিল। ফের যখন চারপাশে তাকাল, দেখল অন্যরা নড়েচড়ে উঠেছে। কম্বল ছেড়ে উঠছে বালির বিছানা থেকে। চুল ঝেড়ে ওঅটর হালের কাছে চলে গেল মেলানি, একটা একটা করে তিনটা কূপই দেখল। শেষে দৌড়ে ফিরে এল।

'এরিক! কূপে এক ফোঁটা পানিও নেই! বালি সব পানি শুষে নিয়েছে, প্রতিটা কূপই বালিতে ভরা!'

'জানতাম এটাই হবে। সেজন্যই ক্যান্টিনগুলো ভরে রেখেছি। ঝড়ে বাতাস আর বালি এত শুকনো ছিল যে সমস্ত পানি শুষে নিয়েছে।'

কম্বল ভাঁজ করে স্যাডল তুলে নিল বেন ডেভিস। তার দিকে তাকাল মেলানি, শেষে এরিকের দিকে ফিরল। কিন্তু কিছুই বলল না এরিক।

একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল ডেভিস।

নিজেদের মামুলি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে মিমি আর ড্যান।

আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল মেলানি, উষ্ণতা ভাল লাগছে। কিছুটা দূরে অপেক্ষায় আছে এরিক, আগুনের শিখার উপর দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে।

স্যাডল বাঁধা শেষ করে ওদের দিকে ফিরল ডেভিস।

'কিছু বলছ না যে, ক্রেবেট? তুমি জানো যে সব সোনা আমার কাছে আছে। একটা কিছু বলো!'

চোখ তুলে তাকাল এরিক। নিকট ভবিষ্যৎ স্পষ্ট আঁচ করতে পারছে, অনিবার্য শোডাউন এড়ানো যাবে না আর। তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ ও, লাইন অভ ফায়ারের বাইরে আছে মেলানি, কিন্তু আরও দূরে থাকলেই ভাল হত। পাথুরে দেয়ালের কাছাকাছি রয়েছে ড্যান আর মিমি, ওদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি না করলেও চলবে।

'কিছুই বলার নেই, ডেভিস,' মৃদু, শান্ত স্বরে বলল ও। 'কারণ ওগুলো কার হাতে পড়ল, তাতে পরোয়া করি না আমি।'

'পরোয়া করো না তুমি?'

'কেন করব? ওগুলো কি আমার সম্পত্তি? এমনকী চাইও না। কী জানো, তোমারও কাজে আসবে না ওগুলো। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে তুমিও কারণটা বুঝতে পারবে।'

'কী বলতে চাও?'

'হয়তো ওগুলোকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করার বুদ্ধি এঁটেছ, তবে আসলে কোন কাজে আসবে না। জুয়া খেলেই শেষ করে ফেলবে সব। কিছু জিতবে, কিছু হারবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত একেবারে ফতুর হয়ে যাবে।'

বেন ডেভিসের সমস্ত উৎসাহে ভাটা পড়ল। হঠাৎ উপলব্ধি করল

একটুও ভুল বলেনি এরিক ক্রেবেট। জুয়া খেলেই সব সোনা হারাবে সে, মেলানিকে বিয়ে করতে পারুক বা না-পারুক, কিন্তু জুয়াই শেষ করে দেবে ওকে—সব সোনা হারিয়ে বসবে পোকার খেলতে গিয়ে। তিক্ত উপলক্ষিটা বিষিয়ে তুলল ওর মন, ক্রেবেটের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করল। এই লোকটা, উদ্ধত এই লোকটা ওর মুখোশ খুলে দিয়েছে!

‘অনুमानে ভুল করেছ, ক্রেবেট,’ চেষ্টাকৃত অনুভূত কণ্ঠে বলল সে, কণ্ঠটা অদ্ভুত শোণাল। ‘আসলে প্রায় সবকিছুতেই ভুল অনুমান করেছ তুমি। ভেবেছ মেলানির সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। ভুল! মিথ্যে স্বপ্ন দেখেছ! এখান থেকে কেউ যদি জীবিত বেরিয়ে যেতে পারে, তো সেই লোক হচ্ছে আমি!’

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ড্যান কোয়ান, ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারল এরিক। আশা করল ওদের ব্যাপারে নাক গলাবে না ছেলেটা।

‘পিস্তল খোঁজাখুঁজি করে লাভ হবে না, কিড,’ ড্যান কোয়ানের উদ্দেশে বলল বেন। ‘কাল রাতে ঝড়ের সময় তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে, ওটা নিয়ে নিয়েছি আমি। তোমারটাও নিতাম, ক্রেবেট, কিন্তু একটা কারণে নিইনি—শুধু তোমাকেই খুন করতে চাই আমি।’

‘বেন! এসব কী বলছ তুমি?’ মেলানির কণ্ঠে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। ‘শুধু এরিককে খুন করতে চাও, এর মানে কী? সোনা চাও তুমি, বেশ, নিয়ে যাও। ওগুলো কেউই চাই না আমরা।’

‘কিন্তু ওগুলো নিয়ে নিরাপদে কত দূর যেতে পারব আমি? ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভেবে দেখেছি। এ-ব্যাপারে মুখ বুজে থাকবে ইন্ডিয়ানটা, কারণ বরাবরই তাই করে ওরা। তোমাদের নিয়ে যত দুশ্চিন্তা। সেক্ষেত্রে, তোমরা যাতে মুখ খুলতে না পারো, নিশ্চিত করতে চাই আমি।’

এরিকের দিকে তাকাল বেন। ‘অনেক অপেক্ষার পর সময়টা এল। এবার আর আমাদের মধ্যে বাগড়া দিতে পারবে না কেউ। লেনদেন

চুকিয়ে ফেলব আমরা, একেবারে সুদাসলে। অন্য কারও কাছেই পিস্তল বা রাইফেল নেই এখন, শুধু তুমি আর আমি।’

বুক টানটান করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে এরিক ক্রেবেট। পা জোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে, নির্বিকার মুখে অপেক্ষা করছে। সামান্য দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগও দেখা গেল না ওর চোখের গভীরে। ‘একটা কথা না বলে পারছি না, ডেভিস, যা করতে চাইছ, আর সবকিছুর মত এখানেও তুমি একজন টিনহর্ন। নেহাত আনাড়ি।’

কিন্তু আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে ডেভিস, নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত। ‘আমি পিস্তল ড্র করলে কী করবে, ক্রেবেট?’

তখনই দূরাগত খুরের শব্দ কানে এল ওদের। পরপরই চড়া একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, দূর থেকে ডাকছে কাউকে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল বেন ডেভিসের হাতে, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল এরিক, সামান্যও নড়ল না, শুধু ডান হাতটাই নড়ল। একটা পিস্তল হোলস্টার ছাড়িয়ে নিশানা করার পর গুলি খেল ডেভিস।

চোখের পলকে গুলি করেছে এরিক। এত দ্রুত উঠে এসেছে পিস্তল, দৃষ্টি দিয়ে কেউই অনুসরণ করতে পারল না; ক্ষণিক আগেও হোলস্টারে ছিল পিস্তলটা, ওর হাত ছিল হোলস্টার থেকে অন্তত কয়েক ইঞ্চি দূরে। আগে ডেভিসই পিস্তলে হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু তারপরও খুবই শ্লথ মনে হলো তাকে। এরিকের গুলিতে আধ-পাক ঘুরে গেল জুয়াড়ীর দেহ, দ্বিতীয় গুলিতে ফুটো হয়ে গেল ফুসফুস, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিথিল মুঠি থেকে পিস্তলটা ছেড়ে দিল ডেভিস, বালিতে খসে পড়ল, তারপর সে নিজেও মুখ খুবড়ে পড়ল বালির উপর। উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল সে, মনে হলো যেন খিঁচুনি উঠেছে, শেষে পড়ে গিয়ে চিৎ হয়ে গেল দেহটা।

‘তুমি...তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ, ক্রেবেট! হারিয়ে দিয়েছ আমাকে!’

দৃষ্টি নামিয়ে তার দিকে তাকাল এরিক। ‘দুঃখিত, ডেভিস। নিজের

মুরোদ বোঝা উচিত ছিল তোমার। ষোলো বছর থেকে এই কাজটা করছি আমি।’

আরও কিছু বলার চেষ্টা করল বেন ডেভিস, কিন্তু শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, শেষবারের মত বার দুয়েক কেঁপে উঠল তার দেহ, তারপর একেবারে নিথর হয়ে গেল।

ট্রেইল ধরে ছুটে এল বেশ কয়েকজন রাইডার, ধুলো উড়িয়ে ওদের চারপাশে থামল তারা। মুখ তুলে তাকাল এরিক ক্রেবেট, সামনে তেজী একটা গেল্ডিং-এর স্যাডলে আসীন বিশালদেহী ধূসর চুলের মানুষটাকে দেখেই বুঝে ফেলল এই লোক জিম রিওস না হয়েই যায় না।

‘কে তুমি?’ কর্কশ, নির্দেশের সুরে জানতে চাইল সে।

‘আমি এরিক ক্রেবেট,’ সংক্ষেপে জানাল ও। ‘তোমার মেয়ের হবু জামাই।’

কঠিন চাহনিতে ওকে মাপল রিওস। ‘বেশ, এবার ঘোড়ায় চড়ে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা।’ ঘাড় ফিরিয়ে মেলানির দিকে তাকাল জিম রিওস। ‘তুমি ঠিক আছ?’

‘হ্যাঁ। বাবা, বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমি।’

মাথা নেড়ে এরিকের দিকে ইশারা করল রিওস। ‘একেই তোমার পছন্দ?’

‘হ্যাঁ।’

‘বেশ চালাক হয়েছ দেখছি,’ গম্ভীর মুখে বলল জিম রিওস। এবার ড্যান কোয়েনের দিকে ফিরল সে। ‘গরু দাবড়াতে জানো তুমি?’

‘নিশ্চই।’

‘একটা কাজ পেয়ে গেছ।’

সব ঘোড়া যখন চলে গেল, ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে গেল জায়গাটায়, খোলা জায়গা থেকে বালি খেদিয়ে নিয়ে গেল। বালি সরে যাওয়ায় নীচে চাপা পড়ে যাওয়া তীরের একটা মাথা উন্মুক্ত হলো। হয়তো হাজার বছর পুরানো ওটা। আবার বাতাস বইল, বালি সরে

যাচ্ছে দূরে । ব্যস, আর কোন নড়াচড়া নেই ।

বৃষ্টি হলে আবারও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে পাপাগো ওয়েল্‌সের কূপগুলো । বহু মানুষ আসবে এখানে, কেউ বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে, কেউ কেউ হয়তো মারা পড়বে । কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় একই থেকে যাবে কূপগুলো, পরিবর্তনের ছোঁয়া ওগুলোকে স্পর্শ করবে না কখনও ।

আবারও বাতাস বইল, কাছাকাছি মেস্কিট ঝোপের আড়ালে ডেকে উঠল নিঃসঙ্গ একটা কোয়েল ।
